ভয়াল কাহিনি

প্রেতের হাসি

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অনীশ দাস অপু

সূচিপত্র

- ইটভাটার পাহারাদার
- অমাবস্যার রাতে
- নিশি আতঙ্ক
- জমিদারবাড়ি

ভয়াল পূর্ণিমা

Take screenshot

ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। বাতাসে নানারকম ফিসফিসানি। মাথার ওপর সরসর আওয়াজ তুলছে ঘন গাছপালা। সব মিলিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি। ওর মধ্যেই বাধ্য হয়ে পথ চলতে হচ্ছে অপু ও তপুকে। ওরা যমজ, তপু অবশ্য অপুর চেয়ে সাত মিনিটের ছোট। আর সব যমজের মত ওরাও দেখতে অবিকল একরকম। কে কোনজন, বাইরের মানুষ তো দূরের কথা, মা-বাবাও সব সময় ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেন না।

'ভাইয়া!' প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় ডেকে উঠল তপু। 'কী হবে এখন?'

হোক সাত মিনিটের বড়, তবু বড় তো! তাই অপুকে ভাইয়া ডাকে ও। এতে কিছু সুবিধেও হয়, ডাক শুনলেই সবাই চট করে বুঝে ফেলে কে বড়, কে ছোট।

দাঁড়িয়ে পড়ল অপু, ভাইকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল। 'ভয় নেই। চল, আরেকটু সামনে যাই। কোন পথ পাওয়া যায় কি না...।'

'তুই এখনও বুঝতে পারছিস না, পথ আর পাওয়া যাবে না?' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল অপু। 'বনের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছি আমরা।'

ঠিকই বলেছে ও, অপু ভাবল। পথই হারিয়েছে ওরা দু'ভাই। এক ঘণ্টারও বেশি হলো পথের খোঁজে একবার এদিক একবার সেদিক করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। তারপরও এতক্ষণ আশায় আশায় ছিল অপু। ভেবেছে, আরেকটু খুঁজলেই পথ বের করে ফেলতে পারবে, কিন্তু হলো না। সুন্দরবনের মহাগোলকধাঁধায় পড়ে ছোটাছুটিই সার হলো কেবল।

কী হবে এখন?

কিছু দেখা যায় না। হাত একদম চোখের সামনে তুলে ধরে দেখার চেষ্টা করল অপু, ওটাও দেখা যায় না। 'কী করি এখন?' আপন মনে বলল। ভয় করছে ভীষণ, কিন্তু তপুর সামনে প্রকাশ করতে পারছে না। তাতে দ্বিগুণ বিপদ হবে। কারণ ও

সাংঘাতিক ভীতু। অপু যদি স্বীকার করে ও ভয় পেয়েছে, তাহলে বিপদ ঘটে যাবে। আতঙ্কিত হয়ে যা-তা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে তপু।

'কেন যে কাউকে সঙ্গে না নিয়ে বনে ঢুকলাম।' তপু বলে উঠল একই কণ্ঠে। 'গার্ডদের কেউ থাকলে...'

বাকি কথা কানে গেল না অপুর, ও অন্য কথা ভাবছে। মা-বাবা, মামার কথা ভাবছে। ওদের খোঁজে কে কতটা ব্যস্ত, অস্থির, কে জানে? দুই ছেলের খোঁজ নেই—দেখে মা হয়তো এতক্ষণে কান্নাকাটিই শুরু করে দিয়েছেন। ভাবছেন, বাঘের পেটে গেছে তাঁর দুই ছেলে। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের খাবারে পরিণত হয়েছে।

ওরা ঢাকায় থাকে। মামা চাকরি করেন এখানে, বন বিভাগে। সুন্দরবনের বুড়ি গোয়ালিনী রেঞ্জের ফরেস্ট অফিসার। তিন বছর হলো এখানে বদলি হয়ে এসেছেন মামা, তখন থেকেই মা'র খুব ইচ্ছে ছেলেদের বাৎসরিক ছুটি হলে আসবেন। সুন্দরবন দেখবেন। কিন্তু অপু-তপুর বাবা ব্যবসায়ী, আগের দুই বাৎসরিক ছুটিতে সময় করে উঠতে পারেননি বলে আসা হয়নি। সে ক্ষত পুষিয়ে নিতে এবার বেশ লম্বা সময় বের করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসেছেন তিনি।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই ঝামেলা বেঁধে গেল। দুপুরে ভরপেট খেয়ে বড়রা একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, এই ফাঁকে ওরা দু'ভাই চুপিচুপি বেরিয়ে পড়েছে বাংলো থেকে। কোন বদ মতলবে নয়, আশপাশের চারদিকটা একটু ঘুরে দেখবে বলে। বাংলোর গার্ড, হাতেম আলি অবশ্য নিষেধ করেছিল, শোনেনি অপু। 'দূরে কোথাও যাচ্ছি না' বলে কেটে পড়েছে।

মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুলে পড়ে অপু-তপু, আগামীবার এসএসসি দেবে। ক্লাসের বইয়ে, গল্পের বইয়ে সুন্দরবন সম্পর্কে পড়েছে, তার কতখানি সত্যি, তাই যাচাই করতেই এসেছিল ওরা। কিন্তু বেখেয়ালে চলতে চলতে কখন যে পথ হারিয়ে ফেলেছে, কেউ খেয়ালই করেনি। যখন হুঁশ হলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সুন্দরবনের অপরূপ শোভা, হরিণের ঝাঁক আর গাছে গাছে বাঁদরের লাফালাফি দেখতে গিয়ে বাংলো থেকে অজান্তেই অনেক দূরে এসে পড়েছে ওরা। পথ খুঁজতে গিয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, এই সময় শেষ প্যাঁচটা লাগাল এক বুড়ো।

খুব সম্ভব কাঠুরে হবে লোকটা, অথবা যারা মধু সংগ্রহ করে চাক ভেঙে, তাদের কেউ। আচমকা লোকটার সামনে পড়ে

থতমত খেয়ে গিয়েছিল ওরা। ওদের দেখে সে-ও চমকে বিরক্ত হয়েছে। সে চোখে শুধু বিরক্তি নয়, আরও অনেক কিছু যেন দেখেছে অপু-তপু। খুব সম্ভব লোভ। ওদের সমস্যার কথা শুনে আরও বাড়ল সেটা।

'ও পথ হারিয়েছ?' বলল বুড়ো। 'আচ্ছা, এসো আমার সাথে। পৌঁছে দিচ্ছি বাংলোয়।'

খুশি হয়ে উঠেছিল দু'ভাই, কিন্তু একটু পরই দেখা দিল নতুন বিপদ। খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার বদলে ওদের আরও গভীর বনে নিয়ে এল লোকটা। তারপর আচমকা উধাও হয়ে গেল। এই ছিল, এই নেই হয়ে গেল। অনেকটা ভোজবাজির মতো।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, তারপর যখন টের পেল লোকটা ওদের সাহায্য করার বদলে নতুন সমস্যায় ফেলে গেছে, তখন আর কিছু করার ছিল না। আঁধার ঘন হয়ে এসেছে ততক্ষণে। দশ হাতের ওপাশে নজর চলে না। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখেছে অপু-তপু, লাভ হয়নি। বরং আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। তার ওপর জঙ্গলের এদিকটা যেন কেমন বেশ গভীর। গাছগুলো মোটা মোটা, প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর লম্বায়ও তেমনি—বিশাল একেকটা। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তপু ভয় পেয়ে গিয়েছিল বলে ব্যাপারটা অত খেয়াল করেনি, কিন্তু অপু করেছে, চারদিকের গাছপালা যেন হঠাৎ করে ঘন হয়ে চেপে আসতে শুরু করেছে। ইয়া মোটা মোটা গাছ, লম্বায় আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে।

অপু নিশ্চিত, পাঁচ মিনিট আগেও পরিবেশ অন্যরকম ছিল। গাছ ছিল ঠিকই, তবে এত ঘন আর দীর্ঘ ছিল না। ঢোক গিলে চারদিকে তাকাল অপু। কিচ্ছু দেখা যায় না। এতই অন্ধকার, একেক সময় মনে হয় ও নিজেই বুঝি অন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার-টন্ধকার কিছু না। অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল ওর। কী হবে এখন? পুরো একটা রাত এই জঙ্গলে কাটাতে হবে? এদিকে মা-বাবার চিন্তা আর মৃত্যুভয়, সব মিলিয়ে কাহিল করে তুলল ওর অবস্থা। মামা কি লোকজন নিয়ে ওদের খুঁজতে বেরিয়েছেন? ভাবল অপু, নিশ্চয়ই বেরিয়েছেন। বনপ্রহরীদের নিয়ে এতক্ষণে অবশ্যই বেরিয়ে পড়েছেন মামা, যে কোন সময় পৌঁছে যাবেন এখানে। তারপর কী ঘটবে ভাবতে ইচ্ছে করছে না, নিশ্চয়ই প্রচুর বকা খেতে হবে ওকে। কারণ বুদ্ধিটা ওর মাথা থেকে বেরিয়েছিল। তপুর আসার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না, ওই ফুসলে নিয়ে এসেছে।

হঠাৎ বাঘের ডাকে কেঁপে উঠল সুন্দরবন, বুকের রক্ত হিম হয়ে এল ওদের। সর্বনাশ! কোথায় ওটা? ভয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে

ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল দু'ভাই। চারদিক থেকে নানারকম শব্দ আসছে। ঝিঁঝির ডাক তো আছেই, তার সঙ্গে আছে শেয়ালের ডাক, পেঁচার ডাক ও এক ধরনের সরসর শব্দ ।ওটা—সাপ!

আতঙ্কে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার অবস্থা হলো অপুর। ঠিক তখনই আলোটা চোখে পড়ল। ওদের গজ পঞ্চাশেক সামনে জ্বলছে লালচে একটা আলো। বাতাসে কাঁপছে। আশায় বুকটা ভরে উঠল। তপু ব্যস্ত গলায় বলল, 'ওই দ্যাখ, আলো!'

লাফিয়ে উঠল অপু। 'কি বলছিস? কই? কিসের আলো?'

'কি জানি! ওই যে, সোজা সামনে, দেখেছিস?'

'হ্যাঁ!' দম আটকে এল তপুর। 'তাই তো! মনে হয় কুপির আলো।'

'তাই হবে' অপু বলল। ছোট ভাইয়ের হাত ধরে টানল। 'আয় দেখি।'

কিন্তু তপুর মধ্যে এগোবার আগ্রহ দেখা গেল না। 'ভাইয়া!'

'কী হলো?'

'ওটা মনে হয়...' কথা শেষ করতে পারল না সে, গলায় আটকে গেছে।

'কি বলবি বল না!' অপু তাড়া লাগাল।

'ওটা আলেয়া হতে পারে।'

মনে মনে আঁতকে উঠল অপু, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

'কি!' অনেক কষ্টে বলল ও।

'হ্যাঁ। বইতে পড়িসনি, রাত-বিরেতে পথহারা পথিককে আরও বিভ্রান্ত করতে আলেয়ার আলো জ্বলে ওঠে? কিছুদিন আগে 'জী হরর শো'তে এই নিয়েই তো একটা ভয়ঙ্কর কাহিনি দেখাল। তাছাড়া দু'সপ্তা আগের 'আহাত' দেখিসনি? ওতেও এ নিয়েই দেখিয়েছে সেদিন।'

অন্ধকারে তপুর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অপু। ভয়ের সামান্য কম লক্ষণও নেই ওর গলায়। এমনভাবে বলছে, যেন আলেয়া কোন ব্যাপারই নয়। তাও আর কোথাও নয়, সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে।

অথচ এই তপু বাসায় রাতে একা একা এক বিছানায় ঘুমাতে সাহস পায় না, 'হরর শো' বা 'আহাত' দেখার পর একা বাথরুমে যেতে চায় না, দরোজার বাইরে অপুকে দাঁড়াতে হয়। সেই তপুর এত সাহস কি করে হলো, কিছুতেই মাথায় আসছে না ওর।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলেনি ও। ভাবল অপু, ঠিকই বলেছে। হয় এ রকম। মরুভূমিতে খোলা ধু-ধু প্রান্তরে অথবা বনের মধ্যে এখানে-সেখানে হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে ওঠে আলেয়ার আলো, পথিককে আরও বিভ্রান্ত করে। কিন্তু এই আলোটাকে অপুর সে রকম মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওটা সত্যি আলোই হবে। আর যদি তা না-ই হয়, একটু এগিয়ে দেখতে অসুবিধা কি? পানিতে ডুবে মরার আগে মানুষ হাতের কাছে যা পায়, তাই ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে। ওদেরও এখন প্রায় সেই অবস্থা, তাহলে ওরা কেন করবে না?

'নাহ্,' বিরক্ত হয়ে বলল অপু। 'টিভিতে সারাক্ষণ আবোল-তাবোল দেখে তোর মাথার বারোটা বেজে গেছে।' বলল বটে, যদিও সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিতেও পারল না। নিজেরই ভয় লেগে উঠল। তবু জোর দিয়ে বলল, 'চল, চল! কাছে গিয়ে দেখি।'

'চল।' তপু বলল। হাত ধরাধরি করে এগোল দু'ভাই। বুক কাঁপছে ভয়ে। গা ছমছম করছে। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যেতে কেঁপে উঠল ওরা।

'মনে হয় বৃষ্টি নামবে,' তপু মন্তব্য করল। মুখ তুলে ওপরে তাকাল অপু, ঘন পাতার দেয়াল ভেদ করে একটু চাঁদের আলো আসছে। কথাটা বলতে অবাক হলো তপু। 'তাহলে বাতাস এত ঠাণ্ডা কেন?'

'কি জানি?'

থেমে পড়ার উপক্রম করল তপু। 'ভাইয়া, আমার কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধার মনে হচ্ছে না।' মন দমে গেল অপুর। 'কেন?'

'না ইয়ে... ওই আলো, ঠাণ্ডা বাতাস...'

বাঘের ভয়াবহ হুঙ্কারে কথা শেষ করতে পারল না তপু, আড়ষ্ট হয়ে গেল। অপুর হাত চেপে ধরল শক্ত করে। আওয়াজটা এবার অনেক কাছে হয়েছে। হুঙ্কারের সাথে সাথে অনেক জোড়া পায়ের শব্দ উঠল, কারা যেন ছুটে পালাচ্ছে। ছোট ছোট প্রাণী হবে বোধহয়। বাঘের ভয়ে পালাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েই আবার দ্রুত পা চালাল ওরা। প্রায় দৌড়ে এগোল আলোর দিকে। হোঁচট খেতে খেতে জায়গামতো পৌঁছাল ওরা, অবাক হয়ে গেল সামনেই একটা ঘর দেখে। একটা কুপি জ্বলছে ওটার ভেতরে। দরোজা হাঁ করে খোলা।

'আরে! এখানে ঘর এল কোত্থেকে!' খুশি হয়ে উঠল অপু। 'যাক, বাবা! বাঁচা গেল। চল, ভেতরে কে আছে দেখি।'

এগিয়ে এসে ওটার খোলা, নিচু বারান্দার সামনে দাঁড়াল দু'ভাই। ভাল করে লক্ষ করতেই বুঝল ওটা একটা কুঁড়েঘর। বেড়ার গায়ে অসংখ্য ফুটো, সরু রেখার মতো আলো বেরোচ্ছে ওগুলো দিয়ে। ঘরের সামনে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা। গাছপালা কিছু নেই। চাঁদের আলোয় একেবারে ঝকঝক করছে জায়গাটা।

'ঘরে কে আছেন?' ডাকল অপু।

'কে?' ভেতর থেকে ভীষণ খসখসে গলায় জবাব দিল কেউ। মনে হলো গলা নয়, একটার সাথে আরেকটা শিরিষ কাগজ ঘষছে কেউ।

অপু কি বলবে ভাবছে, এই সময় ভেতরের আলোটা নড়ে উঠল। ওটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল একজন। লোকটাকে দেখে চমকে উঠল ওরা। সেই বুড়ো লোকটা। মুখ নড়ছে তার, কিছু খাচ্ছে বোধহয়।

'আপনি!' রেগে উঠল অপু। 'আপনি এখানে! আমাদের ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দেবেন বলে আরেকদিকে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসে এখানে বসে আছেন?'

কুপির আলোয় লোকটার দু'চোখ জ্বলে উঠতে দেখল ওরা, অন্ধকারে বেড়ালের চোখ যেমন জ্বলে, ঠিক তেমনি। একেবারে হাড্ডিসার স্বাস্থ্য, কঙ্কালের মতো।

লম্বা, উস্কখুস্ক চুল, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। চুলদাড়ি সবই প্রায় পাকা। হাত-পায়ের নখ বড় বড়, ভেতরে ময়লা জমে আছে।

'আমাদের এদিকে কেন নিয়ে এলেন আপনি?' তপু বলল রাগ রাগ গলায়। 'কেন উল্টো বিপদে ফেললেন?'

রহস্যময় হাসি ফুটল লোকটার শীর্ণ মুখে। বীভৎস হাসি। মনে হলো কোন মানুষ নয়, কঙ্কাল হাসছে বুঝি। 'আস্তে কথা বলো' বলল লোকটা। 'মানুষের গলা শুনলে বাঘ এসে পড়তে পারে।'

ভয়ে রাগ পানি হয়ে গেল ওদের, ব্যস্ত পায়ে বারান্দায় উঠে পড়ল, পরক্ষণে লোকটার গায়ের গন্ধে বমি করে দেয়ার অবস্থা হলো দু'জনেরই। জঘন্য দুর্গন্ধ। মনে হলো, এইমাত্র মড়া খেয়ে এসেছে বুঝি লোকটা। সারা গা থেকে ভুর ভুর করে পচা মাংসের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল বুড়ো। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওরাও গেল পিছন পিছন। ভেতরেও সেই একই গন্ধ। আরও বেশি, আরও উৎকট। একদিকের বেড়া থেকে তৈরি তক্তার চৌকির ওপর কুপিটা রেখে ঘুরল বুড়ো। আরেক টুকরো রহস্যময় হাসি দিয়ে বলল, 'গরিবের ঘরে থাক দুই-একদিন। তারপর জায়গামতো পৌঁছে দেব।' 'জায়গামতো' শব্দটা খুব আস্তে উচ্চারণ করল সে, ওদের কান পর্যন্ত পৌঁছল না।

'দুই-একদিন!' তপু বলল। 'এই ঘরে, পাগল হয়েছেন নাকি? জলদি চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসুন আমাদের।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল লোকটা। 'সম্ভব না। আজকে চতুর্দশীর রাত।'

চোখ কুঁচকে উঠল অপুর। 'চতুর্দশী! সে আবার কি?'

আবার সেই রহস্যময় হাসি ফুটল বুড়োর মুখে। 'চতুর্দশী কি জানো না? পূর্ণিমার আগের রাত।'

‘তাতে কি? পূর্ণিমার আগের রাতের সাথে আমাদের ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দেয়ার কি সম্পর্ক?’ বলল তপু।

‘সম্পর্ক নেই, আবার আছেও। এই দুই রাত আমি অন্যের কাজ করি না, শুধু নিজের কাজ করি।’

রাগে মেজাজ বিগড়ে গেল অপুর। গলা চড়িয়ে বলল, ‘সেটা কি জানতে পারি? কাজ যদি না-ই করবেন, মিথ্যে বলে আমাদের এদিকে কেন নিয়ে এলেন? কেন গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে গায়েব হয়ে গেলেন?’

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল লোকটা, তার আগেই অপু বলে উঠল, ‘আপনি কে বলুন তো! নাম কি? কি করেন?’

দুই পুঁচকের একের পর এক প্রশ্নবাণে বেহাল অবস্থা হলো তার। কোনমতে সামলে নিয়ে বলল, ‘আমার নাম জেনে তোমাদের কোন লাভ নেই। তোমরা...’

কাছেই কোথাও একযোগে কয়েকটা কুকুরের ডাক শুনে থমকে গেল সে। মাথা সামান্য কাত করে কান খাড়া করল। আবার ডেকে উঠল ওগুলো। না, কুকুর নয়। ওরা দুজনেই বুঝল ডাকটা কিসের—নেকড়ের! প্রথমে কুকুরের মতোই মনে হয়, পরে যখন ‘উ-উ-উ-উ’ করে দীর্ঘ টান দেয়, তখনই পার্থক্যটা বোঝা যায়। প্রচুর হরর ছবি দেখেছে অপু-তপু, ছবির মাধ্যমেই নেকড়ের ডাকের সাথে পরিচয় হয়েছে ওদের। চিনতে একটুও ভুল হলো না। নেকড়ের প্রলম্বিত ডাক থামতে খুব কাছেই একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল।

ওদিকে অপু একভাবে বুড়োর দিকে তাকিয়ে আছে। নেকড়ের ডাক কানে যাওয়ামাত্র তাকে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখে ভারী অবাক হলো ও। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে লোকটা। কেন? দরোজার বাইরে উঁকি দিল লোকটা, তারপর ফিরে এসে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল। ‘শোনো, অপু আর তপু, আমি জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি। কখন ফিরব ঠিক নেই। তোমরা ঘর থেকে বের হবে না। খবরদার! বাঘটা হয়তো ধারেকাছেই আছে, মানুষের গন্ধ পেলে কি করবে সে তো বোঝোই।’

বলে আর দাঁড়াল না লোকটা, প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল। চাঁদের আলোয় যতক্ষণ দেখা গেল, হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল দু’ভাই। তারপর ঘুরে পরস্পরের দিকে তাকাল। কোথাও বড় ধরনের গোলমাল আছে, বুঝতে পারছে ওরা, কিন্তু সেটা কি

হতে পারে—মাথায় আসছে না কারও।

তপুই প্রথম ব্যাপারটা ধরতে পারল। হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার জোগাড় হলো। 'ভাইয়া!' প্রায় ফিসফিস করে বলল ও, নজর উঠানে। একটু আগে যেখানটায় বুড়ো অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে আছে। 'ব্যাপারটা খেয়াল করেছিস?'

'কী?'

'লোকটা আমাদেরকে নাম ধরে ডেকেছে! ও জানল কী করে...?'

গোলমালটা কিসের বুঝতে পেরে রীতিমতো থ হয়ে গেল তপু। সত্যিই তো! ওই লোক জানল কি করে ওদের নাম?

'আমাদের ভয় ধরিয়ে গেল, মানুষের গন্ধ পেলে বাঘ আসবে,' তপু বলে চলল আপন মনে।

'কিন্তু লোকটা নিজে বেরুল কোন্ সাহসে? তার গায়ের গন্ধে বুঝি আসবে না? আমার মনে হয় ...' কথা শেষ না করে থেমে গেল ও। বলতে চায় না।

তাহলে তপু আবার ওর টিভি দেখা নিয়ে খোঁচা দেবে। কেননা তপু যা ভাবছে, তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি হাস্যকর।

'জানি তুই কি বলতে চাস,' ওকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল অপু। কণ্ঠস্বরে কোনরকম টিটকিরির আভাস পর্যন্ত নেই। 'সন্দেহ আমারও হচ্ছে, কিন্তু...' ঘরের এদিক-ওদিক নজর বোলাল ও। নাকমুখ কোঁচকাল। 'এহ, মাগো! এর মধ্যে মানুষ থাকে?'

তপুর কোনদিকে খেয়াল নেই, দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে একভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে ও-ই জানে। হঠাৎ বড় ভাইয়ের অস্ফুট গোঙানি শুনে ঘুরে তাকাল, দেখল কুপি হাতে ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখ কপালে তুলে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী হলো, ভাইয়া?'

ঘুরে তাকাল অপু। 'দেখে যা।'

পায়ে পায়ে এগোল তপু, কাছে গিয়ে অপুর সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠল ওর, পেটের বত্রিশ হাত নাড়ি পাক খেয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার জোগাড় করল। প্রচণ্ড ঘৃণায় রি রি করে উঠল গায়ের মধ্যে। বেড়ার কোনা ঘেঁষে মেঝেতে পড়ে আছে ছোটখাটো একটা জন্তু। ছেঁড়াখোঁড়া, রক্তাক্ত দেহ। গায়ের রং ধূসর। লম্বা, ঘন পশম। 'আলোটা ধর তো,' তপু বলল। 'কী এটা?'

'শেয়াল-টেয়াল হতে পারে।'

জিনিসটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল ওরা। বড়জোর হাতখানেক লম্বা হবে দেহটা, এখানে-ওখানে হাঁ হয়ে আছে—মাংস নেই। খুবলে খেয়েছে কেউ।

চোখ তুলল অপু, গম্ভীর গলায় বলল, 'আমরা যখন এলাম, তখন লোকটা এখানেই বসে ছিল, মনে আছে?'

'হ্যাঁ,' রুদ্ধশ্বাসে বলল তপু।

'ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ওর মুখ নড়ছিল। তার মানে...'

মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝতে পেরেছি।'

স্তব্ধ হয়ে অভুক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকল দু'ভাই। একই কথা ভাবছে ওরা—এ-ও কি সম্ভব? বাস্তব জীবনে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে? নাকি জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছে ওরা? 'এই জন্যেই ঘর থেকে এত বদগন্ধ বের হচ্ছে,' অপু বলল।

'না, ভাইয়া!' আহাম্মকের মতো চেহারা হলো অপুর। হঠাৎ কি খেয়াল হতে বসে পড়ল, কুপি এগিয়ে চৌকির তলায় তাকাল। পরক্ষণে একটা চাপা আওয়াজ বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। 'তপু, দ্যাখ!'

উঁকি দিল ও, বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা চিৎকারটা অনেক কষ্টে ঠেকাল। ওপাশের বেড়ার কাছে নানা সাইজের অসংখ্য হাড় ছড়িয়ে আছে। কিছু হাড়ের রং সাদা, শুকিয়ে গেছে। অন্যগুলো শুকায়নি পুরোপুরি, পচা-গলা মাংস লেগে রয়েছে। গুড়ি গুড়ি পোকা কিলবিল করছে ওগুলোর ওপর। তীব্র আতঙ্কে কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো অনড় হয়ে থাকল ওরা, তারপর থরথর

করে কাঁপতে লাগল অপু। হাত থেকে কুপি পড়ে যায় যায় অবস্থা। অথচ ভীতু বলে যার খ্যাতি আছে, সে কিন্তু নির্বিকার। দেখে মনে হয় না ভয় পেয়েছে। কি যেন ভাবছে।

'চল, তপু।' চাপা গলায় বড় ভাই বলল, 'ও... ওটা ফিরে আসার আগেই পালাই আমরা।'

'পাগল হয়েছিস? এই অন্ধকারে পালিয়ে দূরে যাব? তাছাড়া বাঘটা ধারেকাছেই কোথাও আছে, সোজা ওটার সামনে গিয়ে পড়তে পারি আমরা। তখন?'

'কিন্তু মরতেই যদি হয়...'

'আরে রাখ! মৃত্যু এত সোজা নাকি?' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল তপু। 'দাঁড়া দেখি, ভাবতে দে।' বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অপু। বিশ্বাসই করতে পারছে না, কথাগুলো তপুর মতো এক মহাভীতুর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। বাসায় বাথরুমের সামনে কেউ না দাঁড়ালে যার কাজ সারার সাহস হয় না, সেই কিনা আজ উল্টো তাকেই সাহস দিচ্ছে, তাও গভীর বনের মধ্যে এ রকম এক রক্তহিম করা পরিবেশে দাঁড়িয়ে? চোখে পলক পড়ছে না অপুর, হাঁ করে ছোট ভাইয়ের চিন্তিত মুখটা দেখছে তো দেখছেই। 'কি ভাবছিস?' একটু পর বলল।

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল তপু, হঠাৎ কাছেই একযোগে অনেকগুলো নেকড়ে ডেকে উঠতে থমকে গেল। দরোজা দিয়ে বাইরে তাকাল। একটু পর থেমে গেল ওগুলো। একটা বাদে। একটানা ডেকে চলেছে ওটা, আওয়াজটা শুনতে কেমন যেন অশুভ লাগছে। শিরিষ কাগজের মতো খসখসে, কর্কশ।

চাঁদের দিকে মুখ করে ডাকছে নাকি? তপু ভাবল, ছবিতে যে রকম দৃশ্য দেখেছে ওরা, সেইভাবে?

একটু পরই বাঘের বিকট গর্জনে কলজে লাফিয়ে উঠল ওদের। বাব্বাহ! কী ভয়ঙ্কর ডাক! মাটি পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। হাজারটা নেকড়ের ডাকও তার তুলনায় কিছু নয়। আবার গর্জন ছাড়ল বাঘ, এবার দূর থেকে আরেকটা বাঘ তার জবাব দিল। বাঘিনী হবে হয়তো। কিছুক্ষণ বেশ ঘন ঘন ডাকল ও দুটো, তারপর চুপ মেরে গেল। নেকড়ের দল আরও আগেই থেমে গিয়েছিল, এখন

বোধহয় বাঘের ভয়ে বন-বাদাড় ভেঙে পালাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর এক সাথে দুটো বাঘের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে পুরো এলাকা কেঁপে উঠল। আতঙ্কে গাছের ডালে বসা বাঁদর ঝাঁক বেঁধে এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা পাখি বাসা ছেড়ে পালাল। ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে ঘন অন্ধকার কোথাও ভীষণ হুটোপুটি চলছে, শুকনো ডাল ভাঙার পটাপট শব্দ উঠছে, তার সাথে আছে বাঘের রক্ত জমাট করা ভয়াবহ ক্রুদ্ধ গর্জন ও অজানা আহত পশুর কাতর আর্তনাদ, গোঙানি এবং হুড়মুড় করে ছুটে পালানোর শব্দ।

'কী হচ্ছে এসব?' ঢোক গিলে কোনমতে বলল অপু। ভয়ে মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে ওর। 'তা জেনে কাজ নেই,' বলতে বলতে দরোজার দিকে এগোল তপু। ভেতরে আসা-যাওয়ার খোলা পথের পাশে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে ঝাঁপের মতো দরোজাটা, দেখে বেশ মজবুতই মনে হলো। ওটা দিয়ে তাড়াতাড়ি পথটা বুজে দিল ও। গড়ান কাঠের মোটা এক লাঠি ব্যবহার করা হয় দরোজার খিল হিসেবে, ওটাও লাগিয়ে দিল তপু। তারপর নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কিছুটা তো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

বাইরে হুটোপুটির আওয়াজ অনেক কমে এসেছে। বাঘের হুঙ্কারের তেজও আগের মতো নেই, একটু কমেছে। তবে আহত কোন পশু এখনও গোঙাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে ভালই আহত হয়েছে ওটা।

একটু পর বাইরে কিছু একটার দৌড়ে আসার শব্দ উঠল, এদিকেই আসছে। কি ওটা? ঘরের ভেতরে শক্ত হয়ে বসে থাকল দু'ভাই, ভয়ে বুক কাঁপছে।

বন্ধ দরোজার ওপাশে পৌঁছে থেমে গেল পায়ের শব্দ, পরক্ষণে দরোজায় নখ দিয়ে আঁচড়ানোর শব্দ উঠল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর খুব দ্রুত। মুখ দিয়ে চাপা গোঙানি বেরোচ্ছে ওটার। একবার ঝাঁপটার দিকে একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল অপু-তপু। দুজনের মনে একই প্রশ্ন—কী ওটা?

ঝাঁপ খুলতে ব্যর্থ হওয়ায় রেগে উঠল জন্তুটা, দুর্বোধ্য আওয়াজ করতে লাগল অনবরত, সেই সাথে আরও জোরে আঁচড়াতে লাগল। কিন্তু কাজ হলো না। অবশেষে অনেকক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগল ওটা।

রাত ক্রমে গভীর হতে লাগল, ঝিমিয়ে পড়তে লাগল বন। নিশাচর পশু-পাখির ডাক ও বাতাসে পাতার মর্মর ধ্বনি ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। খিদেয় পেট জ্বলছে অপু-তপুর, ঘুমে চোখ বুজে আসছে। তবু চৌকির কিনারায় অনড় বসে থাকল ওরা।

টের পেল জন্তুটা বাইরেই আছে, যায়নি। খানিক পর পর এসে দরোজা খোলার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল অপু, পাশে তাকিয়ে দেখল তপু ঘুমে বিভোর।

কখন যে তক্তার ওপরই ঘুমিয়ে পড়লো ওরা, খেয়াল নেই। ভেতরটা আলো হয়ে উঠেছে দেখে খুশি হয়ে উঠল অপু। দিন হয়েছে। রোদের আলো আসছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে। তপুকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল অপু, ঝাঁপের ওপাশে বিকট শব্দে নাক ডাকছে কারও। নিঃশব্দে নেমে পড়ল ও, পা টিপে টিপে ঝাঁপের কাছে গিয়ে একটা ফাঁক খুঁজে নিয়ে তাতে চোখ রাখল।

সেই বুড়ো!

ঝাঁপের দু'হাত ওপাশে মাটির মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে ঘুমাচ্ছে। সারা গায়ে, মুখে কাদামাটি লেগে একাকার অবস্থা। অন্য একটা ব্যাপার চোখে পড়তে নজর স্থির হয়ে গেল অপুর। লোকটার ডান হাঁটুর কাছে লুঙ্গি রক্তে ভিজে শক্ত হয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় জখমটা ছোটখাটো নয়, বেশ বড়। প্রচুর রক্ত পড়েছে। বারান্দার মেঝের প্রায় সবখানে ছোপ ছোপ রক্ত, শুকিয়ে চটচটে হয়ে আছে।

লোকটার কপালেও একটা ক্ষত দেখা গেল। রক্ত জমে আছে ওখানেও। কয়েক গাছি চুল লেপটে আছে তার সাথে। তপু নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ওর পাশে। ফিসফিস করে বলল, 'কি দেখছিস ভাইয়া?'

ফাঁকটার কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিল অপু। 'এখান দিয়ে দ্যাখ।'

বেশ অনেকক্ষণ লোকটাকে দেখল তপু। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, 'ভাইয়া, ব্যাটা বেহুঁশ। চল্, এই সুযোগে পালাই।'

‘হ্যাঁ। আমিও তাই ভাবছিলাম।’ গড়ান কাঠের খিলটা নিঃশব্দে খুলে ফেলল ও, সরিয়ে ফেলল ঝাঁপ। তপু অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্যে ওটা সঙ্গে নিয়ে নিল। প্রয়োজনের সময় খুব একটা কাজে লাগবে না ওটা, কিন্তু অস্ত্র হিসেবে কিছুই নেই ওদের, তাই ‘নাই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল’ ভেবে নিয়েছে।

পা টিপে টিপে বারান্দায় নেমে এল দু’ভাই। বিকট শব্দে নাক ডাকতে থাকা বুড়োকে সতর্কতার সাথে পাশ কাটিয়ে উঠানে নেমে সোজা এগোল। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে ফিরে দেখে নিচ্ছে লোকটার ঘুম ভাঙল কি না।

না, ঘুমে বিভোর বুড়ো। বনে ঢুকে দ্রুত পা চালাল ওরা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে চায় এই এলাকা ছেড়ে। কারও মুখে কথা নেই। তপু লাঠি হাতে আগে আগে হাঁটছে, অপু ওর দু’হাত পিছনে। চারদিকে সতর্ক নজর বোলাচ্ছে। পাতার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প সূর্যের আলো আসছে বলে চারদিক মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। কাল দুপুরের পর থেকে কিছু খায়নি ওরা, অথচ উত্তেজনায় সে কথা মনেই পড়ছে না কারও। দু’জনের মাথায় একই চিন্তা, কখন বাংলোয় পৌঁছাতে পারবে, কখন মুক্তি মিলবে এই বিপদের হাত থেকে।

ঘণ্টাখানেক একটানা হাঁটার পর কিছু একটা সন্দেহ হতে দাঁড়িয়ে পড়ল তপু, চোখ কুঁচকে ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। জিভ দিয়ে ‘চুক’ করে বিরক্ত প্রকাশ করল।

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি, ভাইয়া?’ শান্ত গলায় বলল ও।

‘কেন?’ অবাক হলো অপু। বাংলোর...’ ছোট ভাইকে মাথা নাড়াতে দেখে থেমে গেল। ‘কি হলো?’

‘আসলে কোথাও যাচ্ছি না আমরা,’ বোকার মতো হেসে উঠল তপু।

‘যেতে পারছি না।’

‘বুঝলাম না। তার মানে?’

‘তার মানে আমরা কোথাও যাচ্ছি না। অথবা যেতে পারছি না। কেবল একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে মরছি।’

‘কী?’

ওদিকে দ্যাখ, ওই যে কাঁটা গাছটা, বনে ঢোকার পর ওটাকে যেখানে দেখেছি, এখনও সেখানেই আছে। ওই ডুমুরের মতো ফলওয়ালা গাছটা। আর ওই বুনো কাঁঠাল গাছ, ও দুটোও তাই। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।’

চোখ কুঁচকে গাছগুলো দেখল অপু, তারপর অন্যমনস্ক গলায় বলল, ‘এসব কি বলছিস তুই? এতবড় বনে একই গাছ তো কতই আছে।’

‘তা আছে। কিন্তু দেখতে অবিকল একরকম অনেকগুলো আছে বলে তো মনে হয় না।’

‘দূর!’ জোর গলায় বলল অপু। ‘আমার বিশ্বাস হয় না। তোর নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে।’

জবাব না দিয়ে আরও তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখে চারদিকটা দেখে নিল তপু। মৃদু গলায় বলল, ‘মনে হয় না। ঠিক আছে, আয় আরেকবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। চারদিকের গাছগুলো চিনে রাখ ভাল করে।’

পাঁচ মিনিট পর নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কোনদিকে না তাকিয়ে আন্দাজে মিনিট দশেক পর থেমে ডানে-বাঁয়ে তাকাল।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!!

যেখান থেকে শুরু করেছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে দু'ভাই। কাঁটা গাছসহ অন্য দুটো গাছ, যেটা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। উজবুকের মতো চেহারা শুকিয়ে উঠল। ‘হায় আল্লা! এসব কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’

তপু অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল। ‘আমি বোধহয় পারছি।’

‘কি?’

‘ওই বুড়োকে আমরা যা ভাবছি, কেবল তা-ই নয় লোকটা, ভাল যাদুও জানে। ওর যাদুর মায়াজালে পড়েছি আমরা। এর থেকে বের হওয়ার উপায় নেই।’

চুপ করে থাকল অপু। স্বর ফুটছে না গলায়। মাথার মধ্যে অজস্র চিন্তা ঘুরছে, কিন্তু সেগুলো ধোঁয়াটে। কি যে ভাবছে, নিজেই জানে না।

'ভয় পেয়েছিস?' প্রশ্ন করল তপু। গলা একদম স্বাভাবিক, ভয়ের লেশমাত্রও নেই। 'ভয় নেই। এর হাত থেকে বাঁচার উপায়ও জানি আমি।' হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অপু। 'জানিস! কি সেটা? কোথায় শিখেছিস?'

ফিক করে হাসল তপু। 'যার জন্যে তুই আর মা আমাকে সারাক্ষণ বকাবকি করিস, সেই টিভি থেকে। কিছু বুঝলি?'

হাবার মতো মাথা নাড়ল অপু। 'নাহ্!'

'মায়ানেকড়েদের নিয়ে অনেক ছবি দেখেছি আমি। তার প্রায় সবগুলোতেই দেখেছি, এরা সাধারণ নিরীহ মানুষের মতোই থাকে, কিন্তু পূর্ণিমার আগের রাতে বদলে যায়। অলৌকিক ক্ষমতা ভর করে ওদের ওপর। তখন নেকড়ে হয়ে যায় ওরা। রাতে শিকার করতে বের হয়। কাল রাতে ওই বুড়োও তাই হয়েছিল। বাঘের তাড়া খেয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেয়ার জন্যে ছুটে এসেছিল। যদি বুদ্ধি করে দরোজা বন্ধ না রাখতাম, তাহলে এতক্ষণে আমরা কেউ বেঁচে থাকতাম না।'

'এখন কি হবে? যদি বিপদ...'

'বিপদ তো হবেই,' বাধা দিয়ে বলল তপু।

'তবে আমাদের নয়, হবে ওই ব্যাটার।'

'কিভাবে?'

'ও আমাদেরকে নিজের জাদুর জালে আটকে রেখেছে, যাতে আজ রাতে নেকড়ে হয়ে আমাদের ঘাড় ভাঙতে পারে। কিন্তু সে সুযোগ ওকে আমরা দেব না। আজকের রাতটাও যদি কোনমতে ব্যাটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি, তাহলে কাল ভোরে ওর সমস্ত ক্ষমতা চলে যাবে, এই মায়াজালও কেটে যাবে। তখন বাংলোয় যাওয়ার পথ ঠিকই খুঁজে নিতে পারব আমরা।'

কিছু ভাবল তপু, তারপর আবার বলল, 'এখানে সময় নষ্ট না করে ফিরে যাই, চল। কিছু একটা বুদ্ধি বের করিগে।'

‘কিন্তু...’ দ্বিধায় পড়ে গেল অপু। ‘ফিরে গেলে এখনই যদি কিছু করে বসে ওটা?’

মাথা নাড়ল তপু। ‘যতক্ষণ সূর্যের আলো আছে, ততক্ষণ কিছুই করতে পারবে না, বললাম না?’

অবাক চোখে ভাইকে দেখতে লাগল অপু। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, ও সেই ভীতু তপু। উল্টো ওকেই সাহস জোগাচ্ছে এখন। ‘কিন্তু কাল ও মানুষ থাকা অবস্থাতেই শেয়াল ধরে খাচ্ছিল।’

‘সে তো রাতে, দিনে ওটাকে ভয় করার কিছু নেই। মায়াজাল বিছানোর নির্দিষ্ট একটা এলাকা আছে বুড়োর, কাল না জেনে তার মধ্যে পা দিয়ে ফেঁসে গেছি আমরা। কিন্তু এখন আমরা জানি ওর দৌড় কতদূর। চল চল, রাতের জন্যে তৈরি হতে হবে।’

সময় গড়িয়ে চলছে। সূর্য ক্রমে ঢলে পড়তে শুরু করেছে, দিনের অবসান ঘটতে চলেছে সুন্দরবনে।

ঘরের বারান্দায় এখনও ঘুমে বিভোর বুড়ো। সামনের খোলা উঠানে বসে ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা দু’ভাই। একটু আগে নাম না জানা একটা ফল খেয়েছে ওরা। দেখতে গাবের মতো, স্বাদও প্রায় একইরকম। অবশ্য মিষ্টি নয়, পানসে। বুনো গাব হয়তো।

কয়েকটা পাখি খুব মজা করে খাচ্ছে দেখে খিদেয় পেট মুচড়ে উঠেছিল ওদের। পাখিরা খাচ্ছে, কাজেই ওরাও খেতে পারবে ভেবে আর দেরি করেনি। পেট ভরে খেয়েছে। পেটের টান কমতে বুদ্ধিও খুলে গেছে, রাতটা বুড়োকে কি করে ঠেকিয়ে রাখা যায়, নানান ফন্দি আঁটছে তাই নিয়ে।

কথা বলতে বলতে অপু ঘুমে ঢলে পড়ে যাচ্ছে দেখে বুকের মধ্যে ধড়াশ করে উঠল তপুর। ওরও ঘুম পাচ্ছে খুব—ব্যাপার কি! এমন অসময় ঘুম পাচ্ছে কেন?

‘ভাইয়া, তোর ঘুম পাচ্ছে?’

‘হ্যাঁ,’ জড়ানো গলায় বলল অপু। ‘খুব।’

‘আমারও। সর্বনাশ।’

‘কী?’

‘ওই ফল ... ওগুলো খেয়েই এই অবস্থা হয়েছে। বুঝলি? ওর রসে নেশা ধরানোর মতো কিছু ছিল।’ ওর দিকে খেয়াল নেই অপুর, চোখ টেনে মেলে রাখার চেষ্টা করেও পারছে না। ওকে ওখানেই শুয়ে পড়ার আয়োজন করতে দেখে আঁতকে উঠল তপু। ‘অ্যাই! এখানে না, ওঠ! ঘরে চল!’

নিজের ভেতরেও ঢলে পড়ার লক্ষণ টের পেয়ে তড়াক করে উঠে পড়ল ও।

‘কেন?’ জড়ানো গলায় বলল অপু। ‘এখানেই একটু ঘুমাই না।’

‘ওঠ!’ চাপা হুঙ্কার ছাড়ল তপু। ‘আর দু’ঘণ্টার মধ্যে রাত হবে। এখানে ঘুমিয়ে পড়লে কি হবে বুঝতে পারছিস না? ওঠ, উঠে পড়!’

মাতালের মতো এলোমেলো পায়ে ঘরের দিকে এগোল ওরা। ভেতরে ঢুকে ঝাঁপটা লাগিয়ে দিল বিশেষ কায়দায়। তারপর আর কিছু মনে নেই ওদের। তবে ঘুমে থাকলেও অবচেতন মন সতর্ক ছিল তপুর, তাই নেকড়ের ক্রুদ্ধ গর্জনে এক সময় ঘুম পাতলা হয়ে গেল। অস্বস্তির সাথে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল ও। উঠে যে দেখবে কি ঘটছে, সে ক্ষমতা নেই।

একটা নয়, অনেকগুলো নেকড়ে। ওদের রক্ত হিম করা গর্জনে কুঁড়েঘর কাঁপছে। বাইরের গোটা আঙিনা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন। ঝাঁপের গায়ে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে ওগুলো, কাঁধ দিয়ে ঠেলছে। অবস্থা দেখে ভয় হলো, যে কোন মুহূর্তে খুলে পড়বে ওটা চাপ সহ্য করতে না পেরে।

অনেক কষ্টে উঠে বসল তপু, বোকার মতো তাকিয়ে থাকল দরোজার দিকে। নেশার ঘোর এখনও কাটেনি বলে বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে; কি করা উচিত। কতক্ষণ পর মনে নেই, হঠাৎ কয়েকটা মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠ আর ‘গুড়ুম’ ‘গুড়ুম’ গুলির

শব্দে চমকে উঠল ও।

মুহূর্তে হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল বাইরে। একের পর এক গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল গোটা এলাকা, আহত নেকড়েদের আর্ত চিৎকার ও পড়িমরি করে ছুটে পালানোর শব্দের সাথে মানুষের হাঁকডাকে সচকিত হয়ে উঠল। ওর মধ্যে মামার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল ও।

'ওই যে বড় শয়তানটা পালাচ্ছে।' একই সঙ্গে আরও দু'বার 'গুড়ুম' 'গুড়ুম'!

আর্তনাদ করে উঠল গুলিবিদ্ধ এক নেকড়ে। তারপর ভারী ধপাস্!

'মরেছে হারামজাদা!' মামা বললেন। 'অপু-তপু! তোমরা ভেতরে?'

'হ্যাঁ, মামা!' গলার সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল তপু, কিন্তু আওয়াজ বের হলো মুরগির ছানার মতো চিঁ চিঁ করে।

'আর ভয় নেই। বেরিয়ে এসো।'

দরোজা খুলে বারান্দায় নেমে এল তপু, চোখ ডলতে ডলতে অপুও এল। দেখল সামনেই বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন মামা। সঙ্গে একদল বনপ্রহরী।

'মামা, তুমি!' অপু বলল। এখনও ঘুমের রেশ কাটেনি ওর।

মামা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক প্রহরী মহাবিস্মিত গলায় বলে উঠল, 'স্যার! এটা দেখি মানুষ হয়ে উঠেছে! কাছেই এক ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। মাথা ঝাঁকালেন মামা। 'হওয়ারই কথা। ওটা সাধারণ নেকড়ে নয়।'

'তুমি জানতে ওটার কথা?' তপু বলল।

'লোকমুখে গল্প শুনেছি অনেক, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। আজ করলাম।'

'এমন হলো কি করে? কে লোকটা?' অপু প্রশ্ন করল।

চামড়ার লোভে একসময় শুনেছি হরিণ শিকার করত লোকটা চুরি করে। বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কোত্থেকে নাকি

জাদুবিদ্যা শিখে এসেছে। বনে ঢোকার আগে জাদু করে বাঘ বশ করে নিত, তারপর নিশ্চিন্ত মনে হরিণ শিকার করত।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে বলল তপু।

'এক পূর্ণিমার রাতে নেকড়ের কামড় খেয়েছিল, সেই থেকে এ রকম হয়ে গেছে। তোমাদের ভাগ্য ভাল যে সময়মতো এসে পৌঁছতে পেরেছি আমরা। নইলে কি যে হয়ে যেত আজ!'

পায়ে পায়ে ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ভরা পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় তাকিয়ে থাকল দেহটার দিকে। চিত হয়ে মুখ হাঁ করে পড়ে আছে বুড়ো। বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সোজা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে সে ঘষা কাঁচের মতো দু'চোখ মেলে। দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

ইফতেখার আমিন

দরজার ওপাশে

সবুজ রঙের দরোজা। অনেককাল আগের।

আট ফিট সাড়ে চার ফিট।

সত্যিকার দরোজা মনে হয়।

বাস্তবে, সত্যিকার না, আঁকানো ছবি।

রিয়েলিস্টিক পেইন্টিং।

এত রিয়েলিস্টিক ছবি আজকাল বাংলাদেশের আর্টিস্টরা আঁকেন না। দরোজার পেইন্টাররাও হয়তো আর আঁকবে না। এটা ক্লাস স্টাডি হিসেবে এঁকেছে। একাডেমিক ওয়ার্ক। ফাইন আর্ট ইনস্টিটিটিউটে পি পি কে ধরতে রেইড দিয়েছিল রেজা ইশতিয়াক। পি পি পড়াশোনা করে বাংলায়। প্রেম করে ফাইন আর্ট ইনস্টিটিউটের থার্ড ইয়ারের সুতপার সঙ্গে। সেই হিসেবে ওই এলাকায় তার অবস্থানের সম্ভাবনা আছে। ফাইন আর্ট ইনস্টিটিউটের বিখ্যাত ঘাসপুকুরের পাড়ে বসে থাকে তারা। কপোত-কপোতী। কপোতকে দরকার রেজা ইশতিয়াকের। ধরে ঠ্যাঙাবে।

এটা অক্টোবর মাসের এক বিকেলের ঘটনা।

মিষ্টি একটা রোদ যাই যাই বিকেল। অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া আর আকাশজুড়ে কিউমুলাস মেঘ।

ফাইন আর্ট ইনস্টিটিউট ঘুরে পি পির সন্ধান পাওয়া গেল না। সুতপা বিবিকেও দেখা গেল না। রেজা ইশতিয়াক দেখল ইনস্টিটিউটের গ্যালারিতে এক্সিবিশন হচ্ছে।

ছাত্রদের অ্যানুয়াল এক্সিবিশন।

একাডেমিক কাজ বলে বেশির ভাগ কাজই রিয়েলিস্টিক। পেন্সিলের কিছু কাজ অসাধারণ। জলরঙের অনেক ছবি দেখেও

মুগ্ধ হলো রেজা ইশতিয়াক। সব থেকে মুগ্ধ হলো 'দরোজার ওপাশে' পেইন্টিংটা দেখে। রিয়েল সাইজ দরোজা ওয়ালে আঁকা। তারপরও কীরকম একটা 'ম্যাট' ভাব আছে ছবিটায়। দর্শক কম গ্যালারিতে। রেজা ইশতিয়াক নীরবভাবে অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখল। আর্টিস্টের নাম সারন মুস্তাফী। বিএফএ শেষ বর্ষ।

ছবি বোঝে রেজা ইশতিয়াক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারে পিকাসোর 'ব্লু পিরিয়ড' নিয়ে, ভ্যানগখের 'নাইট ক্যাফে', কামরুল হাসানের 'তিন কন্যা' নিয়ে।

তাকে টানল 'দরোজার ওপাশে'।

অনেকদিন পর একটা পেইন্টিং তাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করল।

এই ছেলেকে পাওয়া যাবে কোথায়? সারন মুস্তাফী?

ফাইন আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে সুতপাকে ফোন করল রেজা ইশতিয়াক। নাম্বার বিজি। ফোন করল পি পির নাম্বারে। নাম্বার বিজি! কুহু কূজন হচ্ছে তা হলে।

শাহজাহানের দোকানে বসে এক কাপ চা খেল রেজা ইশতিয়াক। একটা গোল্ডলিফ সিগারেট নিল। ধরিয়ে আবার ফোন করল। এবার আর নাম্বার বিজি হলো না। সুতপা ধরল, 'রেজা ভাই! আপনি কোথায়?'

'শাহজাহানের দোকানে বসে আছি, মহিলা। আপনি কোথায়?'

'আমি তো বাসায়।'

'আপনার কেষ্টঠাকুর?'

'বলল তো আজিজ মার্কেটে আছে।'

'ধন্যবাদ, মহিলা। আচ্ছা এখন একটা ইনফরমেশন দেন। আর্টিস্ট সারন মুস্তাফীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে? তার ফোন নাম্বারটা দিতে পারবেন?'

‘পারব। কেন, রেজা ভাই?’

‘আমি একটা ফোন করব শালাকে। শুয়োরের বাচ্চা।’

‘এমা! কী হয়েছে? রেজা ভাই?’

‘আপনি কি ‘দরোজার ওপাশে’ দেখেছেন?’

‘সারনদার পেইন্টিং? দেখেছি, কেন?’

‘এত সুন্দর ছবি আঁকে কেউ আর?’

এতক্ষণে হাসল সুতপা, ‘আপনার খুব পছন্দ হয়েছে?’

‘পছন্দ মানে আমি অবসেসড। মনে হচ্ছিল দরোজা খুলে দিলেই ঢুকে পড়া যাবে ভেতরে।’

‘সারনদাকে বলবেন কথাটা। আচ্ছা তার নাম্বারটা আমি এসএমএস করে দিচ্ছি আপনাকে।’

এসএমএস করে দিল সুতপা।

সিগারেটে তিনটা টান দিয়ে নাম্বার ডায়াল করল রেজা ইশতিয়াক।

কেউ ধরল।

বলল, ‘হ্যালো।’

রেজা ইশতিয়াক বলল, ‘সারন... বলছেন?’

‘আপনি কে?’

‘ভাই আমার নাম রেজা ইশতিয়াক।’

‘ও। কী?’

'আমি ভাই আপনার পেইন্টিংটা দেখলাম। 'দরোজার ওপাশে'। কী বলব? অসম্ভব ভাল লেগেছে। আপনি কি হোস্টেলে থাকেন?'

'না, বাসায়।'

'আমি মানে আপনার সঙ্গে একবার কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'একবারই?'

হেসে ফেলল রেজা ইশতিয়াক।

সারন মুস্তাফী বলল, 'আপনি এখন কোথায়?'

'আমি ভাই আপনাদের ইনস্টিটিউটের সামনের ফুটপাথে। শাহজাহানের দোকানে বসে আছি।'

'আপনি কি বৃষ্টির ফোঁটা প্রিন্ট করা একটা নীল টি-শার্ট পরে আছেন?'

'জি, ভাই।'

'সিগারেট টানছেন?'

'জি, ভাই।'

'তা হলে আপনাকে আমি দেখছি। আপনি কি আমাকে দেখছেন? এদিকে তাকান। দেয়ালের এদিকে।'

রেজা ইশতিয়াক তাকিয়ে দেখল ইনস্টিটিউটের দেয়ালের দিকে। আধা বাউল টাইপ এক ছেলে বসে আছে পা ঝুলিয়ে। ফোনে কথা বলছে। গেরুয়া রঙের ফতুয়া পরনে। এই সারন? সারন মুস্তাফী?

এই।

দেয়াল থেকে সে লাফ দিয়ে নামল।

রেজা ইশতিয়াক উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো উজ্জ্বল সারন মুস্তাফীর। দ্যুতিময় এবং বড় বড়।

হ্যান্ডশেক করে তারা বসল।

শাহজাহানকে আবার চা দিতে বলে কোন প্রকার ভূমিকা করল না, স্ট্রেইট কথা বলল রেজা ইশতিয়াক, 'পেইন্টিংটা কি আপনি বিক্রি করবেন?'

'কে কিনবে?' উদাসীন দেখাল সারন মুস্তাফীকে।

'কেউ কিনলে বিক্রি করবেন? আচ্ছা আপনি কী সিগারেট খান?'

'গোল্ডলিফ।'

'আমিও গোল্ডলিফ। শাহজাহানকে আরও দুটা গোল্ডলিফ।—জি, ভাই বলেন।'

সারন বলল, 'মনে হয় তো—'

'জি?'

'বিক্রি করে দেব।'

'কত টাকা হলে?'

'আপনি কিনবেন? কত টাকা হলে কিনবেন?'

'আমার টাকা থাকলে আমি আপনাকে দশ লাখ টাকা দিতাম।' বলল রেজা ইশতিয়াক। বলে বিরতি নিয়ে সিগারেট ধরাল। সারন এর মধ্যে ধরিয়ে ফেলেছে। বুক ভরে একটা দম দিয়ে হাসল। বলল, 'এত? এত লাগবে না। আপনি কত টাকা দিতে পারবেন?'

রেজা ইশতিয়াক বলল, 'পঞ্চাশ হাজার।'

বড় বড় চোখ নির্লিপ্ত থাকল। সারন বলল, 'ঠিক আছে। এক্সিবিশন কাল শেষ হয়ে যাবে, আপনি এসে নিয়ে যাবেন।'

পরদিন রেজা ইশতিয়াক ব্যাংক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলল। রাত নয়টায় 'দরোজার ওপাশে'র হস্তান্তর সম্পন্ন হলো। রাত দশটায় বাসায় ফিরল সে, রেজা ইশতিয়াক। 'দরোজার ওপাশে' কোথায় ঝোলাবে? না ঝুলিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল। সেই থেকে তেমনি আছে পেইন্টিংটা। আরেক ঘরে যাবার দরোজা মনে হয়। মোমের আলোয় আরও বেশি মনে হচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি গেছে বেশিক্ষণ হয়নি। দেড়-দুই ঘণ্টার আগে ফিরবে না। মোম জ্বেলে খাটে হেলান দিয়ে একা বসে আছে রেজা ইশতিয়াক। সারন মুস্তাফী-সংক্রান্ত স্মৃতি কম তার। মনে পড়ছে সেই কয়েকটা স্মৃতিই।

'দরোজার ওপাশে' কিনবার পরদিন সকালেই ফোন করেছিল সুতপা, 'রেজা ভাই!'

'বলেন মহিলা।'

'আপনি সারনদার পেইন্টিং কিনেছেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে!'

'কেন? মানে...'

'রেজা ভাই, আপনি জানেন না, সারনদা ড্রাগ এডিক্ট! হেরোইন নেয়। পঞ্চাশ হাজার টাকা সে হেরোইন নিয়ে উড়িয়ে দেবে!'

'কী বলেন, মহিলা?'

'কেন, তাকে দেখে আপনি বোঝেননি?'

'না, কিন্তু...'

সুতপার সঙ্গে কথা শেষ করেই সারন মুস্তাফীকে ফোন করেছিল রেজা ইশতিয়াক। অনেকবার ডায়াল করেও পায়নি। ফোনের ডিসপ্লেতে নানারকম হতাশাব্যঞ্জক লেখা দেখেছে—ইউজার বিজি, ফেইলড, নেটওয়ার্ক বিজি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্চর্য! এটা কী করে সম্ভব? ছেলেটাকে একবারও অসুস্থ, এডিক্ট মনে হয়নি রেজা ইশতিয়াকের। এই রকম একটা ছেলে! এ কেন ড্রাগ এডিক্ট হবে?—নাকি সুতপা ইয়ার্কি করল? ড্রাগ এডিক্ট একটা ছেলেকে চেহারা দেখে বোঝা যাবে না? কথাবার্তায়

বোঝা যাবে না?

কিন্তু সে রকম কোনও কিছুই মনে হয়নি রেজা ইশতিয়াকের।

কথাবার্তায় কোনরকম অসংগতি সে ধরতে পারেনি।

'জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতা আছে—' বলেছিল রেজা ইশতিয়াক।

কথা শেষ করতে পারেনি। সারন বলল, 'সুবিনয় মুস্তাফী?'

রেজা ইশতিয়াক বলল, 'হ্যাঁ।'

'প্রপিতামহ।' সারন বলল।

'কার? আপনার?'

সারন বলল, 'হ্যাঁ।'

তার সঙ্গে কবিতার একটা চরিত্রের প্রপৌত্র কথা বলেছে!

জীবনানন্দ দাশের কবিতার!

আশ্চর্য!

'সুবিনয় মুস্তাফী জীবনানন্দ দাশের পোলাপান কালের বন্ধু ছিলেন।'

সারন বলল, 'জীবনানন্দ দাশের ডাকনাম ছিল মিলু। জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ। তার ডাকনাম ছিল ভ্যাবলু!'

এসব কি অসংগত কথাবার্তা?

'সুবিনয় মুস্তাফীর পুত্র হিরন্ময় মুস্তাফী। তার পুত্র অশোক মুস্তাফী। আমি অশোক মুস্তাফীর পুত্র।'

অসংগতি কী আছে এই কথায়?

তবে—

চিন্তিত হয়েছিল রেজা ইশতিয়াক।

সুতপাকে ফোন করেছিল সে।

‘মহিলা আপনি কোথায়?’

‘ইনস্টিটিউটে।’

‘ক্লাসে?’

‘আউটডোর ক্লাস।’

‘পি পি বস কি উপস্থিত হয়েছে?’

‘এখনও না।’

‘আচ্ছা মহিলা, কাজের কথা বলি। সারন ছেলেটা কি সিরিয়াসলি এডিক্ট?’

‘হ্যাঁ, রেজা ভাই।’

শীত পড়ে গেছে তারপর। ফাইন আর্ট ইনস্টিটিউটে এর মধ্যে কয়েকবার গেছে রেজা ইশতিয়াক। পি পি, সুতপার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সারনের সঙ্গে দেখা হয়নি। সে নাকি গেছে পাহাড়ি এলাকায়। শীতকাল পাহাড়ে কাটিয়ে ফিরবে।

ফেরেনি আর।

আর কোনদিন, কখনও ফিরবে না।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার আরেকটা চরিত্র হয়ে গেছে সারন মুস্তাফী। মৃত চরিত্র। মরে গেছে ড্রাগ করতে করতে। মৃতদের নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন জীবনানন্দ। সারন মুস্তাফী মরেছে জোছনায়। এবং কুয়াশায়। তার লাশ কাল ঢাকায় আসবে। জানাজা হবে ফাইন আর্ট ইনস্টিটিউটে।—সন্ধ্যায় ফোন করেছিল সুতপা। এসব বলেছে। রেজা ইশতিয়াক তখন আজিজ মার্কেটের 'তক্ষশীলা'য় ছিল। 'তক্ষশীলা'র বইয়ের র‍্যাক দেখছিল। নীরদ মজুমদারের 'পুনশ্চ পায়ী'র রিপ্রিন্ট বেরিয়েছে বলে শুনেছে। পেলে কিনত। প্রথম এডিশনটা ছিল তার কাছে। কোনো এক মার্ক টোয়েন মেরে দিয়েছে। সুতপার ফোন পেয়ে আর 'পুনশ্চ পায়ী' খোঁজা হলো না। রেজা ইশতিয়াক কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে থাকল। তারপর বাসায় ফিরে এসেছে। একটু আগে ফোন করেছিল মুনা।

'তুমি কী করো?'

'বসে আছি। ইলেকট্রিসিটি নাই।'

'কতক্ষণ ধরে?'

'এই তো।'

'তুমি কি 'লাবণ্যপ্রভা' দেখো?'

'হুঁ।'

'লারা মেয়েটাকে তোমার কেমন মনে হয়? লারা লোটাস?'

'হুঁ।'

'অ্যাই তোমার কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'কিছু না বললে তো হবে না। তোমার কি মন খারাপ?'

‘হুঁ।’

‘কী হয়েছে?’

‘সারন মুস্তাফী মরে গেছে।’

‘সারন মুস্তাফী। তোমার ‘দরোজার ওপাশে’র আর্টিস্ট?’

‘হুঁ।’

‘কী করে? না থাক। তুমি মনে হয় খুবই আপসেট। আমি পরে আবার ফোন করব, হ্যাঁ। রাখি এখন।’

মুনা বোঝে রেজা ইশতিয়াককে।

অ্যাডের স্ক্রিপ্ট লেখে রেজা ইশতিয়াক। মুনা ব্যাংকার। অ্যাডমেকিং-এর সূত্রে পরিচয় দু’জনের। সেই পরিচয় থেকে এতদূর। তারা বিয়ে করবে সামনের এপ্রিলে।

মুনা আবার ফোন করবে।

রেজা ইশতিয়াক একটা সিগারেট ধরাল।

শীত পড়েছে এই কয়েকদিন ধরে। রাতে জানালা খোলা রাখা যায় না। কুয়াশা আর ঠাণ্ডার দাপটে। রেজা ইশতিয়াক ট্রাউজারস, একটা টি-শার্ট, একটা ফুলশার্ট আর একটা ফুলহাতা সোয়েটার পরে বসে আছে। সে একটু শীতকাতুরে আছে। সিগারেট টানতে টানতে সে মোমবাতির আলো দেখল। মোম অর্ধেক হয়ে গেছে এর মধ্যেই। আর মোম আছে ঘরে? প্যাকেট থাকার কথা ফ্রিজের ওপরে। থাক এখন! আগে এই মোম শেষ হোক।

কতক্ষণ পুড়ে একটা মোম মরে?

মোমের মতো আয়ু মানুষের।

সুইসাইড করল সারন মুস্তাফী?

এ ছাড়া কী আর!

সারন মুস্তাফীর নাম্বার তার ফোনের ফোনবুকে সেইভ করা আছে। ফোন করল রেজা ইশতিয়াক। একবার, দুবার, কয়েকবার।

কে ধরবে?

রেজা ইশতিয়াক সিগারেটে টান দিতে গিয়ে দেখল সিগারেট নিভে বসে আছে কখন! শীতকালের একটা মেজর সমস্যা। সিগারেট 'ড্যাম' মেরে যায়।

সে কি আরেকটা সিগারেট ধরাবে?

না।

ঝিম মেরে বসে থাকল গুটিয়েসুটিয়ে।

মুনা ফোন করছে না কেন?

'দরোজার ওপাশে' মুনারও পছন্দ।

দরোজার ওপাশে!

দরোজার ওপাশে কী?

পেইন্টিংটা দেখল রেজা ইশতিয়াক।

মোমের ম্লান আলো দরোজায় পড়েছে।

দরোজার সবুজ রং কেমন একটা অন্যরকম সবুজ দেখাচ্ছে।

'রেজা ভাই!'

কে ডাকল?

নাকি ডাকেনি?

'ও, রেজা ভাই!'

না, ডাকছে!

কে ডাকছে? কোত্থেকে ডাকছে?

এদিক-ওদিক তাকাল রেজা ইশতিয়াক। কাকে দেখবে বা কী দেখবে? কিছুই দেখল না।

'রেজা ভাই! ও, রেজা ভাই!'

রেজা ইশতিয়াক বলল, 'কে?'

'রেজা ভাই, আমি। আমি সারন।'

কী? সারন? সারন মুস্তাফী?

রেজা ইশতিয়াকের মনে হলো তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

সারন মুস্তাফী তাকে কোত্থেকে ডাকবে? কী করে?

কিন্তু আবার।

কোথাও থেকে ডাকল সারন মুস্তাফী, 'রেজা ভাই!'

কানে আঙুল দিল রেজা ইশতিয়াক। ভুল শুনছে সে! অবশ্যই ভুল!

না, ভুল নয়।

আবার ডাকল সারন মুস্তাফী, 'রেজা ভাই, শুনছেন?'

রেজা ইশতিয়াক বলল, 'আপনি কোথায়?'

'দরোজার এপাশে।'

'কী?'

'দরোজার এপাশে, রেজা ভাই। দরোজাটা একটু খুলে দিন না!'

রেজা ইশতিয়াক বলল, 'দরোজার ওপাশে?'

'এই দরোজার এপাশে, রেজা ভাই।'

কোন্ দরোজা?

...আরে লেখাটা কীসের? ক্যালিগ্রাফি : ' এক্সিবিশনের দিন।' এটা কোত্থেকে এল পেইন্টিংয়ে? দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না।

...কিন্তু সারন কি এই পেইন্টিং-এর দরোজার কথা বলছে?

এই দরোজা রেজা ইশতিয়াক কী করে খুলবে? তার মানে হলো, সে কি সম্মোহিত হয়ে পড়েছে? সম্মোহিত মানুষের মতো সে উঠল। পেইন্টিং-এর দরোজার শিকল আটকানো। মনে হচ্ছে ছবিটা থ্রি ডি। দরোজার কপাট , সবুজ রং, শিকল।

'ও, রেজা ভাই!'

এখন মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি দরোজার ওপাশে আছে সারন মুস্তাফী।

সবুজ দরোজা আটকানো শিকলে হাত দিল রেজা ইশতিয়াক এবং শিকল খুলে দিল! পেইন্টিং-এর দরোজার শিকল!

নিঃশব্দে খুলে গেল দরোজা।

রেজা ইশতিয়াক ভাবল, তার মগজের কিছু একটা অংশ জমে বরফ হয়ে গেছে মনে হয়। সে কিছু চিন্তা করতে পারছে না।

দরোজার ওপাশে কোনও ঘর না, একটা প্যাসেজ। সারন মুস্তাফীকে দেখা গেল না। কিন্তু আবার সে ডাকল, 'রেজা ভাই!'

নিশির ডাকের মতো শোনাল ডাকটা। নিশিতে পেয়েছে এ রকম দেখাল ঘোরগ্রস্ত রেজা ইশতিয়াককে। সবুজ দরোজার চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল সে। সারন ডাকল প্যাসেজের অন্যপ্রান্ত থেকে, 'রেজা ভাই!'

কতক্ষণ হাঁটল রেজা ইশতিয়াক?

এক মিনিট? দেড় মিনিট?

প্যাসেজ ধরে হাঁটল।

প্যাসেজ শেষ হয়েছে আরেকটা দরোজায়।

এই দরোজার রং-ও সবুজ। বিবর্ণ সবুজ।

দরোজা ভেজানো।

কোত্থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দরোজার একটা পাট খুলে দিয়ে গেল।—এই দরোজার ওপাশে ঘর। পঁচিশ ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে ঘরে? রেজা ইশতিয়াক ঘরের খানিকটা দেখল। কাগজপত্র ক্যানভাস রং আর সিগারেটের ফিল্টার।—ছড়ানো ফ্লোরময়। এটা সারন মুস্তাফীর ঘর?

রেজা ইশতিয়াক ডাকল, 'সারন!'

'রেজা ভাই!'

ঘরে ঢুকল রেজা ইশতিয়াক।

পুরনো একটা ক্যাম্প খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে সারন। সারন মুস্তাফী। রেজা ইশতিয়াক বড় বড় চোখ দুটো দেখল। চোখের মণি আশ্চর্য নীল হয়ে আছে সারন মুস্তাফীর।...না সবুজ।...না হলুদ।...না কমলা...

'আপনার কাছে সিগারেট আছে, রেজা ভাই?'

এখন চোখের মণি ফ্লুরোসেন্ট রেড।

'রেজা ভাই!' বলে হাসল সারন মুস্তাফী। নিঃশব্দ হাসল, সিগারেট।'

এখন চোখের মণি পার্পল।

সম্বিত ফিরল রেজা ইশতিয়াকের?

মগজের ঠাণ্ডা কিছুটা কমল?

সে চিন্তা করল, কী হচ্ছে? সে এই ঘরে কেন?

সারন মুস্তাফী বলল, 'দেন না একটা সিগারেট টানি।'

সিগারেটের প্যাকেট আছে পকেটে।

কী করবে রেজা ইশতিয়াক?

ঘুরে একটা দৌড় দিল সে।

এছাড়া আর কী করবে? এক দৌড়ে ঘর, প্যাসেজ পেরিয়ে পেইন্টিং-এর দরোজার কাছে এসে থামল। দম নিল। দরোজা ভেজানো? না। সে ধাক্কা দিল দরোজার কপাটে। দরোজা খুলল না। অথচ ভেতর থেকে আটকানো হয়নি। তা হলে? তা হলে কী? দরোজার ওপাশ থেকে কেউ দরোজার শিকল তুলে দিয়েছে? কে?

ঠাণ্ডা লাগল রেজা ইশতিয়াকের। এমন ঠাণ্ডা, মনে হলো তার সমস্ত রক্তকণিকা জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। দরোজা ধরে সে টানল, ধাক্কাল।

অনড় থাকল সবুজ পুরানো দরোজা।

কে এই কাজটা করল?

মোবাইল ফোন আছে না ট্রাউজারসের পকেটে? এতক্ষণে মনে পড়ল এবং ফোনটা বের করল রেজা ইশতিয়াক। কিন্তু ফোনের ডিসপ্লে 'সাদা' হয়ে আছে। ফোন ডেড। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ডিসপ্লেতে একটা অক্ষর দেখা গেল না। অথচ চার্জ

ফুরানোর কথা নয়। ব্যাটারি ডাউন হওয়ার কথা না। সেটটা সে আট-নয়দিন হলো নিয়েছে। তা হলে?—সারন কি আছে দরোজার ওপাশে? মনে হলো রেজা ইশতিয়াকের। সারন মুস্তাফী?

রেজা ইশতিয়াক ডাকল, 'সারন!'

'রেজা ভাই!' উত্তর দিল সারন। দরোজার ওপাশ থেকে উত্তর দিল, তা হলে? প্যাসেজের শেষ প্রান্তের ঘরে কাকে দেখে এল রেজা ইশতিয়াক?

সারন বলল, 'ও, রেজা ভাই!'

রেজা ইশতিয়াক বলল, 'সারন! দরোজাটা একটু খুলে দেবেন, প্লিজ!'

'না, রেজা ভাই, খুলব না।'

এই কথা বলে সারন কি হাসল?

চাপা গলায় হাসল।

রেজা ইশতিয়াক আবার ডাকল, 'সারন!'

'সরি, রেজা ভাই!' সারন বলল। অসম্ভব ঠাণ্ডা একটা অপার্থিব গলা বলল।

রক্তকণিকা এবং নিউরনে ঠাণ্ডা, রেজা ইশতিয়াক বন্ধ সবুজ দরোজা দেখল। তা হলে আটকা পড়ে গেছে সে? দরোজার এপাশে? সারন মুস্তাফী দরোজা খুলবে না।...তা হলে এখন?

পায়ের শব্দ।

স্লো মোশনে ঘুরল রেজা ইশতিয়াক। সারনকে দেখল। প্যাসেজে, অদূরে। তা হলে দরোজার ওপাশে কে? দরোজা কে আটকে দিয়েছে?

অল্পদূরে এখন সারন মুস্তাফী। রেজা ইশতিয়াক তাকে দেখছে। দেখছে। দেখছে।

কথা বলল সারন মুস্তাফী। অসম্ভব ঠাণ্ডা একটা করুণ, কাতর, অপার্থিব গলা ফিসফিস করে বলল, ‘রেজা ভাই, সিগারেট দিলেন না!’

ধ্রুব এষ

রাক্ষসী

এক

এই কংক্রিট শহরের বুকে ঠিকমতো আকাশেরই দেখা মেলে না, জোছনার দর্শন কী করে মিলবে? তবু আকাশে চোখ রেখে ব্যাপারটা অনুভব করার চেষ্টা করে রাশেদ। ভীষণ উজ্জ্বল রুপালি চাঁদটা ঠিক মাথার ওপরে। ঠিক এখনই যদি নিভে যেত এই সড়কটার সবগুলো স্ট্রিট ল্যাম্প, মার্কেটগুলোর রঙিন আলো আর যানবাহনের হেডলাইট—তা হলে হয়তো জোছনা অবতরণ করতে পারত নগরীর বুকে। দেখতে দেখতে পিচঢালা সড়কটা হয়ে যেত রুপালি ছায়াপথ।

অবশ্য স্বপ্নই দেখা যেতে পারে শুধু। মস্ত বড় এই শহরে লাখো স্বপ্ন যেমন ভাঙে প্রতিদিন, তেমনি পূরণও হয়। কিন্তু জোছনায় ভেজার স্বপ্নপূরণের ক্ষমতা যে এই নগরীরও নেই।

ক্লান্ত, অবসন্ন, বিষণ্ন রাশেদ একা একা হাঁটে বাড়ির পথে। কেন যেন আজকাল মনের শরীরে সরীসৃপের মতো বিষণ্নতা জড়িয়ে থাকে সবসময়। দিন শেষে বাড়ি না ফেরার আগ পর্যন্ত কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। আজব সব ইচ্ছা জাগে মনে, যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারা যায় না। অদ্ভুত সব ব্যাপারে মন অকারণ আগ্রহী হয়ে ওঠে...

বাড়ি এসে গেছে। দরোজায় দাঁড়ানো আয়শার মুখটা দেখামাত্র আজেবাজে ভাবনা নিমিষে উড়ে যায় মন থেকে। কী ভীষণ মিষ্টি একটা মুখ। টলটলে চোখ জোড়ার দিকে তাকানো মাত্র বুকের মাঝে বর্ষা নামে, ছড়িয়ে পড়ে স্নিগ্ধ প্রশান্তির কণা।

সত্যি কথা বলতে কী, আয়শার মতো স্বচ্ছ মনের মানুষ খুব বেশি দেখা যায় না। সোজা-সরল, নির্লোভ, নিরহংকার একজন মানুষ। আশপাশে সবাই যখন যুগের তীব্র গতির সাথে তাল মেলাতে ব্যস্ত, আয়শা তখন ডুবে আছে নিজের ভিন্ন জগতে। কলুষতাবিহীন, অন্যরকম একটা জগৎ। মানুষ প্রাণীটাকে ভীষণ ভালবাসে সে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিংবা পাড়া-পড়শী—সকলের জন্যই তার খুব টান।

আলতো করে হাসে আয়শা। হাত থেকে বাজারের ব্যাগগুলো নিয়ে দরোজা বন্ধ করে।

'তোমার অফিস এত কাজ করায় কেন বলো তো?'

'হঠাৎ এ কথা?'

'আজও ফিরতে দেরি হলো তোমার!'

হেসে ফেলল রাশেদ। 'শুধু অফিসকে দোষ দিচ্ছ কেন? এমনও তো হতে পারে অন্য কোথাও ছিলাম আমি। হয়তো কোনও সুন্দরীর সাথে...'

'ইস অত সোজা? তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসতে পারোই না।'

'এত বিশ্বাস করা ভাল না, ম্যাডাম!... রোকসানা কই?'

'ঘুমাচ্ছে। তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি খাবার দিচ্ছি টেবিলে।'

আয়শা চলে যায় কিচেনে। বাথরুমে ঢোকার আগে রোকসানার ঘরের দিকে একবার উঁকি দেয় রাশেদ। এ কদিনেই মেয়েটার চেহারা একদম ফিরে গেছে। স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। মুখটায় ফিরে এসেছে শিশুসুলভ স্বাভাবিক চাপল্য।

এই আরেকটা ব্যাপার আয়শার। আশ্চর্য সুন্দর। রাস্তা থেকে এতিম ছেলে-মেয়ে বাড়ি নিয়ে আসে সে। বলে যে কাজের লোক হিসেবে নিয়ে এলাম। কিন্তু আসলে কাজ করানোর চাইতে আদরই করে বেশি। ওসব ছেলে-পিলেরা অবশ্য কেউ-ই বেশি দিন থাকে না। রাস্তায় রাস্তায় বেড়ে ওঠা ছেলে-পিলেদের মন কি আর চার দেয়ালের মাঝে টেকে? কিছুদিন ভালমন্দ খেয়ে, নতুন কিছু জামাকাপড় পেলেই পালায় এরা। যাওয়ার আগে চুরি-চামারিও করে বোধ হয়। তবে সেটা নিয়ে আয়শা কখনও উচ্চবাচ্য করে না। এবং হালও ছাড়ে না। আবার একজনকে খুঁজে নিয়ে আসে। এবং আশা করে এইবারের জন হয়তো তাকে ছেড়ে যাবে না। হয়তো!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাশেদ।

বিধাতা তাদের একটি সন্তান কেন দিচ্ছেন না? বিয়ের পর একে একে পাঁচটা বছর পার হয়ে গেছে। এখন তো আয়শা এ ব্যাপারে কথা পর্যন্ত বলে না। বোঝাই যায়, আশা করাও ছেড়ে দিয়েছে। এবং এ-ও বোঝা যায় যে রাস্তার অনাথ শিশুগুলোকে ভালবেসে মাতৃত্বের অতৃপ্ত সাধটাই পূরণ করার চেষ্টা করে সে।

ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি হয়েছে বিস্তর। দুজনের কারোরই কোন সমস্যা নেই। কিন্তু...

এই একটা কিন্তুই নীরব সমস্যা হয়ে জেপে আছে পাথুরে দ্বীপের মতন, রাশেদ-আয়শার দাম্পত্যের প্রশান্ত নীল সমুদ্রে!

সম্ভবত আজীবনই থাকবে।

দুই

খিদে পেয়েছে সাংঘাতিক। আয়শা কোথায়? ও হ্যাঁ, মার্কেটে।

নিজেই এসে ফ্রিজ খোলে রাশেদ। সে রকম কিছু নেই, পাঁউরুটি আর কোল্ড ড্রিংকস ছাড়া। আয়শা ফ্রিজে রাখা খাবার কখনও রাশেদের সামনে আনে না। স্বামীর পছন্দ নয়, জানা আছে তার।

একটা প্লেটে কয়েক স্লাইস ভাজা মাংস দেখা যাচ্ছে। কী করা যায়? স্যান্ডউইচ করা যেতে পারে...হ্যাঁ, সেটাই সহজ। দু স্লাইস রুটিতে পুর করে মেয়োনিজ মাখিয়ে কয়েক স্লাইস মাংস, একটু সিদ্ধ ডিম, একটা লেটুসপাতা আর অল্প গোলমরিচ। ব্যস, রেডি টু ইট!

উমমম! দারুণ!

নিজের প্রতিভায় নিজেই বিস্মিত হয় রাশেদ। রান্না করাটা তা হলে খুব বেশি একটা কঠিন কিছু নয়। চাইলেই শেখা যেতে

পারে। ইচ্ছা থাকতে হবে।

'তুমি এটা কী খাচ্ছ?' স্যান্ডউইচটা হাতে দেখে রীতিমতো চিৎকার করে ওঠে আয়শা। 'দেখি! আমাকে দেখাও!'

'আরে, একটা স্যান্ডউইচ তো। ফ্রিজে যে মাংসের স্লাইস ছিল...'

'সেই মাংস দিয়ে বানিয়েছ? হায়, খোদা! ফেলে দাও। এক্ষুনি ফেলে দাও। এক্ষুনি!'

নিজেই স্যান্ডউইচটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে আয়শা।

'কী হলো?' বিস্মিত রাশেদ। 'সমস্যা কী?'

'ওই মাংস খাওয়া যাবে না। অনেক দিনের পুরনো। আমি তোমাকে অন্য কিছু করে দিচ্ছি।'

'অনেক দিনের পুরনো তো ফেলে দাওনি কেন?'

'ভুলে গেছি।' উদ্বিগ্ন দেখায় আয়শাকে। 'তুমি কতটুকু খেয়েছ ঠিক করে বলো তো!'

'বেশি না। ৩/৪ কামড় দিয়েছি।'

এবার একটু হাসল আয়শা। 'ডায়রিয়া হলে কিন্তু আমার দোষ নেই।'

'নাহ্। এত সামান্যে কারও শরীর খারাপ হয় না।'

'হতেই পারে। মানুষেরই তো শরীর...'

আয়শার কথাই অবশ্য ঠিক হয়েছে। সত্যিই রাতে শরীরটা বেশ খারাপ হয়েছিল। ডায়রিয়া হয়নি, তবে বমি-টমি করে যাচ্ছেতাই অবস্থা। দু'দিন অফিস কামাই হয়েছিল।

ঘটনাটা বেশ আগের। ৬/৭ দিন তো হবেই। রোকসানাকে যেদিন প্রথম বেড়াতে নিয়ে গেল আয়শা, সেদিনকার ঘটনা। শরীর ভাল হয়ে গেলেও বোধহয় মনটা হয়নি। সেদিনের পর থেকে খাবার টেবিলে বসলেই কেমন যেন অনীহা লাগে। কখনও কখনও

বমি পায়। অথচ পেটে রাক্ষুসে খিদে। পুরানো, বাসি মাংস ছিল। না জানি কত রকম জীবাণু বাসা বেঁধে ছিল...

'তুমি আবার ওইসব হাবিজাবি ভাবছ?'

একটু বিব্রতই বোধহয় হলো রাশেদ। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে বলে, 'তুমি তো দেখছি কিছুই খাচ্ছ না। এতকিছু আমি একা খাব নাকি?'

'আমি কোন কালে বেশি খেতাম?'

'এত অল্প খেয়ে তুমি বেঁচে থাকো কী করে—সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।'

কথাটা অবশ্য সত্যি। আয়শা প্রায় কিছুই খায় না। যেন অনেকটা নিয়ম রক্ষার জন্যেই খাবার টেবিলে বসে। ভাত-ডাল-সবজির মতো স্বাভাবিক সব খাবারে তার ভীষণ অনীহা।

প্রিয় হচ্ছে কোল্ড ড্রিংকস, চকোলেট আর কালো কফি। প্রিয় বললেও ভুল হবে। এই তিনটা আয়শার প্রধান খাদ্য।

'তুমি এটা একটু ট্রাই করে দেখো তো!' ফ্রিজ থেকে ছোট্ট একটা বাটি বের করে দেয় আয়শা। 'একটু খেয়ে দেখো। মনে হয় ভাল লাগবে। কদিন যাবৎ তো একদম না খেয়ে আছ।'

খাবারটা এমন আহামরি কিছু না। ছোট ছোট মাংসের টুকরা। মশলায় কালো রঙ হয়ে গেছে। রঙ আর গন্ধ—দুটোই আচারের মতো।

'এটা তো আচার মনে হচ্ছে।'

'আচার-মাংস বলে একে। তুমি একটু খেয়েই দেখো না। ভাল লাগবে।'

সত্যিই তাই। ভীষণ ভাল লাগে রাশেদের। অনেকদিন পর আরাম করে খেতে পারে সে। মন ভরে, পেটপুরে। মাংসটা কাঁচা না রান্না করা, সে নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায় না।

একটু লক্ষ করলেই রাশেদ দেখতে পেত যে তার স্ত্রীর চোখে ভর করেছে অন্য রকম আলো। কীসের যেন সংকেত দুচোখের

সেই আলোয়!

তিন

অফিসে আজকাল একদম ভাল লাগে না। একটুও মন বসে না কাজে। শরীর খারাপ লাগলে কারই বা কাজ করতে ইচ্ছা হয়?

'তোর চেহারার কী হাল হয়েছে দেখেছিস?' কোমল কণ্ঠে বলে সুমন। বন্ধু, কলিগ। 'আমার মনে হয় ক'টা দিন ছুটি নে। বাসায় শুয়ে-বসে থাক। অথবা ভাবীকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যা।'

'কী লাভ? এত ডাক্তার দেখালাম, কেউ তো কোনও শারীরিক সমস্যা খুঁজে বের করতে পারে না। বলে—সমস্যা আপনার মনে।'

'আমি জানি না। আমার কিছু খেতে ভাল লাগে না। খাবার দেখলেই বমি পায়। কোনরকম চা-কফি খেয়ে বেঁচে আছি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সুমন। তারপর বলে, 'মানসিক চিকিৎসক দেখিয়েছিস?'

'হুঁ। তবে লাভ কী? একগাদা ঘুমের ওষুধ দিল শুধু।'

'ভাবী কী বলে?'

'তোর ভাবী তো সারাদিন কান্নাকাটি করে। নিজেকে দোষ দেয়। বলে, সে বেখেয়ালে বলেই নাকি পঁচা মাংসগুলো ফ্রিজে রয়ে গেছিল।'

'বেচারী! এমনটা ভাবতেই পারে। তোকে যা ভালবাসে! কপাল নিয়ে এসেছিলি দুনিয়ায়।'

‘আর কপাল! আজকাল মনে হয় আয়েশাকে একা ফেলে মরে-টরে না যাই।’

‘যা ব্যাটা, আজেবাজে কথা বলিস না। সবকিছুই তো করে দেখলি, এখন আমার সাথে এক জায়গায় যাবি?’

‘কোথায়?’

‘গেলেই দেখতে পাবি। সন্ধ্যায় যাব। অফিসের পর।’

ঠিক সন্ধ্যায় নয়, অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে আটটা বেজে যায়। তবু সুমন নাছোড়বান্দা। ঠিকই রাশেদকে ধরে নিয়ে যায় সে। এমন একটা জায়গা, যেখানে প্রবেশের কথা চিন্তাও করতে পারে না রাশেদ।

সরু, নোংরা গলি। দুপাশে ছাপড়া ঘর। ডাস্টবিনের উৎকট গন্ধ বস্তির সর্বত্র। প্যাঁচপেঁচে কাদা গলিতে। হাঁটতে গেলে জুতো দেবে যায়।

যে ঘরে লোকটার দেখা মেলে, তারও বাইরের অবস্থা একই রকম। আর ভেতরে প্রবেশ করতেই সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবী। মোটা কার্পেট পাতা মেঝেতে। বিবর্ণ, পুরানো। সিলিংয়ে ঝোলানো পুরানো ঝাড়বাতিও ছড়াচ্ছে ম্লান আলো। এছাড়া ঘরটিতে আসবাব বলতে শেলফের পর শেলফ ভরা বই আর ঝাড়বাতির নিচে পাতা সেগুন কাঠের চওড়া টেবিলটা। যার অপর প্রান্তে বসা বৃদ্ধও সাজসজ্জার মতোই প্রাচীন।

‘আসসালামু ওয়ালাইকুম, বাবারা।’ ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বলেন তিনি। ইশারায় বসার ইঙ্গিত করেন।

সুমনের সাথে বৃদ্ধের সৌজন্য বিনিময়সূচক কথা হয় কিছু সময়। রাশেদকে নিয়েও কথাবার্তা হয় বিস্তর। কিন্তু কিছুই পৌঁছায় না রাশেদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত। নিজেকে কেমন জড় পদার্থের মতো লাগে।

একসময় রাশেদের দুটো হাত ধরেন বৃদ্ধ। আর হাত দুটো ধরে ঝিম মেরে বসে থাকেন দীর্ঘসময়। ঘরের কোথায় যেন ধূপ জ্বেলে দিয়ে গেছে একজন। কী যে জঘন্য লাগছে গন্ধটা!

‘তোমার বাসার মানুষদের মধ্যে একজন আছে...’

কথা শেষ করতে পারেন না বৃদ্ধ। তার আগেই সুমন বলে ওঠে, ‘ওর বাসায় আর মানুষ কই! স্রেফ ও আর ভাবী।’

‘আর কেউ নেই?’ এবারও রাশেদকেই প্রশ্ন করেন তিনি।

‘আছে। একটা মেয়ে আছে এখন। রোকসানা।’ ক্ষীণ সুরে বলে রাশেদ। ‘আমরা নিঃসন্তান। মাঝে মধ্যেই আমার স্ত্রী রাস্তার ছেলেমেয়েদের নিজের কাছে এনে রাখে। ভীষণ ভালবাসে তাদের। ওদের নিয়েই আয়শার দিন কাটে।’

‘তোমার কিছু খেতে ভাল লাগে না, তাই না?’

‘সেদিন সেই পচা মাংস খাওয়ার পর থেকে... সবসময় মনের ভেতর অস্থির লাগে। কোন কাজে আগ্রহ পাই না। অসম্ভব ক্লান্ত শরীর।’

‘তা হলে সবার আগে তোমার প্রয়োজন খাদ্য এবং বিশ্রাম।’ বলতে বলতে ভেতর বাড়ির দিকে রওনা হন বৃদ্ধ।

সাথে সাথে বাধা দেয় রাশেদ।

‘আপনি কষ্ট করবেন না, চাচা। আমি সত্যি কিছু খেতে পারি না।’

মৃদু হাসেন তিনি, ‘দেখা যাক, আমি পারি কিনা তোমার পছন্দসই কিছু খাওয়াতে।’

চার

টেবিল ভরে সাজানো হয় নানান পদের খাদ্যসমগ্রী। অতিথি আপ্যায়নের চূড়ান্ত আয়োজন। সুমন তো খুশি হয়েই প্লেট টেনে নেয় কাছে, কিন্তু রাশেদের দেখেই অসহ্য লাগতে শুরু করে। কয়েক রকমের কাবাব, নানরুটি নানা রকম মিষ্টি-ফিরনি কিংবা শরবত—সব দেখেই বমি বমি ভাব হয়। ইচ্ছে হয় ছুটে পালিয়ে যেতে।

মৃদু হাসেন বৃদ্ধ। ভেতর বাড়ি থেকে পৃথক একটা প্লেট এনে রাখেন রাশেদের সামনে। মাথায় হাত রাখেন কোমল ভঙ্গিতে।

'তুমি ক্ষুধার্ত, বাবা। খাও! নিঃসংকোচে খাও। না খেলে মানুষ বাঁচবে কী করে? তুমি খাও।'

সত্যিই তাই করে। খাবারটুকুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশেদ। খাবারটা ভালই। সেদিন রাতে আয়শার দেয়া মাংসের মতো অত ভাল না। তবে ভালই। অন্তত দীর্ঘদিন পর কিছু খেতে তো পারা যাচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হয়। রাক্ষুসে খিদেটা মিটে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাশেদ। রাত হয়েছে অনেক, সুতরাং বিদায় নেয় সুমন। সত্যি কথা বলতে কী, বৃদ্ধ তাকে সরাসরিই বলেন চলে যেতে। রাশেদের সাথে একান্তে কথা বলতে চান তিনি। কিছু কথা কারোর সামনেই বলা যায় না।

বুদ্ধিমান সুমন অবশ্য এতে কিছু মনে করে না। জানিয়ে যায়, গলির সামনে পান-সিগারেটের দোকানে অপেক্ষা করবে সে।

'আমাদের কী খাওয়ালেন আপনি, চাচা?'

আবার হাসেন বৃদ্ধ। 'তোমার ভাল লেগেছে?'

'হ্যাঁ। অনেকদিন পর কিছু খেতে পেরেছি। জিনিসটা কী ছিল?'

'গরুর মাংস... কাঁচা গরুর মাংস! মসলায় মাখানো।'

আঁতকে ওঠে রাশেদ। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আঁতকে উঠলেও ঘেন্না হয় না একটুও। বমিও করতে ইচ্ছা হয় না। বরং পেট পুরে খাওয়ার পর শরীরে ছড়িয়ে যাওয়া আরামদায়ক উষ্ণতাটা একরকম উপভোগই করে।

'এটা কী করে সম্ভব? এতকিছু থাকতে কাঁচা মাংস কেন ভাল লাগবে?'

'লাগতে পারে, বাবা। লাগতেই পারে। পৃথিবীতে আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে কত কিছু আছে। সব কি আমরা জানি?'

'কিন্তু ... What's wrong with me?'

'উত্তেজিত হয়ো না, বাবা। হয়তো তোমাকে একটুখানি ব্যাখ্যা করতে পারব আমি। কিন্তু বেশি না।' একটু দম নেন বৃদ্ধ।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন। ‘অনেক বছর আগে একজন মহিলা এসেছিলেন আমার কাছে। কমবয়সী গৃহবধূ, গর্ভবতী। সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই তার শুধু কাঁচা খাদ্য খেতে ইচ্ছা করত। অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র মাংস।’

‘কিন্তু কেন?’

‘আমি ঠিক জানি না। চেষ্টা করেছি, জানতে পারিনি। প্রতিটি মানুষের মাঝে কোথাও একটা অন্ধকার জগতের অস্তিত্ব থাকে। আমরা যতই চেষ্টা করি, একে অস্বীকার করা সম্ভব না। আমার মনে হয়, কোনও বিশেষ ঘটনা এই অন্ধকার অংশকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সেই মহিলার সাথে সে রকম কিছু ঘটেছিল। তোমার সাথেও ঘটেছে। আমার সে রকমই ধারণা।’

‘সেই পচা-বাসি মাংস খাওয়ার ঘটনা...’

‘হ্যাঁ, হয়তো সেটাই। কিন্তু তা কোন সাধারণ মাংস হয়ে থাকলে তেমনটা হবার কথা নয়।’

‘তা হলে?’

‘অনেক প্রেত সাধকেরা কাঁচা মাংস খেয়ে থাকে। সেটাই তাদের প্রধান খাদ্য... আমার মনে হয় তোমার বাসায় এমন কেউ আছে, যে প্রেত সাধনা করে থাকে।’

‘কিন্তু আমার বাসায় তো...’

‘আমি জানি। তুমি আর তোমার স্ত্রী আছে শুধু।’

‘তা হলে...তা হলে কি, আয়শা?’

‘হতে পারে, অসম্ভব কিছু না। এটা একটা মানসিক অসুবিধা। ঠিকমতো চিকিৎসা করালে ভাল হয়ে যাবে।’

‘তোমার সমস্যাটার সমাধান তোমার নিজের হাতে। তুমি ইচ্ছা করো, নিজের অন্ধকার জগতের পথ রোধ করে দাঁড়াও...’

আরও অনেক অনেক কথাবার্তা হয়। কিছু বুঝতে পারে রাশেদ; কিছু পারে না। নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো এলোমেলো পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে, খুঁজে বের করে সুমনকে।

‘উনি কী করেন, সুমন? ওনার পেশা কী?’

হাসে সুমন। ‘কার কথা বলছিস?’

‘ওই যে...ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক!’

‘তার আগে বল, তোর সমস্যাটা মিটেছে? শরীর খারাপ ভাবটা কমেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘মাথা ঘোরা কমেছে? আর ক্লান্ত লাগছে না তো?’

‘একদম না।’

‘বমি বমি ভাবটা গেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘উনি কী বলেছেন তোকে?’

‘বলেছেন, পুরো ব্যাপারটা আমার হাতে। আমার ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল।’

‘খুব ভাল কথা। দেখ তো, এটা খেতে পারিস নাকি।’ বলে একটা ক্যান্ডিবার রাশেদের দিকে বাড়িয়ে দেয় সুমন। রাশেদের প্রিয় ক্যান্ডিবার।

খাওয়া যায় সহজেই। খেতে ভালও লাগে। রিকশা করে যেতে যেতে বেনসনও সাবাড় করা হয়। মনটা ভীষণ ফুরফুরে লাগে রাশেদের।

যাক্ বাবা, সমস্যা তো মিটেছে!

‘থ্যাংকস, দোস্ত!’ ভীষণ আন্তরিক কণ্ঠে বলে রাশেদ। ‘তোর জন্যে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেলাম আমি। তুই যদি

ভদ্রলোকের কাছে না নিয়ে...'

মিটিমিটি হাসে সুমন। 'ওনার পেশা কী জানিস?'

'কী?'

'ঝাড়-ফুঁক। মানে ভূত-প্রেতে ধরা মানুষের "চিকিৎসা" করেন আর কী।'

ভীষণ বিস্মিত হয় রাশেদ। 'How silly! তুই আমাকে ভূতের ওঝার কাছে নিয়ে গিয়েছিলি? একবিংশ শতাব্দীতে এসব কথা কেউ বিশ্বাস করে?'

'করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি শুধু তোকে একটা ঝাঁকি মারতে চেয়েছিলাম। মেডিকেল সায়েন্সের প্রতি ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলি। তাই ভাবলাম উদ্ভট একটা জায়গায় রহস্যময় পরিবেশ আর অন্যরকম একটা মানুষ হয়তো নিজের প্রতি তোর বিশ্বাসটা ফিরিয়ে দিতে পারবে। এই বৃদ্ধের কথা বলার ভঙ্গিটা সাংঘাতিক। যাই বলে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।'

সুমন লক্ষ করে না, কিন্তু খুব সাবধানে বুকে জমে থাকা দূষিত ভাবনগুলো বের করে দেয় রাশেদ। সত্যিই তো, একটা লোক বলল আর আয়শাকে নিয়ে আজেবাজে ভাবনা ভাবতে শুরু করে দিল সে? এর চাইতে আহাম্মকি আর হতে পারে না!

ভূতের ওঝা!!!

ভাবতে গিয়ে নিজেরই হাসি পায় রাশেদের। সুমনের নিশ্চয়ই নাটকটার পিছনে বেশ কিছু টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে। এমনিতেও দিলে নেবে না। পায়ে ধরে সাধলেও না। সুতরাং ভাল দেখে একটা উপহার কিনে দিতে হবে...

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাসায় পৌঁছে যায় রাশেদ। রোকসানার জ্বর এসেছে। মাথার কাছে বসে কপালে পানি দিচ্ছে আয়শা। একটু পরপর চোখ মুছছে। সেবা করবে কী, নিজেই কাঁদতে কাঁদতে অস্থির বেচারী।

গভীর ভালবাসা নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে রাশেদ। পৃথিবীতে এত মমতাময়ী বোধহয় অন্য কোন নারী নেই!

পাঁচ

খুব সন্তর্পণে ঘটে ব্যাপারটা। বুঝি বাতাসও কিছু আঁচ করতে পারে না।

শরীরের নিবিড় সান্নিধ্যে ছিল আয়শা, নিঃশ্বাসের একান্তে। গভীর রাতের বুকে ভালবাসার গল্প বুনে যাচ্ছিল দুটো শরীর। সরব নীরবতায়...

যেন হঠাৎই বদলে যায় আয়শার অপরূপ মুখটা। হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়...

যেন... যেন মানুষের মুখটা বদলে হয়ে যায় কোনও জানোয়ারের মুখ। কোন পিশাচের মুখ। কোনও... কোনও প্রেতের চেহারা!

প্রাণীটা উঠে বসে বুকের ওপরে... দম বন্ধ হয়ে আসে... একটুখানি অক্সিজেনের আকাঙ্ক্ষায় আঁকুপাঁকু করে জোড়া ফুসফুস...

লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসে রাশেদ।

উফ!!!

কী ছিল ওটা? স্বপ্ন? স্বপ্ন এত ভয়াবহ রকমের বাস্তব হতে পারে?

এখনও আফ্রিকান ড্রাম বাজিয়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। ঘামে ভিজে উঠেছে পুরো শরীর, কাঁপছে একটু একটু। এত ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন এ জীবনে অন্তত আর দেখা হয়নি।

আয়শা? আয়শা কোথায়? বোধ হয় রোকসানাকে দেখতে গেছে...

'আমাকে এক গ্লাস পানি দিয়ে যাও না প্লিজ!' গলা উঁচিয়ে স্ত্রীকে অনুরোধ করে রাশেদ। আবার শুয়ে পড়ে বিছানায়। মনটা

ভীষণ দুর্বল লাগছে।

ভূতের ওঝার প্রভাব ভালই হয়েছে দেখা যাচ্ছে। আজেবাজে স্বপ্ন দেখছে মন...

আয়শা এল না কেন?... বোধহয় টয়লেটে।

অগত্যা পানির আকাঙ্ক্ষায় নিজেকেই উঠতে হয়। ইচ্ছে করে না, পা দুটো চলতে চায় না। তবু উঠতে হয়।

বেডরুমের পর ড্রইংরুম। মাঝে সরু প্যাসেজ পার হয়ে খাবার ঘর। যাবার পথে রোকসানার ঘরে একবার উঁকি দেয় রাশেদ। নাহ্, আয়শা নেই। রোকসানাও না। কোথায় গেল মেয়েটা। কী একটা দেখে ভয় পেয়েছিল। ভয়ের কারণেই জ্বরটা এসেছে। অন্তত জ্বরের ঘোরে মেয়েটার প্রলাপ শুনে সেটাই মনে হয়েছে। ছোট মানুষ। ভয় পেতেই পারে।

কিন্তু এখন কোথায় গেল?

ডাইনিং হলেও কেউ নেই। গ্লাসে পানি ঢালে রাশেদ। ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছে করছে। বরফ কোথায়?

কোথায় আবার, অবশ্যই ডিপফ্রিজে। নিজের আহাম্মকিতে নিজেরই হাসি পায়। আসলে আয়শা তার এত খেয়াল রাখে যে, এক গ্লাস পানিও কখনও নিজে ঢেলে খেতে হয় না।

প্রথমে ব্যাপারটা লক্ষই করে না। বরফ বের করে পরক্ষণেই আবার খোলে...

হায় খোদা!!!

হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে এসে আটকে যায় পলিথিনে জড়ানো বস্তুটা দেখে। বস্তু নয়, একটা মাথা। মানুষের ছিন্ন মস্তক! মুখটাকেও চিনতে পারে রাশেদ। রোকসানার আগে যে ছেলেটা ছিল। সোহাগ নাম।

কিন্তু...কিন্তু আয়শা যে বলেছিল চুরি করে পালিয়ে গেছে সোহাগ...

উফ!!!

মাথাটা এলোমেলো লাগছে। মেঝের উপরই বসে পড়ে রাশেদ। সোহাগের মাথাটা থেকে কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না।

ছেলেটার লম্বা চুলে জমাট বেঁধে আছে শুভ্র বরফ কণা...

কী করে আয়শা এদের? খেয়ে ফেলে? সেটাই হবে, না হলে বাকি শরীরটা কোথায়?

তা হলে... তা হলে ভুল করে সেদিন মানুষের মাংস খেয়ে ফেলেছিল সে? আর তারপর থেকে...

তার মানে সেদিনকার সেই আচার-মাংস নামের বস্তুটা ছিল আসলে মানুষের মাংস? এই...এই সোহাগের মাংস?

কেঁদে ফেলে রাশেদ।

কল্পনা-সীমার অনেক ঊর্ধ্বের কোন আতঙ্কে মানুষ এ ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে।

আয়শা নামের পিশাচটার সামনে সে তো ভীষণ তুচ্ছ এক মানুষ! স্রেফ একজন রক্ত-মাংসের মানুষ।

ছয়

ছাদের দরোজাটা বন্ধ। তবু রাশেদ নিশ্চিত, আয়শা ছাদেই আছে। অন্য কোথাও নয়।

ওদের ফ্ল্যাটটা পাঁচ তলায়, তারপরেই ছাদ। ছোট্ট একটা কামরা আছে ছাদে, বাড়িওয়ালাকে এটার জন্য আলাদা করে এক হাজার টাকা দিতে হয়। বাচ্চাদের খেলার ঘর বানাবে বলে আয়শা অনেক জোড়াজুড়ি করে ঘরটা ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করেছিল।

আস্তে ধাক্কা দিতেই খুলে যায় ছাদের দরোজাটা। পায়ে পায়ে সামনে এগোয় রাশেদ। খেলার ঘরে আলো জ্বলছে। আর মন বলছে ভীষণ অশুভ কিছু অপেক্ষায় আছে চার দেয়ালের ওই ইটের খাঁচায়।

ভয় হচ্ছে?

হ্যাঁ, হচ্ছে। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি তীব্র রোকসানাকে রক্ষা করার ব্যাকুল ইচ্ছাটা। ছ-সাত বছরের বাচ্চা মেয়েটা কিছুতেই কোন পিশাচের খাদ্য হতে পারে না। কিছুতেই না!

রাশেদ জানত তাকে ভীষণ কুৎসিত কিছু দেখতে হবে। তবু হাট করে খোলা দরোজার ওপাশে যে দৃশ্য দেখতে পায়, সেটা হার মানাতে বাধ্য কল্পনাকে...

হ্যাঁ, খেলার ঘরই। রঙিন দেয়াল, কার্পেটময় ছড়ানো খেলনা, ছবি আঁকার খাতা, রঙ পেন্সিল... আর সবকিছুর মাঝে সস্তা প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলে রাখা রোকসানার শরীরটা।

মরে গেছে?

না, এখনও নয়। তবে আর বেশি দেরিও বুঝি নেই। পা জোড়া বাঁধা জানালার সাথে, মুখে আটকানো চওড়া স্কচটেপ। ঝরঝর করে অশ্রু গড়াচ্ছে দুচোখ বেয়ে। আর হাত... ডান হাতটা কেটে নেয়া হয়েছে কনুই বরাবর। ঠিক কেটে নয়, যেন ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। যন্ত্রণায় কাটা মুরগির মতো শরীর মোচড়াচ্ছে বাচ্চা মেয়েটা।

আর আয়শা?

কার্পেটের উপরই বসে আছে পিশাচটা। কী শান্ত, স্থির ভঙ্গি! হাতে একটা প্লেট, পাশে রাখা পেপসির ক্যান। ভীষণ আয়েশী ভঙ্গিতে রোকসানার ছিঁড়ে নেয়া হাতটা চিবুচ্ছে সে, যেন কোন মুরগির রান।

হ্যাঁ, রোকসানার হাতটাই খাচ্ছে সে। রক্ত যাতে শাড়িতে না লাগে সেজন্য কোলের উপর বিছানো ন্যাপকিন। একটু পরপর পেপসির ক্যানে চুমুক দিচ্ছে আর মিষ্টি করে হাসছে রোকসানার দিকে তাকিয়ে।

'...ভয় পেয়ো না, সোনামণি! আর একটু কষ্ট করো। প্লিজ!... কী করব বলো। তোমার যেমন খিদে পায়, আমারও তো পায়। তুমি খাও ভাত মাংস, আর আমি খাই তোমাকে। এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম, তাই না?... একদম চিন্তা করো না তুমি। আমি খুব সুন্দরভাবে পিস পিস করে কাটব তোমাকে। রানের মাংসগুলো রাখব বিরিয়ানি রান্নার জন্য, আঙুলগুলো নিয়ে হবে ফিঙ্গার

ফ্রাই। মগজটা দিয়ে যে কত ভাল ভুনা তৈরি করতে পারি আমি, তুমি ভাবতেও পারবে না...'

রাশেদকে দেখে মোটেও ব্যস্ত হয় না আয়শা। মোহনীয় হেসে কাছে ডাকে, 'খুব ভাল হয়েছে, তুমি এসেছ। একবার খেয়ে দেখো, তোমার সমস্ত অসুখ ভাল হয়ে যাবে। বমি পাবে না, মাথা ঘুরবে না...'

সেই হাসির সম্মোহনে সত্যিই কাছে যায় রাশেদ, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। আর গভীর চুম্বনে তাকে আরও বেশি সম্মোহন করে আয়শা। রাশেদের জিভ পায় আয়শার ঠোঁটে লেগে থাকা রক্তের আস্বাদ। যেন ঝনঝন করে ওঠে শরীরের সমস্ত রক্তকণিকারা... তীব্র সেই স্বাদে!

খাওয়া ভুলে রাশেদের আরও ঘনিষ্ঠ হয় আয়শা। প্রচণ্ড শারীরিক আবেগে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়। সম্মোহিত রাশেদও ভুলে যায় পারিপার্শ্বিকের কথা, রোকসানার কথা। কামনায় অস্থির নগ্ন দুটো শরীর মিলিত হয় রোকসানার পড়ে থাকা দেহটার পাশেই। শুধু এক মুহূর্তের জন্য...

এক মুহূর্তের জন্য শুধু রাশেদের দৃষ্টি আটকায় বাচ্চা মেয়েটার মুখের দিকে, অবহেলায় পড়ে থাকা মাংস কাটার চাপাতির দিকে। সেদিকেই ধীরে ধীরে হাতটা বাড়ায় সে...

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে আয়শার দুভাগ হয়ে যাওয়া গলা থেকে, রাশেদের মুখটা মাখামাখি হয়ে যায়। তার শরীরের নিচে আয়শার নগ্ন শরীরটা তখনও উত্তপ্ত, দৃষ্টিতে ফুটে আছে তখনও উগ্র কামনা।

সেদিকে আর দ্বিতীয়বার তাকায় না রাশেদ। দ্রুত পোশাক পরে রোকাসানার দেহটাকে কোলে তুলে নেয়। যে করেই হোক বাঁচাতে হবে একে। এই মেয়েটাই তাকে আইনের হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র হাতিয়ার।

এখনও জ্ঞান হারায়নি রোকসানা। আশা হয় রাশেদের, হয়তো বেঁচে যাবে!

খোদা করুন, যেন তাই হয়!

পরিশিষ্ট

কয়েক মাস পর ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায় সবকিছুই।

রোকসানার সাক্ষ্য আইনের যন্ত্রণা থেকে খুব সহজভাবেই রক্ষা করে রাশেদকে। আয়শার ক্ষতও আস্তে আস্তে মন থেকে মুছে যেতে শুরু করে। ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি হৈচৈ হয় না বলে মানুষের কৌতূহলের বিষয়বস্তু হতে হয় না। এদেশে আজকাল বোধ হয় আজব আজব সংবাদের কোনও অভাব নেই।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রাশেদ।

প্রাণপণ চেষ্টা করে জীবনকে আবার স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনতে। রোকসানা মেয়েটার যাবার কোন জায়গা নেই বলে সে-ও রয়ে যায় রাশেদের সাথেই। অভিশপ্ত বাড়িটাও বদল করা হয়। একটা ছুটা কাজের বুয়া রাখা হয়। রোকসানাকে দেয়া হয় স্কুলে। মেয়েটা তাকে ‘বাবা’ ‘বাবা’ ডাকে।

তবু জীবন যে আর কিছুতেই ফিরে আসে না আগের পথে!

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে থাকে রাশেদ। পেটে প্রচণ্ড খিদে। মনটা ভয়াবহ পিপাসার্ত। শরীর-মন ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো হয়ে ওঠে এক টুকরো সজীব মাংসের জন্য। বারবার মনে পড়ে পাশের রুমে ঘুমিয়ে থাকা রোকসানার কথা...

... কচি কচি আঙুলগুলো চিবাতে কী মজাটাই না লাগবে। মড়মড় করে শব্দ হবে...তারপর ঘাড়ের কাছে মাংসের স্তর...

মুখ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে রাশেদের।

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকে চোখজোড়া। আদিম শ্বাপদের মতো।

প্রতিশোধ

সেদিন, তখন বোধহয় রাত্রি ন'টা, জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের অঝোরে ঝরতে থাকা রিমঝিম বৃষ্টি দেখছি। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, নিচ্ছিদ্র রাত। এরই মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল জিনিসটা। বাইরের দরোজাটা কেমন যেন নড়ছে না? হ্যাঁ, ওই তো ধীরে ধীরে খুলে গেল পাল্লা দুটো। কে এল রে বাবা, এখন আবার! চারদিকে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি, এর মধ্যে..., ওহ,... ওর কথা তো মনেই নেই, হয়তো হানিফ এসেছে। নাহ্, এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি।

ওই তো হানিফই, কিন্তু টলছে কেন ও?

তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম আমি। কিন্তু কই? কেউ তো নেই এখানে! চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বাগানের মধ্যে আলকাতরার মতো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। তবে কি এত সব ভুল দেখলাম আমি!

ঘরে ফিরে আসছি। এরই মধ্যে ভিজে প্রায় জবজবে অবস্থা। বারান্দায় উঠতেই দেখি বড় আম্মা বেরিয়ে এসেছেন। আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'কি রে, হানিফ এসেছে?'

'কই, না তো!' অবাক হয়ে জবাব দিলাম।

আমার কথায় যেন বিস্মিত হলেন বড় আম্মা।

'সে কি! তাহলে আমাদের দরোজায় টোকা মেরে গেল কে? তুই?'

'উঁহু,' ফের মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'কিন্তু, কিন্তু আমার মনে হলো যেন হানিফ এসে করুণ স্বরে ডাকছে আমাকে।'

'আমারও তো মনে হয়েছিল ও বাইরের দরোজা খুলে এগিয়ে আসছে,' তাজ্জাব কণ্ঠে বললাম আমি। 'কিন্তু বাগানে বেরিয়ে দেখি কেউ নেই।'

আমার কথা শুনে চিন্তা বেড়ে গেল বড় আম্মার। তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বোঝালাম, হয়তো হানিফ কোথাও বৃষ্টি-বাদলের জন্য আটকে পড়েছে। বৃষ্টি থামলেই চলে আসবে। আর আমরা যেসব দেখেছি অথবা শুনেছি, সেসব মনের ভুল।

কক্সবাজারে অবস্থিত এই প্রকাণ্ড বাগানবাড়িটি আমার নানুর একান্তই নিজস্ব। মনের মতো করে এখানকার গোলাপ বাগিচাটি সাজিয়ে তুলেছেন তিনি। বছরে একবার ঘুরতে আসি আমরা। এবারে এসেছি আমি, বড় আম্মা আর তাঁর ছেলে হানিফ। প্রায় মাসখানেক রয়েছি। এই সামনের হপ্তা নাগাদ চলে যাবার কথাবার্তা চলছে।

একটু দুরন্ত প্রকৃতির ছেলে হানিফ। মারমুখী। বড় ছোট, কারও কথাই কানে তোলে না। নিজে যা বুঝবে, তাই করবে। ওর জন্য ভীষণ অশান্তির মধ্যে দিয়ে দিন কাটে বড় আম্মার। আজ এর সঙ্গে, কাল ওর সঙ্গে মারামারি লেগেই আছে। আমিও আর বুঝিয়ে পারি না।

বৃষ্টির ছন্দনৃত্য দেখার সৌভাগ্য সে রাতে মাথায় উঠল। রাত বেড়েই চলেছে, চারদিকে গিজগিজ করছে ভেজা ভেজা অন্ধকার। অথচ এখনও হানিফের ফেরার নাম নেই। তবে কি এখানে এসেও কারও সাথে হাতাহাতি করে বসল? নাহ্, আজকের দিনটা ওর সাথে থাকা উচিত ছিল আমার।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এর মধ্যে ওকে কোথায় খুঁজতে বেরোব? এদিকে বড় আম্মা, নানু, নানী সকলেরই শোচনীয় অবস্থা। উপায় না দেখে মালিকেই পাঠিয়ে দিলাম। যত দূরে এবং যেখানে যেখানে পারা যায় খোঁজ করে চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরে এল সে। কোথাও পাওয়া যায়নি হানিফকে।

পরদিন সকালে হানিফের খোঁজে লেগে গেল সবাই। এদিক-সেদিক খুঁজে বেড়ালাম আমিও। যদি কোথাও পাওয়া যায় হানিফকে। কিন্তু সকলের শ্রমই বৃথা। কোথাও পাওয়া গেল না ওকে। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে একটা জলজ্যান্ত আস্ত মানুষ।

সেদিন রাতেও যা ঘটল তা আগের রাতেরই পুনরাবৃত্তি।

বৃষ্টি ভেজা রাত। বসে আছি। এমন সময় দেখলাম, বাইরের দরোজা নড়েচড়ে খুলে গেল। অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি যেন

টলতে টলতে ঢুকে পড়ল ভিতরে। উঠে দাঁড়তে যাব আমি, ঠিক তখনি গোলাপ বাগিচায় ঢুকে অন্ধকারে মিশে গেল মূর্তিটা।

মিনিট দশেক পরেই আমাকে চমকে দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকলেন বড় আম্মা। ‘কি রে, হানিফ কোথায়?’

তাঁর কথা শুনে বিষম খাবার উপক্রম হলো যেন আমার। চোখ গোল গোল করে বললাম, ‘তার মানে?’

‘সে কি! হানিফ এ ঘরে আসেনি?’ বড় আম্মার চোখ বিস্ফারিত।

‘কই না তো।’ জবাব দিলাম আমি।

‘কিন্তু ও যে আমার দরোজায় টোকা দিয়ে বলে গেল, “মা জলদি এসো, আমি মিনহাজের ঘরে আ...আছি।”’ গলা কাঁপছে বড় আম্মার।

গোটা ব্যাপারটাই ভীষণভাবে তোলপাড় করে গেল আমাকে। কি হতে পারে এ ঘটনার ব্যাখ্যা? শোনার ভুল? কিন্তু আমিও তো বড় আম্মার মতোই আজ যা দেখেছি সেটা গতকালেরই পুনরাবৃত্তি...।

এসব যখন ভাবছি তখন রাত বারোটা। ঘুম আসছে না। দুশ্চিন্তায় শুধু এদিক-ওদিক করছি। ঠিক এমনি সময় অনুভব করলাম ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ যেন আমার নিজস্ব অস্তিত্বটাকে ক্রমশ গ্রাস করে চলেছে। ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে। কি ঘটতে চলেছে বুঝতে পারছি আমি, কিন্তু বাধা দেবার এতটুকু শক্তি আমার নেই।

হাঁটছি। ধীর পায়ে দরোজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম সন্তর্পণে।

প্রায় মাইলখানেক চলে এসেছি আমি। গাঢ় আঁধার চারদিকে। হঠাৎ মনে হলো, কারা যেন চেঁচামেচি করছে। একটু ভাল করে শুনতেই বুঝতে পারলাম চেঁচামেচি নয়, জঘন্য বিকৃত সুরে গান ধরেছে উপজাতীয় অসভ্যগুলো। কেউ কেউ হাততালি দিচ্ছে, নাচছে। আশ্চর্য! আমি ওদের এত কাছে দাঁড়িয়েছি অথচ ফিরেই তাকাচ্ছে না এদিকে। নিশ্চয় গাঁজার নেশায় উন্মত্ত হয়ে করছে এসব।

কিন্তু এ কি! আমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এখন আর পিঠের সেই শীতল স্পর্শটা নেই। যেন গায়েব হয়ে গেছে। অন্ধকার বন-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। শিরশির করে উঠল শরীর। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মাথার চুল।

ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এমন সময়ই চোখে পড়ল কুয়োটা। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওসব পাত্তা দেয়ার সময় নেই আমার। ছুটে পালাতে পারলে বাঁচি। হঠাৎ অনুভব করলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমার পিঠের সেই শীতল স্পর্শ। যেন বাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে।

পরদিন সকালে উঠে, সতেজ হয়েই ফের ছুটলাম গত রাতের সেই জায়গাটায়। বিশেষ করে ওই কুয়োটা যেন বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আমাকে। স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না কিছুতেই।

কুয়োটার কাছে আসতেই চোখে পড়ল একটা লোককে। ঝুঁকে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে। বুড়ো, উপজাতীয় লোকটার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। একে চিনি আমি। নাম কুফুয়া। এরই এক ছেলেকে বাগিচায় ফুল তোলার অপরাধে বেধড়ক পিটিয়েছিল হানিফ।

পায়ের শব্দ পেতেই ঘুরে তাকাল বুড়ো। চমকে উঠলাম আমি। কি ব্যাপার, অমনভাবে চেয়ে রয়েছে কেন বুড়োটা? উফ্ঃ! কি জঘন্য দৃষ্টি! যেন, যেন আমার বুক চিরে কলিজার ভিতর বাসা বাঁধার চেষ্টা করছে কুফুয়া। ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন হয়ে গেলাম আমি। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। বমিবমি লাগছে। হার্টবিট বেড়ে গেছে। হাঁসফাঁস করছে বুক। বেশিক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না আমি। পড়ে গেলাম মাটিতে।

‘অ্যাই মিনহাজ, আমি এখানে!’

আচমকা একটা মিনমিনে কণ্ঠস্বর চমকে দিল আমাকে। কে যেন কথা বলল মনে হলো! চোখ তুলে তাকাতেই দেখি উপজাতীয় শকুনটা এখনও তীব্র দৃষ্টিতে ঝাঁঝরা করে চলেছে আমাকে। আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা ঝরছে যেন সেই ক্রূর দৃষ্টিতে।

কিন্তু কেউ নাম নিয়েছে আমার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। গলাটা চিনতে পেরেছি আমি। হানিফের গলা। ওই একমাত্র পুরো নামে ডাকে আমাকে, অন্যরা সকলেই মিনু বলে ডাকে।

আস্তে আস্তে পা ফেললাম আমি। কুয়োটা যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে তার দিকে। প্রাণপণ দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ আমি। পারছি না কিছুতেই। এগিয়েই চলেছি।

এসে দাঁড়ালাম কুয়োটার সামনে। কে যেন জোর করে নিচু করে দিল আমার ঘাড়টা। সম্মোহনী শক্তি? স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যা কিছু ঘটছে সবই আমার অনিচ্ছায়। বাইরের কোন অশুভ শক্তি ভিতরে জাঁকিয়ে বসেছে আমার।

কিন্তু নিচের দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন সন্দেহ হলো আমার। মনে হচ্ছে, কিছু একটা ভাসছে পানির ভিতর। অন্ধকারে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঝাপসা লাগছে।

মন্থর গতিতে কুয়োর ভিতরে পাশেই ঝুলে থাকা একটা বালতি নামিয়ে দিলাম আমি। আর ঠিক পরক্ষণেই যেটা উঠে এল বালতির ভিতর সেটা আর অন্য কিছু নয়, একটা কাটা রোমশ হাত। বালতিটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে নির্জীব অঙ্গটা। দেখেই আঁতকে উঠলাম আমি। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল বাইরে। ব্যাপারটা যদি বাস্তবই হয়ে থাকে তবে ওটা আর কারও নয়, স্বয়ং হানিফেরই হাত। কনুই থেকে কেটে নেয়া একটা রক্তাক্ত অংশ মাত্র।

সাঁৎ করে ঘুরে তাকালাম আমি। কিন্তু কোত্থাও চোখে পড়ল না উপজাতীয় কুফুয়াকে। বুঝতে পারলাম, ছেলেকে মারার প্রতিশোধ নিয়েছে বুড়ো। একে একে হানিফের প্রতিটি অঙ্গ কেটে কেটে ফেলে দিয়েছে পানির ভিতর। আর এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে ওই বিষাক্ত চোখ দুটো। সম্মোহনী শক্তি আছে তার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্রতিশোধ নিয়েছে বুড়ো, ছেলেকে মারার চরম প্রতিশোধ।

ভয়

আমার এক আত্মীয়, নাম ফাকিহা হায়দার। ল-পাস, কিন্তু ওকালতি করে না। বেসরকারি একটা অফিসের আইন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বান্ধবীকে সাথে নিয়ে ঢাকায় থাকে। গ্রামের বাড়ি বরিশাল। মুগদার ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে থাকে দু'জন।

এরই মধ্যে একদিন জানতে পারলাম বিয়ে হয়ে গেছে ফাকিহার। বরও উচ্চশিক্ষিত। একটা কোম্পানির মালিক। বিয়ে হয়ে যাবার প্রায় মাসখানিক পর আচমকা একদিন গুলিস্তানের মোড়ে দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে আমার। আমাকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা ফাকিহা।

'আ-রে হাকিম ভাই যে! কি ভাগ্য আমার! আপনাকেই তো খুঁজছিলাম মনে মনে।'

মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ?'

'কেন, আপনার খোঁজ করাটা কি অন্যায় না বারণ?' বলল ফাকিহা।

'বললাম, 'আরে না না , ঠিক তা বলিনি। আসলে অনেক দিন দেখা নেই তো...'

'বুঝেঝি, বুঝেঝি,' আমার কথায় বাদ সেধে বসল মেয়েটা, তারপর আচমকা প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'শুনুন, আপনি তো অনেক কিছুর খোঁজ রাখেন। আমাকে একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারবেন?'

'কিনবে?' ভুরু নাচালাম আমি।

'নাহ্, ভাড়া নেব। দু'জন মানুষ থাকার মতো হলেই চলবে।'

ফাকিহাকে আশ্বস্ত করে পরদিন থেকেই লেগে গেলাম, বাসা খোঁজার কাজে। শুধু নিজেই নয়, আরও দু-একজন বন্ধু-বান্ধবকেও লাগিয়ে দিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটা বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল। আমি, ফাকিহা আর তার স্বামী ইউসুফ মিলে একবার ঢু

মেরে এলাম বাড়িগুলো থেকে। কিন্তু এমনই খুঁতখুঁতে মেয়ে ফাকিহা, একটা বাসাও পছন্দ করল না।

আবার শুরু হলো বাসার খোঁজ। ঢাকার বাজারে মনমত বাসা পাওয়াটাও এক বিরাট ঝক্কি। কেটে গেল একমাস, দু'মাস, তিন মাস। অবশেষে দেখা মিলল তার। ৩৩/৬, সেগুনবাগিচা। একটু পুরানো বাড়ি। শীর্ণ। যদিও সদ্য রং করা হয়েছে। দুটো কামরা। বারান্দা, বাথরুম সংলগ্ন। ভাড়াও কম। বাড়ির মালিক দোতলায় থাকেন। আশপাশে লোকজন কম। নির্জন পরিবেশ। দেখামাত্র পছন্দ করে ফেলল ফাকিহা।

এরপর কেটে গেছে অনেক দিন। ব্যস্ততার কারণে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি ফাকিহাদের বাসায়। কিন্তু একদিন বাসায় বসে দু'তিনজন বন্ধুর সাথে গল্প করছি, হঠাৎ ফাকিহা এসে হাজির। প্রথম নজরেই মনে হলো মেয়েটার চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত ভাব।

বন্ধুদের বিদায় দিয়ে ফাকিহার সামনে এসে বসলাম আমি। আমাকে দেখে ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে, হাকিম ভাই।'

'সে তো তোমার চোখ-মুখ দেখেই বুঝেছি', নরম সুরে বললাম আমি। 'কি ব্যাপার? শরীর খারাপ?'

'জ্বী না, তবে...' থেমে গেল ফাকিহা। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলাম আমি, 'খারাপ কিছু ?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল সে। 'রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না।'

'সে কি! ঘুম না হওয়া তো খুব খারাপ রোগ। ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'ডাক্তার কিছু করতে পারবে না, হাকিম ভাই,' ফাকিহার নিরাসক্ত উত্তর।

'তার মানে!'

'মানে...হাকিম ভাই,' একটা ঢোক গিলে কিছুক্ষণ থেমে রইল ফাকিহা, 'ওই বাসাটা ঠিক ভাল না...।'

তার কথা শুনে কেন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুকের ভেতর। বললাম, 'কেন, বাসাটা তো বেশ পছন্দ করেছিলে তোমরা।

তাছাড়া নিরিবিলিতে থাকাটা যখন তোমাদের পছন্দ...'

'সেসব কিছু নয়, অন্য একটা ভয় আছে বাসাটাতে।'

কম্পিত কণ্ঠে কথা বলছে ফাকিহা, লক্ষ করছি, কেমন যেন ইতস্তত করছে সে আসল কথাটা বলতে। সময় নিচ্ছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুচছে কপাল।

বললাম, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ফাকিহা, তোমার কথা।'

আমার কথা যেন কানেও যায়নি এমনই ভঙ্গিতে সে বলল, 'ওই বাড়িতে আমরা দু'জন ছাড়াও অন্য কেউ একজন আছে, হাকিম ভাই।'

ওর কথা শুনে শিরশির করে উঠল আমার মেরুদণ্ড। 'অন্য কেউ মানে?'

'মানে মানে, তৃতীয় কেউ একজন,' কম্পিত কণ্ঠে বলল ফাকিহা। 'তাকে প্রায় রাতেই দেখি আমি, অন্ধকার হলেই বের হয় মানুষটা। যন্ত্রণায় বিদগ্ধ হয়ে... উফ, হাকিম ভাই, বিশ্বাস করুন, একটুও বানিয়ে বলছি না আমি। জানি ভূতে বিশ্বাস নেই আপনার। কিন্তু মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী আমি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, অতৃপ্ত কামনা নিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে যায় যারা, অতৃপ্ত প্রেতাত্মা হয়ে আবার ওরা ফিরে আসে পৃথিবীতে। কেঁদে কেঁদে বেড়ায় আমাদের চারপাশে। কেউ দেখতে পায় না ওদের। আর যখন পায়...' আতঙ্কে চোখ বুজে কেঁপে উঠল সে।

ওকে একটু শান্ত করার জন্য বললাম, 'শোনো ফাকিহা, তোমার আসলে কিছু কোথাও ভুল হচ্ছে।'

'না হাকিম ভাই, আমি ভুল করিনি,' মাথা নেড়ে বলল ফাকিহা। 'আসলে আমার ভুল, প্রথম থেকেই ঘটনাটা খুলে বলা দরকার ছিল আপনাকে। হ্যাঁ, বরং তাই বলি।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে, মনে মনে গুছিয়ে নিল ঘটনা। তারপর বলল, 'শুনুন তাহলে...

'মাস দু'য়েক আগের কথা। মাঝ রাতের দিকে হঠাৎ "খুট" করে একটা শব্দ কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো, ড্রইংরুম থেকে যেন কার পায়ের আওয়াজ আসছে। ইউসুফ পাশেই শুয়েছিল। ওর ঘুমের ছিরি তো জানেনেই। বুকের ওপর

দিয়ে হাতি হেঁটে গেলেও ঘুম ভাঙবে না। তাই ওকে ডাকার চেষ্টা না করে নিজেই উঠে পড়লাম।

‘প্রথমে জানালা দিয়ে তাকালাম পাশের ঘরে। চোখে কিছুই পড়ল না, কিন্তু “খুটখাট” শব্দগুলো তখনও কানে আসছে আমার। মনে হলো শক্ত কিছু পায়ে দিয়ে কে যেন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে সারা ঘর। অথচ কোন লোকজন চোখে পড়ছে না। রাতে মাংস রান্না হয়েছিল। একবার ভাবলাম, ইঁদুরের উৎপাত বোধহয়, শব্দের উৎসটা ওখান থেকেই...। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না। এপাশ-ওপাশ করছি। অথচ আমার পাশের মানুষটি অকাতরে ঘুমাচ্ছে। বিচিত্র সব আওয়াজ করছে নাক দিয়ে।

‘হাকিম ভাই, আপনি তো জানেন, ছোটবেলা থেকেই বরাবরের অভ্যাস আমার, অন্ধকারে ঘুমাতে পারি না। তাই জিরো পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বালিয়ে রেখেছিলাম ঘরে। এরই মধ্যে লক্ষ করলাম দীর্ঘ একটা ছায়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে এঘর থেকে অন্যঘরে চলে গেল।

‘ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। ইউসুফকে ডেকে বললাম, “এই ওঠো, ওঠো। ঘরে লোক ঢুকেছে।” আশ্চর্য মানুষ। চোখ পর্যন্ত খুলল না। বরং পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, “ওসব কিছু না, ঘুমিয়ে পড়ো।”

‘ছায়াটা সরে সেই যে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল, তারপর আর দেখিনি ওটাকে। অথচ মনকে কিছুতেই যুৎসই ব্যাখ্যা দিয়ে শান্ত করতে পারছি না। ছায়া দেখা গেল অথচ মানুষ দেখা গেল না—এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হতেই পারে না।’

একটানা কথাগুলো বলে থামল ফাকিহা। পানির গ্লাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গলা ভেজাতে বললাম আমি। ঢকঢক করে কয়েক গ্লাস বেমালুম গিলে সে বলল, ‘ধন্যবাদ।’

প্রত্যুত্তরে হাসলাম আমি। ‘তারপর?’

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল ফাকিহা। ‘তারপর,’ আবার বলতে শুরু করল সে, ‘কয়েকদিন বেশ স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। কোন গোলমাল নেই। সেদিন রাতে যে অমন ভয় পেয়েছিলাম ভাবতেই লজ্জা লাগে। একেবারেই ছেলেমানুষী

কাণ্ড। এরই মধ্যে হঠাৎ অফিসের কাজে সিলেট গেল ইউসুফ। বেশি দিন নয়, মাত্র দু'দিনের জন্য।

'বাড়িতে আমি একা। তখন রাত কত হবে, এই একটা কি দেড়টা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এবারে স্পষ্ট দেখলাম জিনিসটাকে। দীর্ঘ, একহারা চেহারা, খালি গায়ের সমস্তটা অংশ পুড়ে ঝলসে গেছে, খসে খসে পড়ছে মাংস। দাঁতের মাড়ি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সামনের দিকে ঝুলে আছে জিভ। মুখের কিছু অংশ পুড়ে চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে দাঁত। ঘরের ভেতরে কি যেন খুঁজছে সে অস্থিরভাবে।'

'সেই মুহূর্তে রক্ত জমে হিম হয়ে যায় আমার। মনে হলো, তখনই বোধহয় হার্টফেল করব।

'গলায় জোর নেই, তবু বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কে, কে ওখানে?"

'জবাব নেই। মাংসপিণ্ডের ঝলসানো অংশটা ফিরে তাকাল আমার দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টি! পলকহীন! কলজে বেরিয়ে আসার উপক্রম আমার। তখনই মনে হলো, ওটা এ জগতের কিছু নয়, কোন অতৃপ্ত আত্মা। অতৃপ্ত থাকায় আবার ফিরে এসেছে আমাদের এই সংসারে।' কথাগুলো বলতে বলতে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে এল ফাকিহার চেহারা।

ওর কথা শুনে কতটুকু ভয় পেলাম বা বিশ্বাস করলাম জানি না, তবে বলে বসলাম, 'ওসব যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বাসাটা ছেড়ে দিলেই পারো।'

'হ্যাঁ, ছেড়েই দেব,' মাথা ওপর-নিচ করল ফাকিহা। 'কিন্তু সমস্যা হয়েছে ইউসুফকে নিয়ে।'

প্রশ্নবোধক চোখে তাকালাম। 'আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না সে। বলছে, এসব নাকি আমার চোখের ভুল। অতিমাত্রায় হরর ফিল্ম দেখার ফল।'

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে আমি বললাম, 'ঠিক আছে, ফাকিহা, তোমার প্রবলেমটা বুঝতে পারছি আমি। কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না তোমাকে। করবে বলে মনেও হয় না। তবে আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো। তোমার কথা বিশ্বাস করেছি আমি। কাল সময় হবে না, পরশু তোমাদের বাসায় যাব আমি।'

চলে গেল ফাকিহা। মাঝে একদিন বাদ দিয়ে পরদিনই গিয়ে হাজির হলাম ফাকিহাদের বাসায়। কিন্তু গিয়েও কোন লাভ হলো না। জানতে পারলাম অফিসের কাজে আবার কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছে ইউসুফ। অগত্যা ফাকিহার সাথে কথা বলেই ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় কাকুতি ঝরে পড়ল মেয়েটির কণ্ঠে, 'হাকিম ভাই, প্লিজ, যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের বাড়িঅলার সাথে একবার কথা বলতে বলছিলাম আপনাকে।'

'না না, এতে মনে করার কি আছে। আমি আজই যাবার সময় দেখা করে যাব ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

আরও কিছু সময় গল্পগুজব করে কাটালাম আমরা। তারপর সন্ধের কিছু আগে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। কেন যেন ফাকিহার জন্য মনে মনে একটু কষ্ট অনুভব করলাম আমি। ইস, সারাটা রাত আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হবে মেয়েটাকে। কিছু অঘটন ঘটিয়ে না বসে।

ফাকিহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, হাজির হলাম বাড়িঅলার ওখানে। ভদ্রলোক বাসায়ই আছেন। শ্যামলা বর্ণের গোলগাল চেহারা। ইয়া বড় মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। আমার মুখে তার বাসার ব্যাপারে ভৌতিক কথাবার্তা শুনে তো মহা খাপ্পা।

'কি বলছেন এসব! এটা ভুতুড়ে বাসা! এই বিজ্ঞানের যুগেও ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী আপনি? যত্তসব!' রাগে লালচে আভা ধারণ করল তাঁর গাল।

অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এ ধরনের কথা আশা করিনি। দ্রুত তাঁর নাকের সামনে হাত নেড়ে বললাম, 'দেখুন, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি কিছু বলিনি যে বাসাটা ভুতুড়ে, শুধু জানতে চেয়েছি ওখানে কেউ অপঘাতে মরেছে কিনা।'

খেঁকিয়ে উঠলেন বাড়িঅলা, 'অপঘাত তো দূরের কথা, কস্মিনকালেও কেউ মরেনি ও বাসায়। যত্তসব গাঁজাখুরি কথাবার্তা!'

ভদ্রলোকের কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। তবু নীরবে বিদায় নিলাম সেখান থেকে।

এরপর প্রায় দু'মাস আর দেখা নেই ফাকিহার। মনে মনে স্বস্তি পেলাম আমি, যাক তাহলে ভাল আছে হয়তো ওরা। কিন্তু আমার স্বস্তিকে অস্বস্তিতে পরিণত করে একদিন ইউসুফ এসে হাজির। একা। কোটরাগত চোখ, বিবর্ণ মুখ, ঘোলাটে দৃষ্টি।

বললাম, 'কি হে, শরীর খারাপ নাকি? ফাকিহা কেমন আছে?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে বলল, 'প্লিজ, সব বলছি, আগে একটু পানি খাওয়ান।'

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে উঠতে বেশি সময় লাগল না আমার। তাড়াতাড়ি এক জগ পানি আর গ্লাস এনে ধরিয়ে দিলাম তার হাতে। পানি খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে তাকাল আমার দিকে। 'হাকিম ভাই, ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটে গেছে গতকাল রাতে।' ফাকিহাকে ধানমন্ডিতে ওর মামীর বাসায় রেখে এসেছি আমি।'

'কেন, কী হয়েছে?' হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল আমার। এতক্ষণ সরাসরি আমার দিকে চেয়ে ছিল ইউসুফ, এবারে দৃষ্টি নামিয়ে বলল, 'আপনি তো...ইয়ে...সবই জানেন, মানে ফাকিহার মুখে সবই শুনেছেন। আমি কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কিছুই দেখিনি। তাই এতদিন ঠাট্টা করে এসেছি ফাকিহার সাথে। তাছাড়া ভূত-প্রেতে বিশ্বাসও নেই আমার।

'গত রাতে এক বন্ধুর ম্যারিজ ডে থেকে ফিরেছি আমি আর ফাকিহা, রাত বারোটা বোধহয় তখন। বাসায় এসে দেখি কারেন্ট নেই। চারদিকে বিদঘুটে অন্ধকার। তালা খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটা তীব্র দুর্গন্ধ এসে লাগল আমার নাকে। মনে হলো বাসার ভেতর থেকেই আসছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, গন্ধটা একটুও অনুভব করতে পারল না ফাকিহা। শুধু আমার নাকেই আসছে। অনেক চেষ্টা করেও অনুমান করতে পারলাম না গন্ধটা কিসের।

'এরপর ফাকিহাকে বেডরুমে রেখে রান্নাঘরের উদ্দেশে রওনা হলাম আমি মোমবাতি আনতে। রান্নাঘরে ঢুকছি, আগের দুর্গন্ধটা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠল। অবাক বিস্ময়ে শুনতে পেলাম কে যেন গোঙাচ্ছে রান্নাঘরের ভেতরে। ছুটে গেলাম তাড়াতাড়ি। আর গিয়েই যা দেখলাম...ইয়ে...বিশ্বাস করবেন না হাকিম ভাই, দেখলাম একটা জলজ্যান্ত মানুষের অর্ধেকটা শরীর পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে গেছে। চুল, ভুরু সব পুড়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে গোটা চেহারা। দেখে মনে হলো এই মাত্র গোরস্তান থেকে উঠে এসেছে নরকের পিশাচটা। এখনও মৃদুমৃদু ধোঁয়া উঠছে ওটার পোড়া শরীর থেকে। চামড়া পোড়ার অসহনীয় দুগর্ন্ধে হড়হড় করে বমি করে দিলাম আমি।

'ওদিকে আমার দেরি দেখে কখন যেন রান্নাঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ফাকিহা। আমাকে বমি করতে দেখেই ছুটে এল সে অথচ হাজার চেষ্টা করেও ওকে কিছুতেই দেখাতে পারলাম না মাংসপিণ্ডের আধপোড়া অংশটা।' কথাগুলো বলতে বলতে মাথা চেপে ধরল ইউসুফ। বুঝতে পারলাম প্রচুর ভয় পেয়েছে বেচারা।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর? মাথা ঝাঁকাল সে, 'রাতটা কোনরকমে বাসাতেই কাটিয়ে দিলাম দু'জনে, যদিও আর কিছুই ঘটল না। কিছু দেখতে না পেলেও আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে ফাকিহা। কারণ এসবের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে ওর। আজ সকালে ওকে ধানমন্ডিতে রেখে এসেছি। তারপর এসেছি আপনার কাছে।'

'কেন? শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল আমার। ইতস্তত করল ইউসুফ, 'হাকিম ভাই, ফাকিহার ইচ্ছা বাসায় একবার যান আপনি। মানে আমার দেখাটা সত্যি কিনা...ইয়ে...ওই রান্নাঘরে...।'

এক ঘণ্টার মধ্যে ইউসুফকে নিয়ে হাজির হলাম সেগুনবাগিচায়।

তালা লাগানো রয়েছে দরোজায়, খুলে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লাম রান্নাঘরে। এদিক-ওদিক চেয়ে একটু যেন সাহস ফিরে পেলাম। জানতে চাইলাম, 'কই হে, তোমার সেই আধপোড়া মাংসপিণ্ডটা কোথায়?'

'অপ্রস্তুত হয়ে গেল ইউসুফ, উসখুস করতে করতে বলল, 'ইয়ে... তবে কি ভুল দেখলাম রাতে...?'

'হয়তো,' বলেই ভুল বুঝতে পারলাম নিজের, হঠাৎ মাংসপোড়ার বীভৎস একটা দুর্গন্ধ ধাক্কা মারল আমার নাকে। আতঙ্কিত চোখে ইউসুফের দিকে চেয়ে দেখি, একই দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে সে।

গন্ধটা যে মাংসপোড়ার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না আমার মনে। কারণ বহুদিন আগে এক হিন্দু বন্ধুর মায়ের সৎকারে শ্মশানে গিয়েছিলাম। বৃদ্ধাকে চিতায় শুইয়ে যখন গায়ে আগুন ধরানো হলো, ঠিক এমনই অসহনীয় একটা গন্ধ পেয়েছিলাম।

ভাবছি, এ ঘটনার সত্যি কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা। শত চেষ্টায়ও ভেবে পেলাম না কিছু। এদিকে ভূতে বিশ্বাস করতেও মন চাইছে না।

এরপর আর ওই বাসায় ফিরে যায়নি ফাকিহারা। পরদিনই উঠে পড়েছে অন্য বাসায়।

এ ঘটনার প্রায় মাসখানেক পর হঠাৎ একদিন ওই বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক কেন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তাঁকে বললাম, 'এই যে মিস্টার, ভণিতা না করে এবারে ঝেড়ে কাশুন তো। এর আগে কি ঘটেছিল আপনার বাসায়?'

না, কিছুতেই মুখ খুলবেন না ভদ্রলোক। কিন্তু আমিও কম নাছোড়বান্দা নই। শেষ পর্যন্ত ভীষণ পীড়াপীড়ির মাঝে পড়ে হড়হড় করে সব বলতে শুরু করলেন তিনি।

'দেখুন...মানে...ইয়ে, আপনার ধারণাই ঠিক। আজ থেকে দু'বছর আগে ওই বাসায় একজন বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেন। কুষ্ঠরোগে ভুগছিলেন। স্ত্রী বহু আগেই মারা গেছেন। কি যেন নাম ছিল, ও হ্যাঁ, এনামুল্লা চৌধুরী। তিন ছেলের বাপ। বহুদিন ধরেই ভুগছিলেন রোগে। হতভাগ্য ছিলেন তিনি। তিন ছেলে অথবা ছেলের বউরা, কেউই দু'চোখে সহ্য করতে পারত না বৃদ্ধকে। অবহেলা, অনাদরে ধীরে ধীরে রোগ বাড়তে থাকে, সেই সাথে যন্ত্রণাও। ঘেন্না করে, এড়িয়ে চলে কুষ্ঠরোগী বলে।

এভাবেই দিন চলছিল। কিন্তু কতদিন? এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে রান্নাঘরে পুড়ে মারা গেছেন বৃদ্ধ। জীবনে ওই প্রথম মানুষ পোড়া গন্ধ নাকে পেয়েছি আমি,' বলেই নাক কোঁচকালেন বাড়িঅলা। হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

টাটরাসের আতঙ্ক

পোল্যান্ডের টাটরা পর্বতমালার কোলে, একটি গাঁয়ে বাস করত এক বনপাল। তার সঙ্গে থাকত তার স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়ে। চারজনের সংসার নিয়ে বেশ সুখেই ছিল বনপাল। সন্তানদেরকে সে পাগলের মতো ভালবাসত।

গরমের সময় ছেলেমেয়েরা তাদের দুই কামরার কাঠের কুটিরের সামনে খেলা করত। তাদের মা জানালার ধারে বসে উল বুনত কিংবা সেলাই করত। আর তাদের বাবা যেত বিশাল পাইনের জঙ্গলে কাজ করতে। প্রকাণ্ড পর্বতশ্রেণীর পুব থেকে উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ সবুজ গহীন অরণ্য।

গ্রীষ্মের পরে এবারে একটু তাড়াতাড়িই যেন হামলা চালাল শীত। ছোট হয়ে এল দিন। অন্ধকার গ্রাস করল দিনগুলোকে। শোঁ শোঁ শব্দে বইতে লাগল হাড় কাঁপানো বাতাস, তুষারে ঢেকে গেল ওদের বাড়ি, জমিন ও গাছপালা।

প্রথমে পুকুর তারপর নদীর পানি জমে বরফ হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলল ঠাণ্ডা। সঙ্গে অনবরত তুষারপাত তো রয়েছেই। একদিন জঙ্গল থেকে ভেসে এল দলবেঁধে ঘুরে বেড়ানো নেকড়ের ডাক। দিনে সংক্ষিপ্ত আলোয় বাইরের কাজ সারতে লাগল পুরুষেরা। বনপাল কিংবা গাঁয়ের অন্য কেউ একা একা বনে ঢুকতে সাহস পেত না। সন্ধ্যার আগেই তারা ফিরে আসে বাড়িতে, দরোজা-জানালা শক্তভাবে বন্ধ করে বসে থাকে ঘরে।

শীতের কামড় বাড়ছে, সেই সঙ্গে বেড়ে চলছে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালের ডাক। খরগোশ, চলাফেরায় অসমর্থ বুড়ো ভল্লুক, শেয়াল কিংবা আহত কোন হরিণ তাদের শিকারের প্রধান লক্ষ্য। তবে এসব শিকার না মিললে তারা গাঁয়ে ঢোকারও সাহস করে। ভোরের প্রথম ম্লান আলোয় গ্রামবাসী বরফের গায়ে নেকড়ের পায়ের ছাপ ফুটে থাকতে দেখে। তারা দ্রুত সেলার কিংবা বাইরের ঘরে গিয়ে খোঁজ নেয় গৃহপালিত শূকর, হাঁস ও মুরগিগুলোর সংখ্যা কমে গেছে কিনা।

প্রতি বছরই দীর্ঘ শীত থুত্থুড়ে বুড়ো কিংবা অল্প বয়েসী কোনও বাচ্চাকে কেড়ে নেয়।

বসন্ত আসি আসি করছে, এমন একদিনে, মেয়েটির বয়স তখন নয়, ছেলেটির সাত, তাদের মা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং মারা গেল।

‘এখন আমাদের কী হবে?’ স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে বাড়ি ফিরে বিলাপ করে উঠল বনপাল।

‘আমি তোমার থলেতে খানিকটা রুটি আর ছাগলের দুধের পনির ভরে দিয়েছি,’ বলল ছোট মেয়েটি। ‘কুড়োলটা নিয়ে জঙ্গলে যাও। আগে যেভাবে কাজ করছিলে সেভাবে করে যাও।’ আমি আর আমার ভাই মিলে তোমার সেবা করব, ঘরবাড়ির যত্ন নেব, দেখে রাখব হাঁস-মুরগিগুলোকে।’

এতটুকুন বাচ্চা এসব কাজ করতে পারবে কিনা, সে ব্যাপারে সন্দিহান বনপাল। তবু মেয়ের কথামতো কাজ করল সে। বুকে পাথর চেপে সে জঙ্গলে গেল, কাজ শেষে শোকাকুল হৃদয়ে ফিরে এল বাড়িতে। দরোজা খুলেই মেঝে চমৎকারভাবে ঝাঁট দেয়া, পরিপাটি করে পেতে রাখা হয়েছে বিছানা, লোহার কড়াইয়ে টগবগ ফুটছে সুপ। সে তার বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল।

‘তোমাদের মা’র অভাব জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অনুভব করব আমি,’ বলল বনপাল। ‘তবে আমরা একসঙ্গে থাকলে আশা করি খুব বেশি কষ্ট আমাদের হবে না।’

‘মা’র জন্য আমার খুব কষ্ট হয়,’ রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে বড় বোনকে বলল ছোট ভাই। ‘আমার কি সবসময় এ রকম কষ্ট হতে থাকবে?’

‘এক সময় কষ্টটা কমে যাবে,’ ভাইকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল বোন।

মা হারানোর বেদনা প্রকটভাবে বিঁধছিল দু’ভাইবোনের বুকে, তবে বাড়িতে এবং মাঠে দু’জনকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয় বলে আস্তে আস্তে শোকের মাত্রাটা কখন কমে আসছিল ওরা নিজেরাও টের পাচ্ছিল না। আগের মতো আর তীক্ষ্ণভাবে মায়ের অনুপস্থিতি ওরা অনুভব করে না।

শীতকালের জন্য ওরা ওদের মা’র মতোই প্রস্তুতি নিল। শাকপাতা, বেরী, মাশরুম ইত্যাদি জোগাড় করে রাখল, নিজেদের

ভাগের মাংস শুকিয়ে রাখল লবণ দিয়ে। শীতের সময় তেমন শিকার নাও মিলতে পারে—এ আশঙ্কায় গ্রামবাসীদের কয়েকজন উদ্যোগী হয়ে কয়েকটি পশুপাখি জবাই করে পড়শীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

গাঁয়ের পুকুর থেকে শেষ কার্প মাছটি ধরা হলো, জমাট বাঁধার আগেই নদী থেকে তুলে আনা হলো শেষ ট্রাউট মাছটি। আবার হাড় কাঁপানো বাতাস ধেয়ে এল উত্তর থেকে, সঙ্গে ঘূর্ণায়মান তুষার। ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল রাতের বেলা ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল গাঁয়ের দিকে খিদের জ্বালায়।

এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল বনপালের। গাঁয়ের ধর্মযাজক মিটিং ডেকেছিলেন অভিভাবকহীন একটি পরিবারকে কে দেখাশোনা করবে তার ব্যবস্থা নিতে। বনপাল ঘরে ঢুকে দেখে তার ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরের চুল্লির সামনে খড়ের মাদুরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। সে বাচ্চাদের গায়ে কম্বল টেনে দিল। তারপর নিঃশব্দে ঢুকল নিজের ঘরে। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে গেল বনপালের। উঠে বসল বিছানায়। বুঝতে পারছে না ঘরে এত আলো এল কোত্থেকে। ভারী কাঠের দরোজায় খিল এঁটে দিলেও সে ছোট্ট জানালাটির খড়খড়ি নামাতে ভুলে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। থৈ থৈ আলোয় ভাসছে ঘর।

বনপাল জানালা দিয়ে চাঁদের দিকে তাকাল। তার মনে হচ্ছে এত বড় এবং সুন্দর চাঁদ সে জীবনে দেখেনি। হঠাৎ আলোর রশ্মি বাধা পেল, প্রকাণ্ড একটা মাথা উদয় হয়েছে জানালার সামনে, জোছনা ঢুকতে পারছে না। রোমশ, সাদা মাথাটা বিশালদেহী কোন জানোয়ারের। লাল জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ, সে প্রথমে একটি থাবা রাখল জানালার গরাদে, তারপর অপরটি। বনপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বুঝতে পেরে জানোয়ারটা মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে মৃদু গলায় হাঁক ছাড়ল।

‘নেকড়ে!’ আঁতকে উঠল বনপাল। লাফ মেরে নেমে এল বিছানা থেকে, দ্রুত পরে নিল জামাকাপড়, পায়ে গলাল বুটজুতো,

তারপর একহাতে লণ্ঠন, অপর হাতে বন্দুক নিয়ে পা বাড়াল রান্নাঘরে। দরোজার ভারী হুড়কো খুলতে যাচ্ছে, শব্দে জেগে গেল তার মেয়ে।

'কী হয়েছে, বাবা?' ঘুম ঘুম চোখে জানতে চাইল সে।

'নেকড়ে। বিরাট সাদা একটা নেকড়ে। আমি বাইরে যাচ্ছি ওটাকে গুলি করে মারব। তুমি দরোজা বন্ধ করে দাও, মা।'

'বাবা, এত রাতে তোমাকে একা বাইরে যেতে দেব না,' কেঁদে উঠল ছোট মেয়েটি। কিন্তু তার বাবা তার নিষেধ মানল না। সে লণ্ঠন হাতে চিৎকার করতে করতে ছুটল। ঢুকে পড়ল বনভূমিতে। দূর থেকে ভেসে এল নেকড়ের ভৌতিক ডাক। গা ছমছম করে উঠল ছোট মেয়েটির।

দরোজার হুড়কো লাগিয়ে দিল সে। তারপর রান্নাঘরের জানালার খড়খড়ি তুলে চাঁদনী রাতটাকে দেখল ভয়ে ভয়ে। জানালার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না তার। ফিরে এল বিছানায়।

বাবার অপেক্ষায় বসে রইল।

জঙ্গলের অনেক ভেতরে চলে এসেছে বনপাল। এদিকে পাইন গাছের শাখায় জমাট বেঁধে রয়েছে তুষার, জমিনের বরফের গায়ে ফুটে আছে সাদা নেকড়ের পায়ের ছাপ। এতক্ষণ চাঁদের আলোয় পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল পদচিহ্ন কিন্তু অরণ্যের গভীরে, বরফ মোড়া গাছের ঘন ডাল জড়াজড়ি করে চাঁদোয়া তৈরি করে জোছনার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে রেখেছে। ফলে বনপালের এখন শুধু লণ্ঠনই ভরসা।

নেকড়েটাকে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ বনপাল। এত সুন্দর এবং এমন ধবধবে সাদা নেকড়ে জীবনে দেখেনি সে। ওটাকে আবার চোখে পড়লেই গুলি করবে। জানোয়ারটা নিশ্চয় দলনেতা।

দলনেতা?

দাঁড়িয়ে পড়ল বনপাল।

সে এসব কী করছে? রাতের বেলা, বাচ্চাগুলোকে বাড়িতে একা রেখে সে বেরিয়েছে নেকড়ে শিকারে। এটা পাগলামি ছাড়া আর কী?

ঝট করে ঘুরল বনপাল, ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, আকুল আর্তনাদ ভেসে এল কানে।

'বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে কেউ রক্ষা করো।'

'কে?' চেঁচাল বনরক্ষক। 'কোথায় তুমি?'

'আমি এখানে। আপনার কাছেই। দয়া করে আমাকে বাঁচান।'

'হাতের লণ্ঠনটি উঁচু করে ধরতেই একটি নারীমূর্তি দেখতে পেল বনপাল। গাছের পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। গায়ে ফারের পোশাক।

'নেকড়ে-নেকড়ের দল সারারাত আমার পিছু নিয়েছে। আমাকে বাগে পেলে আর ছাড়বে না। আমাকে বাঁচান, বনপাল। আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই। নেকড়ের দল হামলা করলে আমি কিছুই করতে পারব না।'

বিস্মিত বনপাল ক্রন্দনরত নারীটিকে দেখছে। তারপর তাকাল চারপাশে। কান পাতল। সাদা নেকড়েটাকে দেখতে পাচ্ছে না কোথাও, তার সাঁড়া-শব্দও নেই। বনপালের ভয়ে পালিয়ে গেছে?

'আমার সঙ্গে আসুন,' গম্ভীর গলায় বলল বনপাল। 'জঙ্গল থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরুনো যায় ততই মঙ্গল।' মহিলার হাত ধরে সে ফিরে চলল। মহিলা প্রায় হাঁটতেই পারছে না। বনপালের শরীরের সঙ্গে সে একরকম ঝুলে থাকল।

বাড়ির দরোজায় এসে হাঁক ছাড়ল বনপাল। 'বাচ্চারা, দরোজা খোলো। আমার সঙ্গে একজন অতিথি আছে।'

কাঠের ভারি হুড়কো টেনে নামানোর শব্দ হলো। খুলে গেল দরোজা। মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল বনপাল।

ক্লান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আগুনের সামনে ধপ করে বসে পড়ল নারী। প্রথমে ফারের কোট খুলল সে, তারপর ফারের হ্যাট।

গলানো সোনার মতো চুল ছড়িয়ে পড়ল তার কোমর পর্যন্ত।

এদিকে ছোট ছেলেটির ঘুম ভেঙে গেছে। সে দামী পোশাক পরা মহিলার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর সাহস করে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল ঝকঝকে সোনালি কেশরাজি।

'তুমি কি রাজকুমারী?' মহিলার গাউনে হাত ছোঁয়াল ছেলেটি।

হাসল মহিলা। হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি দ্বিধা করছে দেখে সামনে ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিল সে, হালকা চুম্বন করল কপালে।

'এরা আপনার বাচ্চা?' বনপালের দিকে ফিরল স্বর্ণকেশী। 'খুব সুন্দর শিশু।' মেয়েটির দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু ছোট মেয়েটি ভয় পেয়ে সরে গেল দূরে, কাছে ঘেঁষল না।

'তুমি কি রাজকুমারী? পুনরাবৃত্তি করল ছোট ছেলেটি। মাথা নেড়ে করুণ হাসল নারীটি।

'পাশের ঘরে আপনার জন্য বিছানা করা হয়েছে,' জানাল বনপাল। 'আমি এ ঘরের মেঝেতে বাচ্চাদের নিয়ে শোব। আপনার এখানে কোনও ভয় নেই।'

'আমি তেমন ক্লান্ত নই,' বলল নারী। 'আগুনের পাশে বসে থাকত ভালই লাগছে। বাচ্চারা ঘুমাক। আপনি ইচ্ছে করলে কিছুক্ষণ আমাকে সঙ্গ দিতে পারেন।'

ছেলেটি একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু মেয়েটির চোখে ঘুম নেই। সে চোখ বুজে রইল। শুনল বাবা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে।

'আপনার জন্য কিছু করার থাকলে জানাবেন। বলেছেন আপনি রাজকুমারী নন, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে আপনার জন্ম অভিজাত কোন বংশে। গরিবের এ ঘরে আপনার নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার জন্ম ধনী বাবার ঘরে। কিন্তু প্রাসাদে বিত্তবৈভবের মাঝে থাকলেও মানসিক শান্তি

কোনোদিন পাইনি।

'আমার বাবা তাঁর এক বয়সী বন্ধুর সঙ্গে আমাকে বিয়ে দেয়ার মতলব করেছিলেন। লোকটাকে আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। বাবাকে অনেক অনুনয় করেছিলাম বিয়েটা ভেঙে দেয়ার জন্য। কিন্তু আমার কথা কানে তোলেননি তিনি। শেষে আমার হবু বরকে টাকা এবং গহনার লোভ দেখাই। বলি আমাকে যেন আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে সে দিয়ে আসে। সেই আত্মীয় আমার বাবার চেয়ে অনেক ভাল।

'আমার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল বুড়ো। আমরা রাতের বেলা যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু তুষারঝড়ে হারিয়ে ফেললাম পথ। আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়ে পিছু নিল একপাল নেকড়ে। ওরা জানত আমাদের ঘোড়াগুলো বেশি দূরে যেতে পারবে না। রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে। একটা ঘোড়া যখন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে, আমার হবু বর আমাকে জলদি পালিয়ে যেতে বলল। সে ঠেকিয়ে রাখবে নেকড়ের দলকে। কিন্তু আমি পালিয়ে যেতে চাইনি। এমন সময় বাকি ঘোড়াটাও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আমাদেরকে বহন করা স্লেজটা ডিগবাজি খেল। আমার সমস্ত টাকা পয়সা, গহনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। আমি ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়লাম একটা গাছে, বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি আমি মাটিতে পড়ে আছি। একা। আমার বর সম্ভবত পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দূরাগত নেকড়ের ডাক শুনে আমার মনে হচ্ছিল... আমার মনে হচ্ছিল... শিউরে উঠল সে। 'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।'

'এখন বিছানায় যান। ঘুমিয়ে পড়ুন,' বলল বনপাল। আজ রাতে আর কিছু করতে পারব না। তবে আপনার যতদিন ইচ্ছে এ বাড়িতে থাকুন। এখানে আপনার নিরাপত্তার অভাব হবে না।'

সে রাতে সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পরেও ছোট মেয়েটি অনেকক্ষণ জেগে রইল। কেন ভয় করছে জানে না।

পরদিন সকালে বনপাল সেই জায়গায় গেল যেখানে গত রাতে মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। খুঁজে বেড়াল হতভাগ্য বর এবং ঘোড়ার মৃতদেহ। কিন্তু ভারি বরফের তলায় চাপা পড়েছে সমস্ত চিহ্ন। জঙ্গলের মধ্যে খোলা একটি জায়গায় এসে

নেকড়ে এবং মানুষের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। বরফের গায়ে কুৎসিত বাদামি দাগ। গত রাতেও এ চিহ্নের রং হয়তো লাল ছিল।

‘নেকড়ের পাল আপনার বরকে খেয়ে ফেলেছে আর ডাকাতরা আপনার মালপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে।’ ফিরে এসে নতুন অতিথিকে খবর দিল বনপাল।

শুনে কেঁদে উঠল মহিলা।

‘হায়রে! এখন আমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু নেই। কী করে আমি যাব?’ কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, ‘এখন আমার কী হবে?’

‘গরম আসা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। তারপর যেখানে যেতে মন চায়, যাবেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করব,’ বলল বনপাল। ছোট ছেলেটি জড়িয়ে ধরল মহিলাকে কিন্তু তার বোন মুখ ঘুরিয়ে রাখল। সে বুঝতে পারছে না যে বুড়ো লোকটি এই মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে নেকড়ের শিকার হয়েছে তার জন্য মহিলা এক ফোঁটাও চোখের পানি ফেলল না, কাঁদল শুধু টাকা-পয়সার শোকে।

মহিলা থেকে গেল পরিবারটির সঙ্গে। দিনের বেলা সে রান্না করে, ঘরটর ঝাঁট দেয়, খেলা করে দুটোর সঙ্গে। ছোট ছেলেটি তাকে পছন্দ করে কিন্তু ছোট মেয়েটি তাকে ভয় পায়। সে নীরবে লক্ষ করে তার বাবা বাইরে থেকে ফিরে এলে মহিলা বাবার পায়ের কাছে বসে গাঁয়ের গল্প শোনে। বাবা সোৎসাহে মহিলাকে নিজের কাজের কথা, পড়শীদের গল্প শোনায়। বলার ভঙ্গিতে একটা গদগদ ভাব থাকে। যেন গল্প শুনিয়ে খুশি করতে চাইছে সুন্দরী মহিলাকে।

বসন্ত এল। গলতে শুরু করল বরফ। মহিলা আবার কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

‘এখানে কত সুখে ছিলাম আমি,’ বলল সে, ‘এখন আপনাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে এ দুঃখে বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে না আপনাদেরকে ছেড়ে যেতে। আপনারা তিনজন এখন আমার আত্মার আত্মীয়ের চেয়েও বেশি।’

‘তা হলে আমাদের সঙ্গে সারা জীবনের জন্য থেকে যাও,’ অনুনয় করল বনপাল। ‘আমি তোমাকে বিয়ে করব। তুমি আমার

সন্তানদের মা হবে।’

মেয়েটি লক্ষ করল তার বাবা এই মহিলার রূপে এমনই মজেছে, এক বছরও হয়নি তার মা’র কথা একদম ভুলে গেছে। মহিলাকে এখন আরও ডর লাগছে।

পরদিন বনপাল মহিলাকে নিয়ে গেল পাশের গাঁয়ে, প্রীস্টের কাছে। বিয়ে করবে। কিন্তু বৃদ্ধ প্রীস্ট এমন অসুস্থ, বিছানা থেকে ওঠার জো নেই। আরেকজন প্রীস্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। সে ওদের বিয়ে পড়িয়ে দিতে রাজি হলো।

অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে নিজের কুটিরে ফিরে এল বনপাল। নতুন মা পেয়ে বনপালের ছেলে খুব খুশি। কিন্তু মেয়েটি মোটেই খুশি হলো না। ভয় ও অস্বস্তি তাকে ঘিরে থাকল।

বিয়ের পরপরই নতুন বউ-এর চেহারা পাল্টে গেল। স্বামী বাড়ি না থাকলে সে কচি ছেলেমেয়ে দুটোকে সারাদিনের জন্য মাঠে পাঠিয়ে দেয় কাজ করতে। আর ওদের বাবা বাড়ি ফেরার পরে ওদের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে।

‘চলো, বাবাকে বলে দিই আমাদের নতুন মা আমাদের সঙ্গে কী রকম দুর্ব্যবহার করছেন,’ একদিন বোনকে বলল ভাই। ওদেরকে প্রায়ই কিছু খেতে না দিয়ে কাজে পাঠায় মহিলা।

‘এখনই কিছু বলার দরকার নেই। একটু ধৈর্য ধরো,’ পরামর্শ দিল বড় বোন। ভাইয়ের হাতে বাসি রুটির একটা টুকরো দিল। এ টুকরোটা ওদের মা শুয়োরের খোঁয়াড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল শুয়োরদের খেতে দিতে। মেয়েটি ওটা কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

একরাতে, সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করছে আকাশে, একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মেয়েটির। দেখল ওদের সৎমা খালি পায়ে, গায়ে শুধু একটা সাদা নাইট গাউন, খুলে ফেলল দরোজা। তারপর বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। গাঁয়ের নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটা দিল।

মেয়েটি ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল, আবার কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল। ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে ফিরে এল সৎমা। মেয়েটি দেখল মহিলার হাতে এবং সাদা নাইটগাউনে লাল দাগ। দাগগুলো নির্ঘাত রক্তের। আতংকিত হয়ে সে লক্ষ করল মহিলা নাইট গাউন খুলে ওটা চুল্লির আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। তারপর ধুয়ে নিল হাত। হাত ধোয়া গামলার পানি ফেলে দিল বাইরে। শেষে স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে গেল একটু পরেই।

মাসখানেক পরে, আবার আরেক পূর্ণিমার রাতে সৎমা আবার বেরিয়ে পড়ল কুটির থেকে। তবে এবারে ছোট মেয়েটি পিছু নিল তার। গতকাল শুনেছে এক পরিবারের একটি মেয়ে মারা গেছে। চার হপ্তা আগে আরেকটি মেয়ে করুণ মৃত্যুবরণ করেছে।

ছায়ার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ছোট মেয়েটি নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে দ্রুত কদমে চলতে লাগল; সৎমা গির্জার কবরস্থানে পৌঁছে গেছে, প্রকাণ্ড এক খণ্ড কালো মেঘ গ্রাস করল চাঁদ, আঁধারে ঢেলে দিল প্রকৃতি। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার যখন কালো মেঘের অন্তরাল থেকে উঁকি দিল চাঁদ, মেয়েটি দেখল তার সৎমার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সৎমা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড সাদা একটি নেকড়ে।

খানিকক্ষণ নিশ্চল রইল নেকড়ে, তারপর নাক উঁচিয়ে বাতাসে কীসের গন্ধ শুঁকল, এরপর এক লাফে পার হলো গোরস্তানের নিচু দেয়াল, ছুটে গেল সদ্য খোঁড়া একটা কবরের দিকে। থাবা দিয়ে কবরের মাটি খুঁড়তে লাগল।

ভীত, আতংকিত মেয়েটি কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়াল, ছুট দিল বাড়ি অভিমুখে, ঘরে এসে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। সে রাতে ঘুমের ভান করে জেগে রইল সে। ভোরের আলো ফুটবার খানিক আগে তার সৎমা ফিরে এল বাড়ি, গায়ের সাদা গাউন এবং হাতে যথারীতি লেগে রয়েছে রক্ত। সে রক্তমাখা গাউন পুড়িয়ে ফেলল, পানির গামলায় ধুয়ে নিল হাত।

ভাইকে ঘটনাটা বললে সে হেসে উঠল।

'তুমি আসলে দুঃস্বপ্ন দেখেছ,' মাঠে কাজ করতে করতে বলল ভাই। 'আমাদের নতুন মা'র সাকুল্যে নাইট গাউন আছেই একটা। সে ওটা পোড়াতে যাবে কেন? আর ওই গাউনটা সে রোদে শুকোতে দিয়েছে। ওই দ্যাখ।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। তাকাল বাড়ির দিকে। সত্যি, রশিতে সাদা গাউনটা শুকোচ্ছে। এটা কী করে সম্ভব হলো বুঝতে পারছে না সে।

'গাঁয়ের আবার কেউ যদি মারা যায়, আর তার পরের দিন যদি পূর্ণিমা হয়, সেদিন তোমাকে দেখাব সৎমা কী করে,' বলল মেয়েটি।

'আমি জেগে থাকার চেষ্টা করব,' বলল ভাই। 'কিন্তু সারাদিন এত পরিশ্রম করি যে রাতে বিছানায় শুলেই ঘুমে জড়িয়ে যায় চোখ। ঠিক সময়ে আমাকে জাগিয়ে দিও।'

মেয়েটি উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গাঁয়ে আবার কার মৃত্যু-সংবাদ শুনতে হয়। গাঁয়ের কেউ অসুস্থ নেই জেনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। মৃত্যু খবরও শুনল না সে। আজ রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব, পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল মেয়েটি। সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু দরোজা খোলার শব্দে জেগে গেল। দেখল তার সৎমা ঘর থেকে বেরুচ্ছে। 'উঠে পড়ো! উঠে পড়ো!' ভাইয়ের হাত ধরে ঠেলা দিল বোন। কিন্তু নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগল সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত ভাই।

অগত্যা মেয়েটি একাই বেরিয়ে পড়ল। জনশূন্য রাস্তায় গাছপালার আড়াল নিয়ে এগুতে লাগল সে। কিছুক্ষণ পরে সৎমাকে দেখতে পেল। মহিলা গির্জার গোরস্তানের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এবারে আর মেঘ ঢেকে দিল না চাঁদ।

মেয়েটি দেখতে পেল সৎমা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলছে নাইট গাউন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড সাদা নেকড়েয় রূপান্তর ঘটল তার। মেয়েটি চিৎকার দিল ভয়ে, পিছু হটল দেয়ালে। নেকড়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটার ওপর।

চিৎকার শুনে গির্জার তত্ত্বাবধায়ক জানালা খুলে তাকাল। 'নেকড়ে!' আর্তনাদ করল সে। 'একটা বিরাট সাদা নেকড়ে একটা বাচ্চাকে হামলা করেছে।' হাতের কাছে রাখা গুলিভরা বন্দুকটা ঝট করে তুলে নিল সে। নেকড়ে ততক্ষণে মেয়েটিকে ফেলে দিয়ে নাইট গাউনটা দুই সারি দাঁতের মাঝখানে কামড়ে ধরে গ্রামের দিকে ছুট লাগিয়েছে।

‘ওটা বনপালের মেয়ে,’ বলল তত্ত্বাবধায়কের বউ। ‘মেয়েটাকে বোধহয় নিশিতে পেয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে এদিকে এসে নেকড়ের কবলে পড়েছে।’ একটু বিরতি দিল সে। ‘ওর বাবাকে কী করে খবরটা দেব?’

মৃত মেয়েটিকে নিজেদের কুটিরে নিয়ে এল তারা। কামড়ের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করল। গায়ে সাদা একটা পোশাক পরাল। আড়াআড়িভাবে রাখা দু'হাতের পাঞ্জার ফাঁকে বুনো একটি সাদা ফুল গুঁজে দিল।

পরদিন কবর দেয়া হলো মেয়েটিকে। সৎমা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে মরাকান্না জুড়ে দিল। বনপালের চেয়েও বেশি কাঁদল সে। তবে তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বনপালের ছেলে।

সাতদিন বাদে সে গির্জার বিপরীত দিকের কামারশালায় ঢুকল। কামার তখন কাজে ব্যস্ত। ‘আমি জানি আপনি গাঁয়ের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ,’ কামারকে বলল ছেলেটি। ‘সে জন্য আপনার কাছে বুদ্ধি নিতে এসেছি। শুনেছি শয়তানের শক্তি নাকি আপনাকে সাংঘাতিক ভয় করে।’

‘তোমাকে কী বুদ্ধি দেব আমি?’ জিজ্ঞেস করল কামার।

‘দিন দুই আগে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি,’ বলল ছেলেটি। ‘দেখলাম আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আর আমার বোন একটা প্রকাণ্ড ওয়্যারউলফের পিছু নিয়েছে। মায়া নেকড়েটা আমার বোনকে মেরে ফেলল। আর তা দেখে চিৎকার দিয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

‘গত রাতে আবার একটি স্বপ্ন দেখেছি আমি। আবার দেখলাম পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। ওয়্যারউলফটা ক্ষুধার্ত হয়ে গির্জার গোরস্তানে এসে আমার বোনের কবর খুঁড়ে তাকে খেয়ে ফেলল।’

‘স্বপ্নের কথা তোমার বাবাকে বলেছ?’ জিজ্ঞেস করল কামার।

‘বাবা আমার কথা বিশ্বাস করবে না।’

'আর প্রীস্ট?'

'উনি বুড়ো এবং অসুস্থ। আমার কথা তিনি বুঝতে পারবেন না।'

'আমি অনেকদিন ধরে জানি এ গাঁয়ে একটা মন্দ-শক্তি বাস করে।' ধীর গলায় বলল কামার। 'কিন্তু একটু আগেও সেই শয়তানটার পরিচয় জানতাম না। তুমি আমার কাছে এসে ভালই করেছ।

'তোমার বাড়ি ফিরে যাও। চেহারাটা শোকাতুর করে রাখবে। আবার যেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে, জঙ্গলে গিয়ে তোমার বাবাকে তোমার সঙ্গে আসতে বলবে। বলবে তোমার বোনের জন্য আমরা একটি ধর্মীয় অনষ্ঠান করব। তোমার বাবাকে কিছুতেই বাড়ি যেতে দেবে না।'

'আপনি কি আমার বোনকে রক্ষা করতে পারবেন?'

'কথা দিচ্ছি শুধু তোমার বোনই নয়, আরও অনেককেই আমি রক্ষা করব।'

কামারশালায় যাকে পেল তাদের কাছ থেকে রুপোর মুদ্রা, রুপোর বোতল কিংবা রুপোর বগলস চেয়ে নিল কামার। সবাই কারণটা জানে। তাই আগ্রহ নিয়েই জিনিসগুলো কামারকে দিল তারা। রুপোর এই জিনিসগুলো গলিয়ে একটি সিলভার বুলেট বা রুপোর গুলি তৈরি করল কামার।

পরবর্তী পূর্ণিমা রাতের আগের দিন কামারশালায় হাজির হয়ে গেল গাঁয়ের সকল পুরুষ। তাদের সঙ্গে যোগ দিল বনপাল এবং তাদের ছেলেও। নীরবে তারা খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর নিঃশব্দে গুনতে লাগল অপেক্ষার প্রহর।

ঘণ্টা দুই পরে একটি নারীকে রাস্তা ধরে ছুটে আসতে দেখল তারা। হাওয়ায় উড়ছে তার ঝলমলে সোনালি কেশ, মাঝে মাঝেই ঢেকে দিচ্ছে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা, তার নগ্ন পা এত হালকাভাবে স্পর্শ করছে জমিন, দেখে মনে হয় সে দৌড়াচ্ছে না,

উড়ে বেড়াচ্ছে মাটির ওপর দিয়ে।

বনপাল নারীমূর্তিটির কাছে ছুটে যেতে চাইছিল। তাকে বাধা দিল সঙ্গীরা।

'দাঁড়াও,' বিড়বিড় করল তারা। 'দাঁড়াও এবং দেখো কী হয়।'

নারীটি পৌঁছে গেছে গোরস্তানের সামনে। দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল পরনের নাইট গাউন। পরমুহূর্তে দেখা গেল তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিশালকায় একটি সাদা নেকড়ে, মুখ উঁচু করে বাতাসে গন্ধ শুঁকল সে, তারপর এক লাফে পার হলো কবরস্থানের নিচু দেয়াল। পা বাড়াল বনপালের ছোট মেয়েটির কবরের দিকে। সাতাশ দিন আগে কবর দেয়া হয়েছে মেয়েটিকে।

'এখন?' শান্ত গলায় জানতে চাইল পুরুষরা।

'এখন,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কামার। কাঁধ বরাবর তুলল বন্দুক, সতর্কতার সঙ্গে স্থির করল লক্ষ্য, গুলি চালাল। সাদা রোমশ চামড়া ভেদ করে জানোয়ারটার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গেল সিলভারের বুলেট।

লাফ মেরে মাথা তুলল ওয়্যারউলফ, শেষবারের মতো যন্ত্রণাকাতর সুরে ডেকে উঠল, তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। গাঁয়ের লোকেরা তার কাছে যাওয়ার আগেই নিভে গেল তার প্রাণবায়ু।

'এমন কিছু ঘটার কথা কল্পনাও করিনি,' বলল বনপাল। 'সুন্দরী মেয়েটিকে আমার মনে হয়েছিল কোনও ভাগ্যহতা। আশ্রয় চেয়েছিল বলে ওকে আমার বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। জানতাম না ও একটা পিশাচী।'

গ্রাম থেকে দূরে একটি নির্জন জায়গায় ওয়্যারউলফটিকে কবর দেয়া হলো। কবরের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো মস্ত একটি পাথর। ছেলেকে নিয়ে বহুদূরের এক গাঁয়ে চলে গেল বনপাল, যেখানে কেউ জানবে না এক ওয়্যারউলফ তার সুখের সংসারটাকে তছনছ করে দিয়েছে।

পিশাচের কবলে

শেষ অবধি পথের দেখা মিলল। মরুভূমিতে অকস্মাৎ মরূদ্যান মিলে যাওয়ার মতো একটা চমকপ্রদ ঘটনা যেন। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে হলো শাওনের। ও ধরেই নিয়েছিল রাতটা বনের ভেতরেই কাটাতে হবে। আর তা যদি হতো, দুর্ভোগ্যের কোন শেষ থাকত না। হয়তো জীবন নিয়েও আশংকা দেখা দিত। যেন একটা জীবন্ত দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে এল ও।

শিকারে বেরিয়েছিল শাওন। একা নয়, সাথে দুই মামাতো ভাইও ছিল। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে গেছে। আর বাড়িতে শুরু হয়েছে মহা হুলুস্থূল। বড় মামা অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। শাওন কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেল, সদলবলে লাঠিসোটা নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরিয়েছেন বড় মামা। এখান থেকে উজানতলি কতদূর কে জানে?

ইতিমধ্যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। পুব আকাশে আষাঢ়ী পূর্ণিমার চাঁদ। চারদিকে খা-খা জোছনা। পথঘাট দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আশেপাশে কোন বাড়িঘর নেই। দূরে অবশ্যি ক'টা আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে ওদিকেই এগোল ও।

যেতে যেতে নিজেকে আরেকবার ভর্ৎসনা করল শাওন। মামারা সবাই আজ ওদের শিকারে বেরোতে বারণ করেছিলেন। বর্ষাকাল শিকারের জন্যে নয়। এ সময় সাপ-খোপের ভয় থাকে বনে। জন্তু-জানোয়ার পানির ভয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নেয় উঁচু শুকনো জায়গাগুলোতে। কিন্তু মামাতো ভাইয়েরা ওকে ফিসফিস করে বলল, আষাঢ় মাসই হচ্ছে বনমোরগ ধরার আসল সময়। বৃষ্টিতে ভিজে জবুথবু হয়ে থাকে ওরা। গাছের ডাল, মাটির ঢিবি এসব জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়।

এক রকম পালিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওরা। তিনজনের সাথেই পয়েন্ট টুটু বোর। উজানতলি থেকে মাইল চারেক দূরে এক পাহাড়ের ওপর বন। পাহাড়টা তেমন উঁচু নয়, তবে গাছ-গাছালি একটু ঘন। বনে ঢুকে একটা গাছকে চিহ্নিত করে তিনজন তিনদিকে চলে যায়। কথা ছিল ঠিক দু'ঘণ্টা পর চিহ্নিত গাছতলে এসে মিলবে ওরা। কিন্তু একটা বড়সড় মোরগের পেছনে ছুটতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে শাওন। তারপর অনেক ভোগান্তির পর এই বেরিয়ে আসা। বড়দের নিষেধ না শুনে সত্যিই একটা

বিরাট বোকামি করে ফেলেছে ও।

মিনিট বিশেক পর আলোর বিন্দুগুলো বৃত্তে রূপ নিল। আরো মিনিট দশেক পর একটা ছোটখাটো বাজারে এসে পৌঁছাল শাওন। ক'টা মুদি দোকান আর খুপরি মতো একটা হোটেল নিয়ে বাজারটা। হোটেলে ঢুকেই শাওন টের পেল পেটে ভীষণ খিদে। শরীরটাও খুব ক্লান্ত। তা তো হবেই। চার-পাঁচবার বিশ্রাম নেয়া বাদে সেই দুপুর থেকে সন্ধ্যে অবধি পথের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে ও। বুনো কাঁটার আঁচড় খেয়ে কেডস জোড়া ক্ষত-বিক্ষত। জিনসের প্যান্টটারও নিচের দিকে কয়েক জায়গায় সুতো ছিঁড়ে গেছে।

হোটেলে আর কোনও খদ্দের নেই। কোনো বয়-বেয়ারাও দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব মালিক নিজেই সবকিছু। ঝাঁপ ফেলতে যাচ্ছিল সে, শাওনকে দেখে আবার হাঁড়ির কাছে ফিরে গেছে। এরই মধ্যে এক জগ পানি রেখে গেছে টেবিলে। মুখ-হাত ধোয়ার পর ক্লান্তি অর্ধেক কমে গেল শাওনের। বাঁশপাতা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার পর অনেকটা সজীব মনে হলো নিজেকে। বিল মিটিয়ে দিতে দিতে হোটেলঅলাকে শুধোল, 'উজানতলি এখান থেকে কতদূর?'

'তা মাইল দশেক তো অইবোই।'

'এখান থেকে যাবো কি করে?'

'দিন থাকলে রিকশা পাইতেন। এই রাইত কইরা হাঁটন ছাড়া উপায় নাই। বড় সড়ক ধইরা সিদা হাঁইটা যাইবেন। তয় রাইত কইরা না যাওনডাই ভালা।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল শাওন। 'ডাকাত-লুটেরার উপদ্রব আছে নাকি?'

'জ্বে না, উপরদবডা অন্য এক জিনিসের। রাইত কইরা কওনডা ঠিক অইব না।'

শাওন অনুমান করল হিংস্র জন্তুর ভয় দেখাচ্ছে সে। তাজা কার্তুজ ভরা আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে জন্তু-জানোয়ার আসবে ওর সামনে? ফুঃ!

হোটেলঅলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে রওনা দিল শাওন।

চাঁদ এখন অনেকটা ওপরে। অকৃপণ মায়াবী আলো ছড়িয়ে চলেছে নিশিরানীর বুকে। প্রশস্ত কাঁচামাটির সড়কের দু'ধারে, হালকা ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক। এখানে-ওখানে জোনাকির ঝাঁক আঁধার ফুটো করে জ্বলছে। সকালের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। এখন একরত্তি মেঘও নেই। তবে যে কোনো মুহূর্তেই আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যেতে পারে। বর্ষার মেঘকে একটুও বিশ্বাস নেই। বাতাস বইছে থেমে থেমে। ভেজা বাতাসে কেমন একটা অচেনা গন্ধ।

হঠাৎ শাওনের মনে হয় কে যেন পিছু পিছু আসছে। ঘাড়ের ওপর অস্বস্তিকর অনুভূতি। গান থামিয়ে থমকে দাঁড়ায় ও। ধীরে ধীরে পেছন ফেরে।

একটা লোক খুব দ্রুতগতিতে হেঁটে আসছে। বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নেয় ও। ততক্ষণে লোকটা কাছে এসে পড়েছে। এসেই একগাল হাসি, 'ভাইজান, যাইবেন কই?'

'উজানতলি।'

'আমিও ওদিকেই যামু। ভালই অইল। একজন সাথী পাইয়া গেলাম।'

শাওনও মনে মনে খুশি। দশ মাইল পথ, কম দূর তো নয়, একজন সঙ্গী পেলে কথায় কথায় একঘেয়েমিটা কাটানো যাবে। তাছাড়া ডরভয় বলেও কিছু থাকবে না।

যেতে যেতে শাওন লোকটার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিল। লোকটা মাঝারি গড়নের, গায়ের রঙ কালোই হবে—জোছনার আলোয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। রোগা স্বাস্থ্য, চেহারায় কেমন বোকা-বোকা একটা ভাব। কণ্ঠস্বরে নিখাদ আন্তরিকতা। কালো একটা হাফ শার্ট গায়ে দিয়েছে সে, পরনে লুঙ্গি। পায়ে চপ্পল গোছের কিছু একটা হবে।

শাওন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা কি, ভাই?'

'গরিবের নাম শুইনা কি করবেন, ভাইজান?' ছন্নছাড়া দুঃখী মানুষের মতো হাসল সে। 'আমার খবর শুইনা অযথা মেজাজ

খারাপ অইবো। তার চাইতে আপনের খবর কন। শহরের মানুষ অইল খবরের জাহাজ।'

শাওন হাসল, 'আমি শহরের মানুষ—বুঝলেন কি করে?'

'ভাইজানে যে কি কয়! এইরকম জামাজুতা পইরা কান্ধে বন্দুক ঝুলাইয়া আর কে রাস্তা দিয়া হাঁটবে? আমার মতন গেরাইম্যা ভূত?'

শাওন অন্য কথা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি করেন কি?'

'তেমন কিছু না। আউলা বাউলা প্রাণী। বন-জঙ্গলে ঘুইরা বেড়াই।'

'মানে?'

'আমি একজন গায়েন।'

'তাহলে তো ভালই হলো। গান শুনতে শুনতে যাওয়া যাবে। শোনান না একটা গান।'

'আমার গান আপনের ভাল লাগবে না,' কেমন শীতল আর উদাস শোনাল তার কণ্ঠ। আন্ধার জীবনের গান কারোরেই ভাল লাগে না।'

গায়েনের কথা শেষ হতে না হতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। রাস্তার ধারে এক জায়গায় গাছ-গাছালির ঘন সন্নিবেশ থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো নিশাচর পাখি ডেকে উঠলো আচম্বিতে। যেন পাথর-রাত্রির গায়ে তীক্ষ্ণ দাঁতঅলা একসারি করাত ঝাঁপিয়ে পড়ল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শাওনের। গায়েনের মাঝে কোন ভাবান্তর নেই। যেন পাখিগুলোর ভয়াল ডাক কানেই যায়নি তার। উদাস হয়ে কী ভাবছে সে-ই জানে।

মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দেই হাঁটল ওরা। তারপর হঠাৎ করেই গান শুরু করে দিল গায়েন। ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠ। খানিক আগের সেই মোলায়েম কণ্ঠের সাথে একটুও মিল নেই। গানের মর্মার্থ ভাব মেশানো। মানুষ আঁধারকে ভয় করে, ঘৃণা করে, অসুন্দর বলে ধিক্কার দেয়, তবু সেই আঁধারকেই ভালবাসে গায়েন। তার বেসুরো গান শুনে কিনা জানি না, কতগুলো বাদুড়

ওড়াউড়ি করতে লাগল মাথার ওপর দিয়ে। ভীষণ রাগ হলো শাওনের। নিজের ওপরেই। কেন সে লোকটাকে গান গাইতে বলেছিল।

মাঝপথে আচমকা গান থামিয়ে দিল গায়েন। শাওনের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তাড়াতাড়ি দোয়া পড়েন, ভাইজান। সামনে নিমতলি শ্মশান!'

শ্মশানকে ভয় পায় না শাওন। কিন্তু গায়েনের কথার ঢঙেই গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গী ভাল, তবে ভীতু সঙ্গী ভাল নয়—খুব ভাল করেই উপলব্ধি করল ও।

ওরা এখন শ্মশান পেরোচ্ছে। বাঁ দিকে রাস্তা থেকে অল্প এগোলেই শ্মশান। তাকাবো না তাকাবো না করেও শেষমেশ শ্মশানের দিকে তাকাল শাওন। একটা ডোবার ধারে চার-পাঁচটা উঁচু নিমগাছ, গাছ আর ডোবার মাঝখানে প্রশস্ত জমিটুকুতে মরা পোড়ানো হয়। ভয় পাবার মতো কিছুই নেই ওখানে।

গায়েনকে শাওন বলল, 'শ্মশানটা ভাল করে দেখে নিন। আপনার ভয়টা কেটে যাবে।'

গায়েন শ্মশানের দিকে তাকানোর আগেই পেছন থেকে দ্রুত এগিয়ে আসার হৈচৈ শুনে হকচকিয়ে গেল। শাওনও থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল। পরক্ষণে দুটো শেয়াল তীব্র বেগে পাশ কাটাল ওকে। তারপরই দশ-বারোজন মানুষ লাঠি আর বল্লম নিয়ে হাজির। শাওন ভাবল ডাকাত। বুক শুকিয়ে এল ওর। এতগুলো ডাকাতের সাথে একটা বন্দুক দিয়ে কি করবে?

শাওনের ধারণা ভুল প্রমাণ করে বল্লম হাতে মাঝবয়েসী এক লোক ওকে শুধোল, 'কুটুমের বাড়ি কই গো?'

'বাড়ি শহরে। উজানতলিতে মামার বাড়ি যাচ্ছি।'

'এই রাত্রিবেলায় যাওন তো ঠিক অইব না। এই রাস্তাটা ভালা না। বিপদ অইতে পারে। আপনে আমাগো লগে চলেন। রাইতটা কাটাইয়া সকালে রওনা দিবেন।'

'ধন্যবাদ। রাতেই ওখানে পৌঁছতে হবে আমাকে। সবাই চিন্তা করছে। শিকারে বেরিয়ে বনের ভেতর পথ হারিয়েছিলাম।'

‘কিন্তু কুটুম, একা একা—’

‘একা কোথায়?’ লোকটাকে কথা শেষ করতে দিল না শাওন। ‘এক গায়েন আছে আমার সঙ্গে।’

‘কই সে লোক?’

পেছন ফিরে শাওন দেখে গায়েন নেই। নিশ্চয়ই ভয়ে দৌড় দিয়েছে। ও বলল, ‘লোকটা একটু ভীরু প্রকৃতির। আপনাদের দেখে আড়ালে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। মনে করেছে ডাকাত। আপনারা চলে গেলেই আবার বেরিয়ে আসবে।’

‘ও, আইচ্ছা,’ একটু যেন মন খারাপ হলো লোকটার। ‘তাইলে আমরা যাই গো, কুটুম। ভালয় ভালয় য্যান বাড়ি ফিরতে পারেন।’

লোকগুলো চলে গেল। কিন্তু গায়েনের ফিরে আসার কোন লক্ষণই নেই। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে আবার রওনা হলো শাওন। যেতে যেতে বেশ ক'বার ‘গায়েন’ ‘গায়েন’ বলে চেঁচাল। কোনো সাড়া মিলল না।

সামনের তেরাস্তার মোড়ে বটগাছের তলে পাওয়া গেল গায়েনকে। শাওনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। শাওন তাকে দেখেই ভর্ৎসনা করল, ‘আপনি একটা আস্ত ভীতুর ডিম। কতগুলো মানুষ শেয়াল তাড়াতে তাড়াতে এসেছে, আর তা দেখেই আপনি দৌড়ে পালালেন!’

অন্ধকার থেকে চাঁদের আলোতে বেরিয়ে এল গায়েন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘ভয় কি আর সাধে পাইছি? আপনে যদি জানতেন সেই কথা, তাইলে আপনেও দৌড়াইতেন।’

‘সেই কথাটা শুনি।’

‘এই রাইত কইরা বলাটা—’

‘কিচ্ছু হবে না বলুন।’ জেদি কণ্ঠ শাওনের।

‘সবাই কয় একটা পিশাচ নাকি আছে এইদিকে। রাইতে এই পথে ঘোরাঘুরি করে। তার সারা শরীরভর্তি চোখ। যে তারে দেখে

সে ভয়ে মইরা যায়।'

হো হো করে হেসে উঠল শাওন। 'এটা একটা গুজব ছাড়া কিছুই না।'

'জ্বে না, গুজব না। এই দ্যাখেন।'

গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল সে। শাওন চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখল তার গা-ভর্তি অসংখ্য চোখ। সবগুলোই পিট পিট করছে।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

প্রেতের হাসি

সে অনেক কাল আগের কথা। তখন বাংলার পল্লী অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং শহর অঞ্চলের এত উন্নতি হয়নি। তখন লোকের অভাব-অভিযোগ কম ছিল। কারণ জিনিসপত্র ছিল খুব সস্তা। বাঙালী চাকরির জন্য পাগল হয়ে শহরে ছুটে আসত না। গ্রামের নদী, পুষ্করিণী ও শস্যক্ষেত্র গ্রামবাসীদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করত। গ্রামের জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তখন গ্রামেই থাকতেন। পরিবার সকল একান্নবর্তী ছিল এবং পুরুষেরা কেউ কেউ রোজগারের জন্য বিদেশে গেলেও বাকি সকলে গ্রামেই থাকতেন। সে সময় বাংলার জনসংখ্যা অনেক কম ছিল, সেই জন্য জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। গ্রামের আশ-পাশ নির্জন থাকাতে লোকের মন ডাকাত ও ভূত-প্রেতের ভয়ে আচ্ছন্ন ছিল। তখন গঙ্গা ময়রার মতো ভূতের রোজারা বহু রোজগার করতেন। শিকড়-বাকড়ে লোকের বিশ্বাস ছিল, অবশ্য তাদের গুণও ছিল যথেষ্ট।

সেই কালে, আমাদের যশোর জেলার কোন এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাস করতেন। গ্রামের নাম ছিল কল্যাণপুর আর দেবেনবাবু ছিলেন সেই গ্রামের জমিদার। তাঁর দু'মহলা চক-মিলান বাড়ি ছিল। বাইরের মহলে ছিল জমিদারবাবুর বৈঠকখানা, নায়েব গোমস্তাদের দপ্তর এবং বাইরের কোন অতিথি এলে তাদের থাকবার ঘর। বাইরের মহলের পর উঠোনে, তার পরেই অন্দর-মহলে যাবার একটি গলিপথ ছিল। অর্থাৎ বাইরের উঠোনের রক থেকে অন্দরমহলে যাবার একটি গলিপথ দিয়ে অন্দরের উঠোনের রকে যাওয়া যেত। অন্দর-বাড়ির মস্ত উঠোন। সেই দিকেই রান্না-বাড়ি, ভাঁড়ার-ঘর, দাসীদের থাকবার ঘর ছিল। অন্দরের দোতলায় দেবেনবাবুর পরিবারবর্গ বাস করতেন।

কল্যাণপুরের দশ মাইল উত্তরে ঊষা গ্রামে দেবেনবাবুর জমিদারী ছিল। এই গ্রামে নায়েব তসিলদার ছিলেন রামচন্দ্র পাল। তাঁর একটি মাত্র ছেলে নরেন বা নরু। সে সেই বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে। টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নরেন রামবাবুকে বলল, 'বাবা, আমাদের বাড়িতে মোটে দুটি ঘর। আমার পড়াশোনার বড় অসুবিধা হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষার আগে এই দুটো মাস আমি যদি অন্য কোন স্থানে থেকে পড়তে পারতুম, তা হলে আমি পাস সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারতাম।'

রামবাবু কথাটা বুঝলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন উপায় স্থির করতে পারলেন না। ঊষা গ্রাম ছিল খুব ছোট। গ্রামটির তিনদিকে জঙ্গল ও একদিকে ছিল প্রকাণ্ড মাঠ। যদিও এই গ্রামে কয়েক ঘর মধ্যবিত্তের বাস ছিল, কারো এমন বড় বাড়ি ছিল না, যেখানে একটি খালি ঘর পাওয়া যায়। এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে জমিদার মশায়ের কথা মনে পড়ল। দেবেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক ও দয়ালু। রামবাবু নিশ্চিত জানতেন যে তাঁর ছেলেকে দু'মাসের জন্যে স্থান দিতে জমিদারবাবু কখনও আপত্তি করবেন না। তিনি তাঁর ছেলে নরুকে বললেন, 'বাবা, আমি তোমার থাকবার স্থান স্থির করেছি। আমি আজই কল্যাণপুর গিয়ে বাবুমশাইকে অনুরোধ করব তিনি যেন তোমাকে পরীক্ষার দুটো মাস তাঁর বাড়িতে রাখেন। কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি। সেই বাড়িতে বাবুমশাইয়ের পরিবারবর্গ বাস করেন। হয়তো তাঁরা তোমার সঙ্গে মেলা-মেশা করবেন। তুমিও তাদের সঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলবে। তোমার আঠার বছর বয়স হয়েছে, তোমাকে বেশি কিছু বলা বাহুল্য। দেখো বাবা, কেউ যেন আমার নরুর নিন্দে না করে।'

নরু বলল, 'বাবা তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের মনিব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কিরূপভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি। তা ছাড়া আমি তো দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকব। তোমার ভয় নেই, কেউ তোমার ছেলের নিন্দে করবে না।'

রামবাবু যা ভেবেছিলেন, তাই হলো। জমিদারবাবু অতি আনন্দের সঙ্গে নরেনকে তাঁর বাড়িতে রাখতে রাজি হলেন। নরেন যে ঘরটি পেল তার দরোজার সামনেই রক, তারপরেই উঠোন এবং উঠোনের অপরদিকে অন্দরমহলে যাবার রক, সেখান থেকে অন্দরের উঠোনে যাবার শুঁড়ি-পথটি আরম্ভ হয়েছে। নরেন এই ঘরে থেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সে অন্দরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করত এবং অতিশীঘ্রই জমিদার গৃহিণী ও তাঁর কন্যাদের স্নেহ আকর্ষণ করে নিল। নরেন ছিল শান্তশিষ্ট ও বিনয়ী। সেই জন্যে সে সকলকার স্নেহ-ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারত। জমিদার গৃহিণী ও কন্যারা নরেনের সঙ্গে আপনজনের মতো ব্যবহার করতেন। এইভাবে নরেন কল্যাণপুরে জমিদার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হল। নরেন তার লেখাপড়ার একটি প্রণালি স্থির করে, দিন-রাতে ক'ঘণ্টা কি বিষয়ে পাঠ করবে, তা ঠিক করে নিল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরও সে ঘণ্টা-দুই লেখাপড়া করত। রাত ঠিক বারোটা বাজলে লেখাপড়া বন্ধ করে তার ঘরের বাইরের রকে বসে হাত-মুখ ধুতো এবং ঘরে গিয়ে দরোজা বন্ধ করে শুয়ে

পড়ত।

এইভাবে দিন যায়। একদিন রাতে ঠিক বারোটার সময় রকে বসে হত-মুখে জল দিয়ে নরেন যখন উঠে দাঁড়াল, উঠোনের অপর দিকে, অন্দরে যাবার রকের দিকে তার নজর পড়ল। নরেন দেখল যে সেখানে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নরেন তাকে চিনতে পারল না। সে তাড়াতাড়ি দরোজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

পরদিন রাত্রি নরেন পড়ছে আর ভাবছে কে সে মেয়েটি? অত রাত্রে রকে দাঁড়িয়ে কি করছিল? আজও সে আসবে না কি? নরেন পড়ে, আর মধ্যে মধ্যে মেয়েটির কথা ভাবে। এই দোনামনা করতে করতে রাত বারোটা বাজল। নরেন বাইরে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে প্রথমেই ওদিকের রকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। দেখল, ঠিক সেইখানে সে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। নরেন লজ্জা পেল, কিন্তু অদম্য কৌতূহলবশত মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটিও নরেনকে একদৃষ্টে দেখছিল। ক্রমে মেয়েটি আস্তে আস্তে নরেনের দিকে এগুতে লাগল—যেন নরেনকে কি বলবে। ক্রমে মেয়েটি উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে নরেনের দিকে আসতে লাগল। কিন্তু নরেন আর অপেক্ষা করল না। তার বুক ধড়ফড় করছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিল।

নরেনের সে রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না। পরদিনও সারাদিন মনটা উচাটন হয়ে রইল। 'কে এ মেয়েটি? কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। এত রাত্রে সে আমার ঘরের দিকে কেন আসছিল? গোড়ায় মনে করেছিলুম বাবুদের বাড়ির কোন মেয়ে। কিন্তু তাও তো নয়। মেয়েটি কী ভাল মেয়ে নয়? অথচ মুখ দেখে তো সে রকম মনে হয় না! মুখে কেমন সরল ভাব, যেন আমাকে কি বলতে চায়! দেখি, আজও যদি আসে তো তার পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।' নরেন সারাদিন এইসব কথা ভাবল, কিছুতেই মেয়েটিকে মন থেকে সরাতে পারল না। সেদিন একটুও পড়াতে মন বসাতে পারল না। রাত বারোটা। নরেন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখল যে, মেয়েটি আজ রক থেকে নেমে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। নরেনকে দেখেই মেয়েটি তার কাছে অগ্রসর হয়ে এল। আজ আর নরেন তাকে ফেরাতে পারল না। মেয়েটি নরেনকে মিষ্টি স্বরে বলল, 'তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে, তাই একটু গল্প করতে এলুম। চল তোমার ঘরে গিয়ে বসি।'

মেয়েটির চোখে কি ছিল জানি না, নরেন যেন মন্ত্রমুগ্ধ কিংবা মোহগ্রস্তের মতো হয়ে পড়ল। কেমন এক অবর্ণনীয় ভাব

অনুভব করল। সেটা আনন্দ, ভয়, মোহ না সুখ? নরেনের মন এবং দেহ দুই-ই যেন আর স্ববশে রইল না। সে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে প্রবেশ করল।

নরেন বলল, 'তুমি কে?'

মেয়েটি বলল, 'আমি মালতী। তুমি আমায় চেন না! আজ ক'দিন তোমায় দেখছি। তোমায় বড় ভাল লেগেছে, তাই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলুম। তুমি রাগ করনি তো?'

নরেন বলল—'আচ্ছা, তুমি এত রাত্রে আস কেন?'

মেয়েটি—'ঠিক রাত বারোটার সময় আমার আসবার সুযোগ হয়। অন্য সময়ে আমি চেষ্টা করলেও আসতে পারি না। এই সব জিনিস একদিন আমি তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলব। আমি রোজ ঠিক রাত বারোটার সময় আসব ও দুটোর সময় চলে যাব। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। আমার পরিচয় জানতে চেও না। আমি তোমার বন্ধু এই কি যথেষ্ট পরিচয় নয়?'

নরেনের তখন স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। তা নইলে হয়তো সে মেয়েটির পুরো পরিচয় জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু সে তা করল না। সে মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে লাগল। তার মনে অনির্বচনীয় আনন্দ, যেন কেমন মোহগ্রস্ত ভাব। নরেনের একবারও মনে হল না যে, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এক অপরিচিতা মেয়ে ঠিক রাত বারোটার সময়ে কেন আসে, এক মিনিট আগে কি পরে আসতে পারে না—এর মানে কি?—তার আত্মীয়-স্বজনই বা কোথায়?—এসব কোন কথা নরেনের মনে উদয় হল না। সে কেবল তার সঙ্গে কথাবার্তার আনন্দে ডুবে রইল।

রাত দুটো বাজতেই মেয়েটি উঠে বলল, 'আজ যাই, কাল ঠিক বারোটায় আসব।' বলে মেয়েটি ঘরের বাইরে চলে গেল। নরেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে আর মেয়েটিকে দেখতে পেল না। সারা উঠোন খাঁ খাঁ করছে আর রকে কোন জন-মনিষ্যি নেই।

পরদিন আবার ঠিক রাত বারোটার সময় মালতীর আগমন হল, পড়া সেরে ঘরের বাইরে যেতেই দরোজার কাছে মালতীকে সে দেখতে পেল। তার পরে দুজনে ঘরের ভিতরে এসে গল্প-গুজব আরম্ভ করল।

এইরূপে দিন কাটছে, নরেনের লেখাপড়া চুলোয় গেছে। নরেন সর্বক্ষণ মেয়েটির কথা ভাবে—এমনই তার আকর্ষণ। সে সারাদিন উদগ্রীব হয়ে থাকে—কখন রাত বারোটা বাজবে। মেয়েটির সঙ্গ উন্মাদকর এবং রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত এই দুই ঘণ্টা সুখ-স্বপ্নের মতো কেটে যায়। কখনো কখনো নরেন ভাবে যে, কে এই মেয়েটি, কোথায় থাকে, কার মেয়ে, কেন সে রাত্রি বারোটার সময় আসে, কেন দুটোর পরেই চলে যায়—কিছুই বুঝতে পারে না। তাকে জিজ্ঞেস করলে মালতী কেবল হাসে, বলে, 'আমার পরিচয় নিয়ে কি হবে? কেন, আমাকে কি পছন্দ কর না? তুমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা কর—কেনই বা আমি বারোটার সময় আসি ও দুটোর সময় চলে যাই। তার কারণটা আজ তোমায় বলি। রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত যে ক্ষণ, কেবল সেই সময়টাই আমি তোমার কাছে আসতে পারি। আমার এমন ক্ষমতা নেই যে আমি বারোটার আগে আসি কিংবা দুটোর পরেও থাকি।'

নরেন এই সব কথা শোনে আর তার মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হয়। এক একবার এ কথাও তার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে যে, এ কি মানুষ নয়? আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করল যে, মালতী চলে যাওয়ার পর তার দেহমনে একটি গভীর অবসাদ আসে। সে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ে ও পরদিন উঠতে অনেক বেলা হয়ে যায়। সে আরও লক্ষ্য করল যে, তার শরীর দিনের পর দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে এ কথা তার মনে বদ্ধমূল হল যে মালতীর সঙ্গ তার জন্য মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু কি করা যায়? কি করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবে? নরেন বেশ বুঝতে পেরেছে যে, এ তার পক্ষে অসম্ভব এবং এভাবে আর দিন-কতক চললে তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। নরেন উপায় ঠাওরাতে লাগল যে কি করে মালতীর আসা বন্ধ করা যায়। সে ভাবল যে, 'মালতী যখন বলছে যে রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত তার আসবার সময়, আমি কেন সেই সময়টা দরোজা বন্ধ করে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকি না? সে দরোজা বন্ধ দেখে বুঝতে পারবে যে আমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছি।' নরেন প্রতিজ্ঞা করল যে, সেই রাত্রেই সে ওইরূপ করবে।

সেইদিন রাত্রে এগারোটার সময় নরেন দরোজা বন্ধ করে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে ঘুমাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুম

কিছুতেই এল না। যখন জমিদার বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে তখন ঘরের মধ্যে খসখস করে কেমন একটা শব্দ হল। নরেন এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিল। খসখস শব্দ শুনে নরেন চোখ মেলে দেখল যে মালতী ঘরের ভিতর দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এই ব্যাপারে নরেন হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সে মালতীকে দেখে আবার মোহাবিষ্ট হল এবং তাড়াতাড়ি উঠে বসে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল।

মালতী হাসিমুখে বলল, ‘আজ যে বড় দরোজা বন্ধ করে রেখেছ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?’

নরেন বলল, ‘না না, শরীরটা খারাপ বোধ হওয়াতে বিছানায় শুয়েছিলাম, মতলব ছিল বারোটা বাজলেই বাইরে যাব। কিন্তু তুমি ঘরের ভেতরে এলে কি করে?’

মালতী হাসতে হাসতে বলল, ‘আমি এক ম্যাজিক জানি, দরোজা বন্ধ থাকলেও কি করে ঘরের ভেতরে আসতে পারা যায়, সে কথা তোমাকে একদিন আমি বুঝিয়ে দেব।’

সে রাত্রে মালতী চলে গেলে নরেন এক লহমাও ঘুমোতে পারল না। সে কেবলই ভাবে যে মালতী কি করে দরোজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভিতরে আসতে পারল! যেটা এতদিন তার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল এখন সেই ধারণা বদ্ধমূল হল। মালতী যে মানুষ নয়, কোন মৃত স্ত্রীলোক— এই ধারণা তার মনের ওপর চেপে বসল। কিন্তু আত্মা তো অশরীরী, সে দেহ ধারণ করে কি করে? ক্রমে নরেনের মনে পড়ল যে মালতী বারবার বলেছে যে, কেবল রাত বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত সে নরেনের কাছে আসতে পারে। নরেন ভাবল, হয়তো কেবল এই সময়টুকুর জন্যই সে স্থূল দেহ ধারণ করতে পারে। নরেনের এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না এবং কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না। তবে এটা সে বুঝল যে, এইভাবে আর কিছুদিন চললে—পাশ করা দূরে থাকুক—তার প্রাণ সংশয় হবে।

এর দু-চারদিনের ভিতরই নরেন কঙ্কালসার হয়ে পড়ল। ভয় ও প্রেতসঙ্গ তার শরীর আর মনকে দগ্ধ করে দিল। দিন-রাত তার খাওয়া নেই, ঘুম নেই—কেবল রাত্রে ওই দু'ঘণ্টা সে ভুলে থাকে, এমনি মালতীর আকর্ষণ আর এমনি নরেনের মোহ।

বাড়ির সকলে দেখল যে, নরেন শুকিয়ে যাচ্ছে। একদিন গৃহিণী অনুযোগ করলেন, সে যেন রাত জেগে বেশি পড়াশোনা না

করে। তার পুষ্টিকর খাবারেরও বন্দোবস্ত করলেন। নরেন প্রথমটা লুকোতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে শেষটা নরেন সেই মেয়েটির কথা বলে ফেলল। একটি ভদ্রলোকের মেয়ে রাত্রে ঘরে আসে শুনে জমিদারবাবু চমকে উঠলেন ও বার বার সে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। নরেন বলল, 'আমি অনেক জিজ্ঞাসা করেছি, কোন পরিচয় দেয় না।'

জমিদার—'তুমি তাকে ঘরে ডেকে আন কেন?'

নরেন—'আমি ডাকি না, সে আপনি আসে।'

জমিদার—'তুমি দরোজা বন্ধ করে থাক না কেন? তুমি তো বলছ যে, সে রাত বারোটার আগে আসতে পারে না। তুমি তার আগেই দরোজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ো না কেন?'

নরেন—'আমি দরোজা বন্ধ করে দেখেছি। দরোজা বন্ধ থাকলেও ঘরে আসে।'

জমিদারবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, 'তুমি কি গাঁজাখুরি কথা বলছ? দরোজা বন্ধ থাকলে সে আসবে কেমন করে?'

নরেন—'তা জানি না। বোধ হয় তার কোন অমানুষিক ক্ষমতা আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে খালি হাসে আর বলে, 'একদিন বুঝতে পারবে।'

নরেনের কথা শুনে দেবেনবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন না এর রহস্যটা কি। তিনি নরেনকে ভালভাবে জানতেন যে সে সত্যবাদী ও সৎ। বিশেষত তাঁর সামনে সে কখনই মিথ্যা কথা বলবে না। তিনি নরেনকে বললেন, 'তুমি আমাকে এই ব্যাপারটা দেখাতে পার?'

নরেন—'নিশ্চয় পারি। আপনি রাত বারোটার কিছু আগে থাকতে আমার পাশের ঘরটায় লুকিয়ে থাকবেন, তা হলে সবই দেখতে-শুনতে পারবেন।'

দেবেনবাবু তখনই নরেনের ঘরে গেলেন ও দরোজা, জানালা সব তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, দরোজা বন্ধ থাকলে বাইরে থেকে সে-ঘরে আসা একেবারে অসম্ভব। এই ঘরের পাশেই একটি ছোট ঘর ছিল এবং দুই ঘরের মধ্যে একটা

ছোট জানালা ছিল। দেবেনবাবু ভেবে দেখলেন যে, ওই জানালাটা খুলে যদি কেউ আলো নিভিয়ে ওই ছোট ঘরটায় লুকিয়ে থাকে, তা হলে নরেনের ঘরের সব ব্যাপারই সে লক্ষ করতে পারবে। দেবেনবাবু মনে মনে এই প্ল্যান স্থির করে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করলেন।

রাত বারোটার কিছু আগে দেবেনবাবু সেই ছোট ঘরটায় গিয়ে লুকিয়ে রইলেন, কিন্তু নরেনের ঘরের ভিতর খর দৃষ্টি রাখলেন। নরেন দরোজা বন্ধ করে শুলে তিনি দরোজাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, যাতে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে মেয়েটি ঘরের ভিতর না আসতে পারে।

দেবেনবাবু এইভাবে চেয়ে আছেন আর নরেনের ঘরে আলো জ্বলছে। ঠিক বারোটার সময় তাঁর চোখে কেমন ধাঁধা লাগল। তিনি মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেন। তখনই চোখ চেয়ে দেখলেন যে একটি সুন্দরী মেয়ে নরেনের ঘরের ভিতর দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কি যে কি হল, তিনি ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। তারপর মালতী ও নরেন যখন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল দেবেনবাবু চুপিসারে সে ঘর থেকে চলে গেলেন। মালতী যে প্রেতিনী, সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন প্রত্যুষেই দেবেনবাবু নরেনের বাবাকে এক জরুরী পত্র লিখে ঘোড়সওয়ার দিয়ে ঊষা গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখলেন, 'তুমি এখনই এসে নরেনকে তোমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে তার প্রাণ-সংশয়।' আর নরেনকে ডেকে বললেন, তার বাপকে আনতে লোক গিয়েছে। তিনি এলেই যেন তার সঙ্গে নরেন গ্রামে ফিরে যায়। নরেন খুব রাজি, কারণ রাত্রের ওই দু'ঘণ্টা ছাড়া নরেন স্ববশে সাধারণ মানুষের মতোই থাকত। সে বুঝল এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে তার পালানই মঙ্গল।

সেই দিনই নরেনের বাবা এলেন। নরেনের শরীরের অবস্থা দেখে এবং সব কথা শুনে ভয়ে-দুঃখে তিনি পাগলের মতো হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে জমিদারবাবুকে বললেন যে তিনি সেই দিনই নরুকে নিয়ে যাচ্ছেন। দেবেনবাবু বললেন, 'শুধু নিয়ে গেলে হবে না। একজন ভাল রোজাকে দিয়ে নরুকে দেখাও। ওকে পেতনীটা যেভাবে পেয়েছে তাতে ছাড়ান সহজ নয়।'

রামবাবু বললেন যে তিনি তাই করবেন। সেই দিনই তাঁরা ঊষা গ্রামে ফিরে গেলেন।

নরেনের মা সব কথা শুনে কেঁদে সারা। তিনি বললেন, 'পরীক্ষা মাথায় থাকুক, ছেলের প্রাণ বাঁচানো আগে দরকার।' নরেনও এত দূর চলে এসে আর বাবা-মাকে নিকটে পেয়ে মনে অনেকটা বল পেল। সে ভাবল পেতনীটাকে আর এত দূর আসতে হবে না! সে সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে তার ঘরে শুতে গেল।

কিন্তু ঘুম আর আসে না। ক্রমেই রাত হচ্ছে আর নরেন ভাবছে সে কি এখানেও আসবে নাকি! এইভাবে রাত বারোটা বাজল আর সঙ্গে সঙ্গে নরেন দেখল যে, মালতী ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। নরেন ভয় পেল, কিন্তু সেই অদম্য মোহ। সে উঠে মালতীকে সম্ভাষণ করল।

মালতী—'তুমি যে এখানে চলে এলে? তুমি কি ভাবছ?'

নরেন—'আমি ভাবছি তুমি কি করে এখানে এলে? আমার শরীর খারাপ হয়েছে বলে বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন।'

মালতী—'তুমি সত্যি বলছ? তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে না তো? সে কেউ পারবে না, তা যত চেষ্টাই না কর। তুমি কি এতদিনেও বুঝতে পারনি যে আমি কে? তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি কখনও তোমার অনিষ্ট করব না। কিন্তু তুমি যেখানে যাবে, আমিও যাব। তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে এইভাবে আমি আসব। তোমার মৃত্যুর পর আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকব।

মালতীর কথা শুনে নরেনের বুক কেঁপে উঠল। যদিও সে আগেই বুঝেছিল যে মালতী মানুষ নয়, কিন্তু এমন খোলাখুলিভাবে সে কথা এর আগে কোনদিন হয়নি। যখন মালতী বলল যে, 'কেউ তোমাকে আমার কাছে থেকে ছাড়াতে পারবে না।' তখন ভয়ে নরেনের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এল। সে যদিও অন্যদিনের মতো হাসিখুশির ভান করলে, কিন্তু ক্ষণে তার মুখ শুকিয়ে উঠতে লাগল।

দুটোর সময় মালতী চলে গেলেই নরেন পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তার বাবা-মার শোবার ঘরের দরোজায় ধাক্কা দিতে লাগল। তাঁরা তাড়াতাড়ি দরোজা খুলে বেরিয়ে এসে সব কথা শুনলেন ও হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। সে রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে গেলেন না।

পরদিন সকালেই রামবাবু প্রতিবেশীদের ডেকে এনে সব কথা বললেন। তাঁরা বললেন, যত শীঘ্র পারা যায় একজন ভাল রোজাকে ডাকানো হোক। আর যতদিন না রোজা আসে ততদিন নরু তার বাবা-মার মধ্যিখানে শোবে। একজন এ সংবাদ দিলেন যে, সাত ক্রোশ দূরে একজন সত্যিকারের ভাল রোজা থাকে। আর সে অনেক ভূত-প্রেত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান রাখে। সেইদিনই সেই রোজাকে নিয়ে আসে। রোজা যা চাইবে তাই তাকে দেওয়া হবে—এ কথা তাকে বলে দেওয়া হল।

সেদিন রাত্রে নরেন বাবা-মার সঙ্গে একঘরে শুলো। দু'পাশে বাবা-মা, আর নরেন শুয়েছে মধ্যে, একই বিছানায়। তিনজনই জেগে আছেন, আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় কেউই ঘুমাতে পারছেন না। এইভাবে রাত বারোটা বাজল।

নরেন চোখ বুজে শুয়েছিল। হঠাৎ নরেন অনুভব করল কে যেন তাকে ঠেলছে। নরেন চমকে চোখ মেলে দেখল মালতী মাথার কাছে বসে আছে। নরেন চুপি চুপি বললে, 'তুমি কি করছ, বাবা-মা জানতে পারবেন যে।'

মালতী স্বাভাবিক সুরে বলল, 'তোমার সে ভয় নেই, ওঁরা কিছু জানতে পারবেন না। নরেন উঠে দেখল তার বাবা-মা মড়ার মতো পড়ে আছেন। তারা তখন পাশের ঘরে গেল। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মালতীই রামবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অজ্ঞান করে রেখেছিল।

পরদিন সব কথা শুনে নরেনের বাবা-মা পাগলের মতো বুক চাপড়াতে লাগলেন। নরেনও বুঝল আর তার নিস্তার নেই। আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় তার শরীরের আর কিছু নেই। দেহ কঙ্কালসার, সব সময় বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। বহুকষ্টে হাঁটে, এমনকি বসে থাকতেও কষ্ট হয়, সব সময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। সে ভাবছে এ অবস্থার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। গ্রামের লোকেরাও দুঃখিত। সকলের শেষ আশা সেই রোজা। যদি সে কিছু করতে পারে।

সেদিন বিকেলে রোজার আগমন হল। সে ধীরভাবে আগাগোড়া সব কথা শুনল আর নরেনের শরীরের অবস্থাও দেখল। রোজা বলল যে সে একবার সমস্ত ব্যাপারটা নির্জনে ভেবে দেখবে যে এর কোন উপায় আছে কি না। সে স্পষ্টই বলল যে, মেয়েটা যেভাবে নরেনকে গ্রাস করে বসে আছে তাতে তাকে ছাড়ানো খুব শক্ত। এই বলে রোজা এক নির্জন গাছতলায় গিয়ে বসল। ঘণ্টা-দুই বাদে রোজা ফিরে এসে বলল যে সে একটা উপায় বার করেছে, সেটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক উপায়। সে

রামবাবুকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং প্রবীণ প্রতিবেশীদের ডেকে আনতে বলল। রোজা তাঁদের সামনে তার কথা বলবে এবং যদি সকলের মত হয়, তা হলে নরেনের ব্যাপারে ভার নেবে।

রোজার কথামতো তখনই আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশীদের ডাকা হল। তাঁরা সকলেই রামবাবুর হিতৈষী এবং নরুর মিষ্ট স্বভাবের জন্য তাকে ভালবাসেন। তাঁরা সকলেই রোজাকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন যে, যে উপায়েই হোক নরুকে যেন এই ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়।

রোজা তাঁদেরকে বলল, 'আপনারা নরেনবাবুর অবস্থা তো দেখছেন। এইভাবে চললে একমাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। কেবল একটি উপায় আছে যাতে এঁকে বাঁচানো যায়, কিন্তু সেই উপায়ের আর একটি দিক আছে—সেটাও আপনারা ভেবে দেখুন! আমার মতলব যদি সফল হয়, তা হলে চিরকালের জন্য নরেনবাবু প্রেতিনীর হাত থেকে উদ্ধার পাবেন। কিন্তু যদি অকৃতকার্য হই, তাহলে এখনি ওঁর প্রাণ যাবে। এখন আপনাদের ভেবে দেখতে হবে যে আপনারা একমাসের মধ্যে নরেনবাবুর নিশ্চিত মৃত্যু চান অথবা তাঁকে চিরতরে বিপন্মুক্ত করতে চান, যদিও এতে আজই ওঁর প্রাণ যেতে পারে। আপনারা বেশ করে ভেবে জবাব দিন।'

রামবাবুর স্ত্রী দরোজার আড়ালে বসে শুনছিলেন, তিনি কেঁদে উঠলেন ও অস্ফুটস্বরে বললেন, 'বাপ রে, যাতে আজই আমার ছেলের প্রাণ যেতে পারে তাতে আমি কখনই মত দেব না।'

রামবাবুও দ্বিধায় পড়ে গেছেন, কিন্তু তিনি পুরুষ, তিনি রোজার কথাটি ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে লাগলেন। একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী রোজাকে অনুরোধ করলেন, সে যাতে তার সমস্ত মতলবটা ভেঙে বলে।

রোজা বলল, 'আমি বলব না, আমি কাউকে কিছু জানতে দেব না, আমি শুধু নরেনবাবুকে যা যা করতে হবে বুঝিয়ে দেব, তবে এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ব্যাপারও কিছু আছে তা কিন্তু আপনাদের করে দিতে হবে।'

এরূপ জীবন-মরণের কথায় বাপ-মার মতি স্থির করা খুব শক্ত, তাঁরা একবার এদিক ভাবেন, একবার ওদিক ভাবেন। প্রতিবেশীরা তখন তাঁদের বোঝাতে লাগলেন। 'তোমরা কি চাও না যে নরেন সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে?

দিনকতকের মধ্যে ওর প্রাণ তো যাবেই, এরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় দিনকতক বেশি বেঁচে থেকে লাভ কি? আমাদের মত হচ্ছে রোজার কথামত চলা। যখন আর কোন উপায় নেই তখন এই উপায়ই নিতে হবে।' যদিও কথাটা তাঁরা বুঝলেন তবুও মা-বাপের মন, রামবাবু আর তার স্ত্রী দোনামনা করতে লাগলেন। যে কাজে আজই ছেলের মৃত্যু হতে পারে, কেমন করে তাঁরা তাতে মত দেন? কিন্তু নরেনই এ সমস্যার সমাধান করে দিল। নরেন বলল যে, তার বর্তমান অবস্থায় সে একদিনও বেঁচে থাকতে চায় না। সে রোজাকে পরিষ্কার বলল, 'আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন ভাল, নয়তো আজই আমার জীবন শেষ করে দিন, আমি এ নরক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।'

নরেনের বাবা-মা কাঁদতে লাগলেন আর আত্মীয়-স্বজনরা বোঝাতে লাগলেন। শেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, রোজার উপরে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হোক।

রোজা বলল, 'আজ সন্ধে হয়ে গেছে, আজ আর কিছু হবে না, আর একটা রাত্রি নরেনবাবু এইভাবেই থাকুন, কাল আমি এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করব। তবে এখানে হবে না। যেখানে নরেনবাবুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল সেখানে যেতে হবে।'

শেষকালে স্থির হল যে, রোজা ও নরেন রামবাবুর সঙ্গে পরদিন সকালে কল্যাণপুরে জমিদার বাড়িতে যাবে।

সে রাত্রে মালতী নরেনকে বলল, 'তোমায় আগেও বলেছি এখনও বলছি যে কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না, আমি কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করব না, তুমি আগে যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাও, আমার এখানে আসতে কিছু কষ্ট হয়।'

নরেন তাকে বলল, 'তাই হবে। কালই আমি কল্যাণপুরে ফিরে যাব।'

পরদিন কল্যাণপুরের জমিদারবাড়িতে রামবাবু, নরেন ও রোজা উপস্থিত হল। রোজা দেবেনবাবুকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিল এবং বলল, 'আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে।'

দেবেনবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে সব কথা শুনলেন আর বললেন, 'তুমি যা চাও করব। নরু আমার ছেলের বাড়া। তা ছাড়া

মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও এই পৈশাচিক ব্যাপারের যাতে অবসান হয় তাতে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য করতে বাধ্য।'

রোজা—'আপনাকে বেশি কিছু করতে হবে না, আপনি শুধু নরেনের ঘরটি খুব ভাল করে সাজিয়ে দিন। ঘরটি ঝেড়েমুছে তক্তপোশ সরিয়ে সেখানে খাট পেতে দিন। আর ঘরটি আর বিছানাটি নানা রকম ফুল ও মালায় সজ্জিত করুন, সব বন্দোবস্ত সন্ধের মধ্যে শেষ করতে হবে।'

জমিদার—'এতে আর কষ্ট কি, সন্ধের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।'

রাত দশটার সময় রোজা নরেনকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিল। সেখানে রোজা নরেনকে তার মতলবটা ভেঙে বলল আর খুব ভাল করে নরেনকে বুঝিয়ে দিল, তাকে কি করতে হবে আর কি বলতে হবে। শেষে রোজা বলল, 'আপনার জীবন এখন আপনার হাতে, ভূতনাথ মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি আপনার বুকে বল দিন।'

রাত্রি বারোটার কিছু আগে রোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক রাত বারোটায় মালতীর আগমন হল, নরেন খুব আগ্রহের সঙ্গে তাকে আহ্বান করল এবং সাজানো খাটে বসতে বলল।

মালতী—'আজ একি ব্যাপার? এমন খাট, এত ফুলের মালা, এ কার জন্যে?'

নরেন—'কেন, তোমার জন্যে আর তার পুরষ্কারও তো পেলাম।'

মালতী—'কেন, কখনও যা করনি তা আজ করেছ?'

'এর আগে তো কখনও তুমি দু'বার আসনি।'

মালতী—'দু'বার মানে কি? আমি আবার কখন এলাম?'

নরেন—'তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে? তুমি রাত সাড়ে দশটার সময় এলে আর বললে যে, তুমি ফুল নিয়ে সাজানো ঘর দেখে আজ আগেই এসেছ, আমার সঙ্গে ফুল নিয়ে মালা নিয়ে কত কাড়াকাড়ি করলে, এই দেখ বিছানাতে ছেঁড়া মালা ছেঁড়া ফুল পড়ে রয়েছে। এই তো মাত্র পনেরো মিনিট হলো তুমি গিয়েছ, এর মধ্যে সব ভুলে গেলে, না আমার সঙ্গে তামাশা করছ?'

নরেনের কথা শুনতে শুনতে মালতীর হাসি মিলিয়ে গেল, মুখ হলো অসম্ভব গম্ভীর আর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগল।

মালতী—'তুমি তো আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছ না? তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল তো আমি আজ রাত্রে আবার এসেছিলাম?'

নরেন তখনই তাই করল। মালতী আর কোন কথা না বলে এক মনে ভাবতে লাগল। মালতীর মুখের সৌন্দর্য গেছে মিলিয়ে, মুখ রাগে কালো হয়ে গেছে আর থমথম করছে। কিছুক্ষণ পরে মালতী নরেনকে বলল যে, এর আগে সে আসেনি, আর কেউ তার মতো সেজে এসেছিল। নরেন যেন কত দুঃখ আর ভয় পেয়েছে এইভাবে বলল, 'যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তুমি তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও, আমার তোমাকেই ভাল লাগে আর তোমারই বন্ধুত্ব কামনা করি। যদি আর কেউ এভাবে আসে তা হলে আমি আর বাঁচব না, যে করে হোক তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদ থেকে বাঁচাও।'

মালতী কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বলল, 'এর উপায় আছে, কিন্তু তা কি তুমি পারবে? আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে কি? আমি কে তা তো তুমি জানো, এই গভীর রাত্রে আমার সঙ্গে তুমি এক জায়গায় যেতে পারবে?'

নরেন বুঝল যে এতক্ষণে তার জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল এবং বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। সে কষ্টে হেসে বলল, 'তোমার সঙ্গে যাব তাতে ভয়টা কি? কিন্তু তুমি কি করতে চাও আমাকে বুঝিয়ে বল।'

মালতী—'এখান থেকে দু' মাইল দূরে উত্তর দিকে যে জঙ্গলটি আছে, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব। সেখানে এক জায়গার এক রকমের লতা আছে, সেই লতার শিকড় তোমাকে আনতে হবে।'

নরেন—'তা তুমি কেন নিজেই নিয়ে এস না, তুমি তো সব জায়গায় যেতে পার, বাইরে কী ভীষণ মেঘ করেছে দেখ, তুমি তো জান, আমার হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়।'

মালতী—'আমি যদি আনতে পারতাম তা হলে কি তোমাকে কষ্ট দি। আমি সে লতাগাছের কাছেও যেতে পারি না। তোমাকেই

সে শিকড় আনতে হবে। সেই শিকড় দিনরাত তোমায় হাতে বেঁধে রাখতে হবে। ঠিক রাত বারোটার সময় সেই শিকড় খুলে অন্য ঘরে তফাৎ করে রেখে আসবে, আর রাত দুটোর সময় আমি গেলে আবার পরে থাকবে, তা হলে কেউ আর তোমার কাছে আসতে পারবে না।'

নরেন আর কিছু বলল না এবং তারা দুজন ঘর থেকে উঠোনে নামল, ক্রমে উঠোনের বাইরে এসে গ্রামের উত্তর দিকে যেতে লাগল। আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, পল্লী-পথ জনহীন, নরেনের সঙ্গী কেবল মালতী। সে মানুষ নয়, নরেন দুর্বল বলে মালতী তার হাত ধরে আছে। মালতী তাকে বলল, 'এখন তুমি বেশি পরিশ্রম করো না, তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল, মনে রেখ, আসবার সময় আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না, তোমাকে নিজেই আসতে হবে।'

এইভাবে তারা দুজনে যাচ্ছে, গ্রাম্যপথ ছেড়ে তারা ধানক্ষেতের দিকে যেতে লাগল, গভীর অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোতে নরেন পথ দেখতে পাচ্ছে। অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মালতীর ওপর নির্ভর। ক্রমে তারা নদীর ধারে পৌঁছল, সামনেই শ্মশান, যার নাম কালাপেড়ের দেয়াল। কটি তেঁতুল গাছ দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন স্থান। নরেনের বুক সবলে স্পন্দিত হতে লাগল, কিন্তু রোজার কথা তখন তার কানে বাজছে, 'আপনার জীবন এখন আপনার হাতে, ভূতনাথকে স্মরণ করবেন, কোন ভয় নেই।'

এইবার জঙ্গল আরম্ভ হল, এখন আর পথ নেই, প্রেতিনী যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ সেদিকে যাচ্ছে। একটু পরে ডানদিকে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ দেখা গেল। মালতী নরেনকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ওই গাছটার ওপারে আগাছার জঙ্গল আছে। সেখানে গোটাকতক লতানো গাছ আছে, তারই একটা শিকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে এস, তোমাকে একলাই যেতে হবে।'

প্রেতিনীর নির্দেশমতো নরেন অগ্রসর হয়ে গেল এবং সেখানে কয়েকটি লতানো গাছ তুলে এনে নরেন পূর্বস্থানে ফিরে এল, কিন্তু মালতীকে সে-স্থানে দেখতে পেল না। সে ভয়কম্পিত স্বরে ডাকল, 'মালতী...!'

প্রায় পঞ্চাশ হাত দূর থেকে মালতী জবাব দিলে, 'আমি এখানে আছি। এখন তো মেঘ খানিকটা কেটে গেছে এবং অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে, আমার সাদা কাপড় তো তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি এগিয়ে যাচ্ছি, তুমি পেছন পেছন এসো।'

নরেন দ্রুতপদে মালতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আগে তুমি শিকড়টি দেখ তো ঠিক জিনিসটি এনেছি কিনা।'

মালতী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক জিনিসই এনেছ, তুমি আমার অত কাছে এসো না।'

মালতী এগিয়ে যাচ্ছে আর পঞ্চাশ হাত পিছু পিছু নরেন আসছে। আবার সেই নদীর ধার—সেই কালাপেড়ের দেয়াল। সেই ধানক্ষেত, আর সরু আলের রাস্তা। আবছা আলোতে নরেন মালতীকে দেখতে পাচ্ছে। ক্রমে গ্রাম্যপথে এসে পৌঁছল এবং অবশেষে বাড়ি।

মালতী চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি শিকড়টা অন্য ঘরে রেখে এসো, এখনও দুটো বাজতে আধ ঘণ্টা দেরি আছে।'

নরেনের রোজার কথা মনে হল। পরিত্রাণের উপায় পেলে তা এক মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করবে না, তাই নরেন মালতীকে বলল, 'আজ আমি বড় ক্লান্ত, আজ যাও, কাল তুমি এস।'

মালতী বলল, 'বেশ, তাই হোক। এখনই শিকড়টি হাতে বেঁধে ফেল, কাল রাত বারোটার সময় আবার খুলে রেখ।'

নরেন বাড়িতে পৌঁছেই জমিদারবাবুর বৈঠকখানা ঘরে গেল। সেখানে রোজা, দেবেনবাবু ও তার বাবা গভীর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন। নরেনকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আনন্দে কলরব করে উঠলেন। রোজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওষুধ পেয়েছেন? কি জিনিস পেলেন দেখি।'

নরেন শিকড়সুদ্ধ লতাটি রোজাকে দিলে আর মালতী তাকে যা যা বলে দিয়েছিল, তাও বলল।

রোজা বলল, 'আর ভয় নেই, জয় ভগবান!'

সেই রাত্রেই এক বালার ভিতরে সেই শিকড় রেখে নরেনের বাহুতে মোক্ষম করে বেঁধে দেওয়া হল। সে এমন বজ্র বাঁধন যে নরেন নিজে হাজার চেষ্টা করলেও অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সে বালা খুলতে পারবে না। এ বালা রোজাই সঙ্গে এনেছিল এবং এর গঠনও একটু বিশেষ রকমের।

নরেনকে বালা পরিয়ে রোজা বলল, 'এখন দিনকতক রাত্রে ও আসবে এবং অনুনয়-বিনয়, এমন কি ভয় প্রদর্শনও করবে।

কিন্তু এই বালাই আপনার 'ইষ্টবাচক'। সে যাই বলুক আর যাই করুক, আপনি প্রাণান্তেও এই বালা খুলবার চেষ্টা করবেন না।'

রোজা যা বলেছিল তাই হল। নরেন পরদিন রাত্রে দরোজা বন্ধ করে শুয়েছে আর মালতী ঘরের বাইরে থেকে শিকড়টি খুলে ফেলবার জন্য অনুনয়-বিনয় করছে। আজ আর সে বন্ধ দরোজার ভিতর দিয়ে ঘরে আসতে পারল না। নরেন মালতীর কথার কোন জবাব দিল না। প্রথম দু'তিন রাত্রি অনুনয়-বিনয় ও পরে ভয় প্রদর্শন, 'আমার কথা না শুনলে, আমি তোমার প্রাণ নেব, কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না।'

কিন্তু নরেন নিরুত্তর। এই উপদ্রব আট-দশ দিন চলেছিল, তার পরে মালতী আসেনি। নরেন তার বাবার সঙ্গে গ্রামে ফিরে গেল এবং মা-বাবার আদর-যত্নে অতি শীঘ্রই তার পূর্ব স্বাস্থ্য ও মনের বল ফিরে পেল। নরেনের আনন্দ, মা-বাবার আনন্দ, আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দ, প্রতিবেশীর আনন্দ, জমিদারবাবু ও তাঁর পরিবারবর্গের আনন্দ, আর সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে রোজার। শুধু সে যে একটি অমূল্য জীবন রক্ষা করেছে তাই নয়, সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। শুধু তাই নয়, জমিদারবাবু তার কোঁচড় টাকায় ভরে দিয়েছিলেন।

ভ্যাম্পায়ারের পিছে

মেয়েটিকে যেদিন প্রথম দেখলাম, সেদিনই বুঝেছি ওর মধ্যে কিছু একটা ভজঘট না থেকে পারে না। একটা কিছু গণ্ডগোল আছে নিশ্চয়ই।

আমাদের ক্লাসে পড়ে ও, নতুন ভর্তি হয়েছে। নাম মিনারা।

অদ্ভুত নাম। সেকেলে। এমন নাম আগে কখনও শুনিনি আমরা। আমাদের মতে প্রথম ভজঘট হচ্ছে ওর নামটা।

শুধু নাম নয়, মেয়েটার পোশাক, চাল-চলন, সব সেকেলে। রুচি বলে কিছু নেই। রোজ এক ট্রেনে করে স্কুলে আসে। একই রঙের ফিতে দিয়ে চুল বাঁধে। চুল আঁচড়ায় একই স্টাইলে। কোন স্টাইল নেই।

চলছে চলুক ধরনের ভাব।

মিনারা যেদিন প্রথম স্কুলে এল, আমি আর অভি তখন শাহেদা ম্যাডামের ক্লাসে। উনি আমাদের বাংলা ম্যাডাম।

ওকে বই-খাতা নিয়ে ইতস্তত পায়ে ক্লাসে ঢুকতে দেখে আমার দিকে তাকাল অভি। মুখ টিপে হেসে বলল, 'ওই যে, নতুন মক্কেল এল বোধ হয়। আহা, কি সুবোধ বালিকা।'

ওর বলার কায়দা দেখে না হেসে পারিনি আমি। সত্যি, একেবারে সুবোধ মেয়েটির মতো করছিল মিনারা। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ম্যাডামের টেবিলের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ও মাথা নিচু করে। ম্যাডাম প্রশ্ন করলে দুয়েক শব্দে উত্তর দেয়, অথবা মাথা ঝোলায়। এদিকে ক্লাসের সবাই চুপ করে ওকে দেখছে।

যেন সেটা বুঝতে পেরেই খানিক পরপর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল মিনারার। একসময় ম্যাডাম-ছাত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলো। ক্লাসের সবার উদ্দেশে ম্যাডাম ঘোষণা করলেন, 'এ হচ্ছে মিনারা। তোমাদের নতুন সহপাঠী। এর সাথে মিলেমিশে চলবে তোমরা। ঠিক আছে?'

ক্লাসের সবাই একযোগে হুংকার ছাড়ল, 'জ্বি আপা!'

'গুড! মিনারা, বসে পড়ো।'

বইপত্র দু'হাতে বুকের কাছে ধরে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল মেয়েটি। ফার্স্ট বেঞ্চের আরেক মেয়ে, রোশনি, সরে বসে ওকে জায়গা করে দিল।

আমি আর অভি তাকিয়ে থাকলাম মিনারার দিকে। চোস্ত পাজামা আর ফ্যাকাসে নীল রঙের কামিজ পরে এসেছে ও। একই রঙের ফিতে দিয়ে টানটান করে চুল বাঁধা। চুলের টানে কপালের চামড়াও টান হয়ে আছে। সাদা ওড়না। সব মিলিয়ে দেখতে অদ্ভুত লাগছিল। মনে হয়েছে ত্রিশ বছরের পুরানো বাংলা ছায়াছবির কোন শিশুশিল্পী পর্দা থেকে নেমে এসেছে বুঝি।

মেয়েটা বুঝতে পেরেছিল যে ওকে দেখে মুখ টিপে হাসছি আমরা। লজ্জায় তাই মাথা নিচু করে বসেই থাকল প্রথম দিন।

'ওর ঠোঁট ওরকম বিচ্ছিরি কালো কেন রে।' ফিসফিস করে বলল অভি। 'দেখ না ভাল করে।' দেখলাম। সত্যিই কালো। 'বোধ হয় কালো লিপস্টিক মেখেছে।'

'হ্যাহ্! কালো লিপস্টিক মেখেছে! যা মুখে আসে বলে বসলেই হলো। তোর যেমন 'ঘাড়ে বুদ্ধি।'

'হতে পারে না?' আমি বললাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে মিনারাকে পর্যবেক্ষণ করল অভি। তারপর মুদ্রাদোষের মতো নিজের প্রিয় ডায়লগটা ভেড়ে বসল।, 'কি সাংঘাতিক!'

'এর মধ্যে সাংঘাতিকের কি দেখলি তুই?'

জবাব না দিয়ে বলল, 'ওর গায়ের চামড়া কেমন ফ্যাকাসে দেখেছিস? মনে হয় সূর্যের আলোয় তেমন বের হয় না।'

পরদিন টিফিনের সময় সামনের মাঠে বসে গল্প করছি আমরা চার বন্ধু। আমি, অভি, ইমতিয়াজ আর ফুয়াদ। আমাদের বন্ধুত্ব কিন্তু অনেক দিনের—অনেক অনেক প্রাচীন। গল্পের ফাঁকে একটা আপেল লোফালুফি করছি চার বন্ধু।

কথায় কথায় মিনারার প্রসঙ্গ উঠল। ‘তোরা খেয়াল করেছিস মেয়েটাকে?’ অভি বলল ইমতিয়াজ আর ফুয়াদের উদ্দেশে।

‘করেছি,’ ইমতিয়াজ মাথা দোলাল।

‘কি সাংঘাতিক না?’

‘হ্যাঁ। চেহারা বেশ ফ্যাকাসে। তার ওপর ঠোঁটে কালো লিপস্টিক মেখে চেহারার যা অবস্থা করে রাখে, বাজে লাগে দেখতে।’

‘ওটা লিপস্টিক না বোধ হয়,’ ফুয়াদ বলল। ‘ওর ঠোঁটের রঙই মনে হয় কালো। অনেকের হয় ওরকম, দেখেছি আমি।’

‘ওরা থাকে কোথায়, জানিস?’ আমি বললাম আপেলটা অভির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে। ‘বাসা কোথায় ওদের?’

‘আমি জানি,’ ফুয়াদ বলল।

‘কোথায়?’ একযোগে প্রশ্ন করলাম আমরা তিনজন।

‘গোড়ানে। নন্দীপাড়ার শেষ মাথায়, ব্রিজটার ওপারে পুরানো এক বিল্ডিঙে।’

‘ওটা তো অনেক পুরানো বিল্ডিং।’ অভি বলল বিস্মিত কণ্ঠে। ‘ওখানে তো পুরানো বিল্ডিং একটাই আছে। পাশে বড় এক বাগান—’

‘হ্যাঁ, ওটাতেই থাকে ওরা।’

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল অন্য তিনজন। সবাই জানে ও বাড়িটা অনেক পুরানো, খালি পড়ে ছিল বহু বছর। বনের ধারে ওরকম এক বাড়িতে মেয়েটা থাকে, ভাবতে কেমন যেন লাগে। ‘ওর বাবা কী করেন?’ ইমতিয়াজ বলল।

‘জানি না। ওনাকে দেখিনি। মেয়েটার মাকেও না। কাল বিকেলে ওদের বাসার সামনে দিয়ে এসেছি আমি। দেখি ও একা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আর কেউ নেই। ’

‘হয়তো বাইরে গিয়েছিলেন ওনারা,’ যুক্তি দাঁড় করার চেষ্টা করলাম আমি।

'কি জানি!' শ্রাগ করল ফুয়াদ।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে অভিও কাঁধ ঝাঁকাল। 'কী সাংঘাতিক! ও রকম এক বাড়িতে মানুষ থাকে, ভাবাই যায় না। ভূতের বাড়ির মতো লাগে ওটাকে।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিনারা। একা। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। উঠে পড়লাম চট করে। ওকে ডেকে আনছি আমি।'

'কেন!' বিস্মিত হলো অভি।

'এমনিই। পরিচিত হতে।'

'যা নিয়ে আয়,' উৎসাহ জোগাল ইমতিয়াজ। 'দেখা যাক, ওর সম্পর্কে নতুন কিছু জানা যায় কিনা।'

আমাকে ওর দিকে এগোতে দেখে দ্বিধা ফুটল মেয়েটার চেহারায়। আমার মতলব বুঝে কেটে পড়ার চেষ্টা করছিল, সুযোগ দিলাম না। সোজা ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'কী করছ, মিনারা?'

'অ্যাঁ? না, কিছু না।'

'আমরা কয়েক বন্ধু বসে গল্প করছি। তুমিও এসো।'

'কেন?' একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকল ও। ভয় ধরে গেল ওর চোখ দেখে। মনে হলো মানুষের চোখ নয় ওগুলো, ভূতের চোখ।

'এমনিই,' আমতা আমতা করে বললাম। 'তুমি নতুন এলে, এখনও আমাদের সবার সাথে পরিচয় হয়নি, তাই ভাবলাম একসাথে লাঞ্চ খেতে খেতে—'

'কিন্তু আমি দুপুরে কিছু খাই না। তাছাড়া এখন সময়ও নেই আমার।'

দ্রুত আরেক দিকে চলে গেল মিনারা। আমি হতাশ হয়ে ফিরে এলাম।

মেয়েটা ভ্যাম্পায়ার, আমার মুখ থেকে ঘটনা শুনে অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছল ওরা তিনজন। 'নিশ্চয়ই তাই।'

ভ্যাম্পায়ারের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা আছে আমাদের। রীতিমতো অনুরাগী আমরা ওই জিনিসের। 'ভ্যাম্পায়ার না হয়েই যায় না এ মেয়েটা,' অভি বলে উঠল। 'দুপুরে খায় না, এ কোন কথা হলো? তাছাড়া ওর ফ্যাকাসে গায়ের রঙ, চাল-চলন, সেকেলে স্টাইল, সবই কেমন সন্দেহজনক।'

কয়েকদিন পরের কথা।

রাত ন'টা। মিনারাদের বাড়ির কাছে ঘাপটি মেরে বসে আছি আমরা চার বন্ধু। বাড়িটার সামনে বারো ফুট চওড়া খাওয়া-খাওয়া রাস্তা, তার এপাশে বড় কয়েকটা গাছ, ওগুলোর আড়ালে। পথের পাশে বৈদ্যুতিক আলোর খুঁটি আছে, কিন্তু বাতি নেই—অন্ধকার। কাজেই কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ও নেই আমাদের। নিশ্চিত মনে বসে আছি, ফিসফিস করে কথা বলছি। নজর বাড়িটার ওপর।

মেয়েটার ব্যাপারে জানতে হবে, পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু গত কয়েকদিন চেষ্টা করেও সে সুযোগ বের করতে পারিনি আমরা। তাই শেষ পর্যন্ত ওর ওপর গোয়েন্দাগিরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি সবাই মিলে।

রাত বাড়ছে। বাড়ির ভেতরে কারও সাড়া নেই। আলোও জ্বলছে না কোন রুমে। এক সময় চাঁদ উঠল। বাড়িটার ভৌতিক কাঠামো পরিষ্কার ফুটে উঠল চোখের সামনে। বড় বড় গাছ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে।

'ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে,' এক সময় হতাশ হয়ে বলল ইমতিয়াজ। 'নইলে এতক্ষণেও কারও সাড়া নেই কেন? একটা আলোও নেই অত বড় বাড়িতে।'

'ও জেগে আছে,' আমি বললাম অন্ধকার জানালার দিকে তাকিয়ে। 'অন্ধকারে বসে আছে।'

'কী সাংঘাতিক!'

ফুয়াদ নড়ে উঠল। 'আমিও আজ স্কুলে কথা বলতে গিয়েছিলাম ওর সাথে। পাত্তাই দিল না। পাশ ফিরে এমনভাবে চলে গেল, যেন দেখেইনি আমাকে। হিলওয়ালা জুতো পরেছিল ও, অথচ হাঁটার সময় একটুও শব্দ হতে শুনিনি।'

'এই বাড়িতে মানুষ থাকে কী করে?' অভি বলল। 'কেমন গ্রামের মতো জায়গা। চারদিকে ধানের ক্ষেত আর বন-জঙ্গল।'

'এমন জায়গাতেই তো নিরিবিলিতে থাকা যায়,' আমি বললাম। 'এ রকম জায়গা ভ্যাম্পায়ারদের পছন্দ।'

খিকখিক করে হেসে উঠল অন্যরা।

একটা জানালায় নড়াচড়া দেখে সোজা হয়ে বসলাম আমি। 'কে যেন নড়ছে ওটার কাছে। চল, দেখে আসি।'

পা টিপে রাস্তা পার হলাম আমরা। চারদিকে অদ্ভুত নীরবতা, বাতাসে গাছের ডাল নড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। নির্দিষ্ট জানালাটার কাছে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম আমরা।

'তোরা ঠেলে ওপরে তোল আমাকে,' ফিসফিস করে বললাম। 'ভেতরে কে আছে দেখি।' তাই করল অভি, ফুয়াদ আর ইমতিয়াজ। অভি সতর্ক করল, 'দেখিস, ও তোকে দেখে না ফেলে যেন।'

'আচ্ছা।'

ওরা ঠেলে তুলল আমাকে যতদূর সম্ভব, আমি পুরানো আমলের ইটের উইন্ডোসিল আঁকড়ে ধরে ধুলোজোড়া কাঁচের ভেতর দিয়ে ভেতরে তাকালাম।

রুমটা বেশ বড়। চাঁদের আলোয় ভেতরটা মোটামুটি দেখা যায়। এক সেট সাধারণ সোফা, একটা টেবিল আর দুটো কাঠের চেয়ার দেখলাম রুমের মধ্যে। পুরানো স্টাইলের, সেকেলে। এক মাথায় একটা ড্রেসিং টেবিল—ওটাও তাই।

হঠাৎ করে মিনারাকে রুমে ঢুকতে দেখে এত চমকে উঠলাম আমি যে, আরেকটু হলে উল্টে পড়েই যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ওই তো মিনারা! অন্ধকারে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

'আয়নায় ওর ছায়া পড়েছে কিনা দেখ,' ফুয়াদ বলল একই গলায়।

চোখ কুঁচকে ভাল করে তাকালাম। কিছুই বোঝা গেল না। আবার তাকালাম। জানি, আয়নায় ভ্যাম্পায়ারদের প্রতিবিম্ব পড়ে না, সেটাই বোঝার চেষ্টা করলাম। কাজ হলো না।

‘দেখতে পাচ্ছি না,’ অবশেষে হতাশ হয়ে বললাম আমি। ‘এত অন্ধকার, কিছু বোঝার উপায় নেই।’ হঠাৎ করে ঘুরে তাকাল মিনারা। মনে হলো সোজা আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে এল আমার। হাত-পা অসাড় হয়ে এল। কোনমতে চিঁ চিঁ করে বললাম, ‘জলদি নামা আমাকে। ও দেখে ফেলেছে।’

পেশীতে ঢিল দিল ওরা, মাটিতে পা রেখে হাঁপাতে লাগলাম আমি।

‘মেয়েটা দেখে ফেলেছে তোকে?’ প্রশ্ন করল ইমতিয়াজ।

‘জানি না।’

‘ঠিক আছে,’ অভি বলল, ‘আজ চল, আরেক দিন আবার আসব।’

কয়েক দিন পর আবার এলাম আমরা মিনারার সত্যিকারের পরিচয় উদঘাটন করতে। সেদিনও চাঁদ ছিল আকাশে। তবে আলো প্রথম দিনের মতো জোরালো নয়, একটু ফ্যাকাসে। মোটামুটি দেখা যায়। ওপর তলার এক জানালায় কমলা রঙের ডিম লাইটের আভা দেখলাম আমরা। পর্দা টানা আছে জানালার।

চার বন্ধু সাবধানে এগিয়ে গেলাম। ওপরে তাকাতে পর্দার গায়ে মিনারার ছায়া দেখতে পেলাম। পায়চারী করছে ও।

‘ওই তো মিনারা!’ উত্তেজিত, তবে চাপা গলায় বলে উঠল অভি। ‘একা। আজও ওর বাবা-মা কাউকে দেখছি না।’

‘বাপ-মা নেই বোধহয় ওর,’ ইমতিয়াজ মন্তব্য করল।

‘ওর বয়স কত হবে?’ আমি বললাম। ‘একশো বছর, নাকি দুশো?’

‘দেখে কিন্তু অতটা মনে হয় না,’ ফুয়াদ বলল।

খিকখিক করে হেসে উঠলাম সবাই। কিন্তু আচমকা আলোটা নিভে যাওয়ায় থেমে ওপরে তাকালাম। অন্ধকার।

'শুয়ে পড়েছে বোধহয়,' অভি বলল। 'কিসে ঘুমায় ও? কফিনে?'

'নিশ্চয়ই!' জোর দিয়ে বললাম আমি। ' ভ্যাম্পায়াররা কফিনেই ঘুমায়। ওটাই ওদের বিছানা।'

খানিক নীরবতা।

'আমি ওর কফিনটা দেখতে চাই,' বললাম আমি।

'কী করে দেখা যায়?'

'পাগল হয়েছিস নাকি?' অভি ধমকে উঠল। 'দোতলায় উঠবি কী করে?'

জবাব না দিয়ে কাছের বড় একটা গাছের দিকে তাকালাম আমি। জানালায় এতক্ষণ আলো দেখা গেছে, ওটা তার অল্প দূরে। কাণ্ড থেকে মোটা একটা ডাল এগিয়ে গেছে জানালাটার দিকে। ওটায় দাঁড়ানো সম্ভব হলে রুমের ভেতরটা দেখা যাবে হয়তো।

'দোতলায় না, ওই ডালে উঠে দেখব।'

আমার জবাব শুনে আঁতকে উঠল সবাই। ফুয়াদ বলল, 'পড়ে হাত-পা ভাঙবি শেষ পর্যন্ত।'

'ভাঙুক। তবু দেখতে হবে।'

কেউ আর আপত্তি করল না। মিনারা আসলে কী, সবাই জানতে চায়। একটা নিচু ডাল ধরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে গাছে উঠে পড়লাম আমি। খসখসে কাণ্ড বেয়ে আরও খানিকটা উঠে সেই ডালে পা রাখলাম। নিচে তাকিয়ে অভি, ফুয়াদ ও ইমতিয়াজকে হাঁ করে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। গাছ ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারেও ওদের চেহারায় উদ্বেগ পরিস্কার দেখতে পেলাম।

সামনে তাকিয়ে হতাশ হলাম আমি। নিচ থেকে যা মনে হয়েছিল, এখন দেখছি তা ঠিক নয় ডালে দাঁড়িয়েও ভেতরে দেখতে

পাচ্ছি না আমি। তার মানে আরও ওপরে উঠতে হবে।

তাই সই। সবলে গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে আরও খানিকটা উঠলাম। হ্যাঁ, এবার হয়েছে।

ঘুরে জানালার দিকে তাকালাম।

পরক্ষণে পিলে চমকে উঠল, আঁতকে উঠলাম সশব্দে।

পর্দা সরিয়ে সরাসরি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে মিনারা। চাঁদের আলোয় মুখটা চকচক করছে ওর। দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে। অন্ধকারেও ওর চেহারা নির্বিকার, একটা পেশীও কাঁপছে না মুখের।

এতই আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম যে চেষ্টা করেও চেঁচাতেও পারলাম না। স্বরই বের হলো না গলা দিয়ে।

হাত-পা অসাড় হয়ে এল, আলগা হয়ে গেল হাতের বাঁধন। সড়সড় করে পিছলে নামতে শুরু করলাম আমি। গাছের খসখসে, শুকনো বাকলে ঘষা লেগে বুকের ছাল-চামড়া যাওয়ার জোগাড় হলো।

অনেক কষ্টে নিজেকে থামালাম। চার হাত-পায়ে গাছ আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকলাম। 'ও দেখে ফেলেছে!' ফিসফিস করে সঙ্গীদের বললাম।

'মিনারা—'

'নেমে আয় তাড়াতাড়ি!'

অভির ধমক খেয়ে হুঁশ হলো। কোনমতে নেমে এলাম গাছ থেকে। কিন্তু আমি মাটিতে পা রাখার আগেই ওরা তিনজন ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুট লাগিয়েছে। পালাচ্ছে।

'অ্যাই, দাঁড়া!' কর্কশ ভাষায় চেঁচিয়ে বললাম। 'আমি আসছি।'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

দড়াম করে দরোজা খোলার শব্দে ঘুরে তাকিয়ে জমে গেলাম বরফের মতো। মিনারা দাঁড়িয়ে আছে নিচের বারান্দায়।

দু'হাত কোমরে। আমার সাথে চোখাচোখি হতে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'কেন আমার পেছনে লেগেছো তোমরা! ভেবেছ আমি কিছু টের পাইনি! নিজেদের খুব চালাক মনে করো?'

জবাব দেব কি, ভয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ওদিকে ওরা তিনজনও থেমে পড়েছে। ওদের দেখে ফেলেছে মেয়েটা, এই অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার অর্থ হবে ওর আগুনে ঘি ঢালা। হয়তো কাল স্কুলে গিয়ে নালিশ করে যা-তা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে, এই ভেবে পালাচ্ছে না। আপোস করার কথা ভাবছে বোধহয়।

হাবার মতো মিনারার মুঠো পাকানো দু'হাতের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। পা উঠছে না, জবান বন্ধ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের মাথা দোলানোর শব্দ শুনছি।

তারপর; কি করে যে ব্যাপারটা ঘটল, নিজেও জানি না, ফস করে বলে বসলাম, 'হ্যাঁ, আমরা তোমার নজর রাখছি।'

'কেন?' চোখ কুঁচকে উঠল মেয়েটার।

'তুমি-তুমি ভ্যা- ভ্যাম্পায়ার কিনা জানতে চাই আমরা।'

জবাব দিল না ও। দাঁড়িয়ে আছে বজ্রাহতের মতো। সাহস পেয়ে অভি, ইমতিয়াজ ও ফুয়াদ গুটিগুটি পায়ে ফিরে এল। সবার নজর সেঁটে আছে মিনারার মুখের ওপর।

কথা বলছে না ও। নড়ছে না। একদম স্থির। হাত দুটো কেবল ঘনঘন মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে। বাতাসে শনশন আওয়াজ তুলছে গাছের পাতা। জংলা ঝোপ হুটোপুটি করছে তার সাথে। নির্মল খেলায় মেতে উঠেছে।

চাঁদ মুহূর্তের জন্য মেঘে ঢাকা পড়ায় আঁধার হয়ে গেল মিনারার মুখটা, তারপরই আবার চকচক করে উঠল। ওকে হাসতে দেখে আহাম্মক হয়ে গেলাম আমি। ঝকঝকে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে মেয়েটা। 'কি, হাসছ যে!' বললাম আমি। বারান্দা থেকে নেমে এল মেয়েটা। আমার চার হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। 'কী করে বুঝলে আমি ভ্যাম্পায়ার?' বলল নিচু গলায়।

চমকে উঠলাম আমি। 'তার মানে—তার মানে—তুমি সত্যি—?'

‘হ্যাঁ।’

‘ওরে মা! বলে কি? চোখ চড়ক গাছ হয়ে গেল আমার, অভি, ফুয়াদ, ইমতিয়াজ ওদেরও। পায়ে পায়ে ফিরে এল ওরা।

‘সত্যি?’ আবার বললাম আমি। বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না।

মাথা দোলাল মিনারা। ‘বললাম তো।’

‘তাহলে তোমার রক্ত শুষে নেয়ার দাঁত দুটো দেখাও।’

‘না, তোমারটা আগে দেখাও।’

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলাম। তারপর হাসির ভঙ্গিতে প্রসারিত করলাম ঠোঁট, মাড়ির ভেতরের কোন শক্তির চাপে সরসর করে ইঞ্চিখানেক বেরিয়ে এল দুই শ্বদন্ত, ড্রাকুলার মতো।

ঠিক দেখলাম কিনা জানি না, তবে মনে হলো থমকে গেল মিনারা। চোখের পাতা কেঁপে উঠল ওর। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আমার তিন বন্ধুকে দেখল। ওরা একইভাবে নিজেদের শ্বদন্ত দেখাল। ‘এবার তোমার পালা,’ হেসে বললাম আমি। ‘দেখাও।’

কিন্তু আমাদের অবাক করে চেঁচিয়ে উঠল মিনারা। দ্রুত পিছাতে গিয়ে উল্টে পড়ার ব্যবস্থা করল। চেহারা ভয়ে আতঙ্কে নীল।

‘আমি-আমি আসলে ঠাট্টা করছিলাম তোমাদের সাথে,’ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ও। পিছিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। ‘তোমরা যা, আমি তা নই। বিশ্বাস করো। আমি—’

এত হতাশ হলাম যে কি আর বলব!

মেয়েটাকে নিয়ে বড় আশা ছিল, ভেবেছি এতদিনে দলে আরেকজনকে পেলাম, গেল সব মাটি হয়ে।

কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই আমি। বন্ধুদের ইঙ্গিত করে ওর দিকে এগোলাম, ওরাও চেপে এল। চারদিক থেকে ঘিরে ধরলাম আমরা মিনারাকে।

‘হ্যাঁ।’

‘ওরে মা! বলে কি? চোখ চড়ক গাছ হয়ে গেল আমার, অভি, ফুয়াদ, ইমতিয়াজ ওদেরও। পায়ে পায়ে ফিরে এল ওরা।

‘সত্যি?’ আবার বললাম আমি। বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না।

মাথা দোলাল মিনারা। ‘বললাম তো।’

‘তাহলে তোমার রক্ত শুষে নেয়ার দাঁত দুটো দেখাও।’

‘না, তোমারটা আগে দেখাও।’

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলাম। তারপর হাসির ভঙ্গিতে প্রসারিত করলাম ঠোঁট, মাড়ির ভেতরের কোন শক্তির চাপে সরসর করে ইঞ্চিখানেক বেরিয়ে এল দুই শ্বদন্ত, ড্রাকুলার মতো।

ঠিক দেখলাম কিনা জানি না, তবে মনে হলো থমকে গেল মিনারা। চোখের পাতা কেঁপে উঠল ওর। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আমার তিন বন্ধুকে দেখল। ওরা একইভাবে নিজেদের শ্বদন্ত দেখাল। ‘এবার তোমার পালা,’ হেসে বললাম আমি। ‘দেখাও।’

কিন্তু আমাদের অবাক করে চেঁচিয়ে উঠল মিনারা। দ্রুত পিছাতে গিয়ে উল্টে পড়ার ব্যবস্থা করল। চেহারা ভয়ে আতঙ্কে নীল।

‘আমি-আমি আসলে ঠাট্টা করছিলাম তোমাদের সাথে,’ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ও। পিছিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। ‘তোমরা যা, আমি তা নই। বিশ্বাস করো। আমি—’

এত হতাশ হলাম যে কি আর বলব!

মেয়েটাকে নিয়ে বড় আশা ছিল, ভেবেছি এতদিনে দলে আরেকজনকে পেলাম, গেল সব মাটি হয়ে।

কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই আমি। বন্ধুদের ইঙ্গিত করে ওর দিকে এগোলাম, ওরাও চেপে এল। চারদিক থেকে ঘিরে ধরলাম আমরা মিনারাকে।

একটু পর পিছিয়ে এলাম সবাই দু'পা করে। মাটিতে পড়ে থাকা অজ্ঞান মেয়েটার দিকে। তাকিয়ে থাকলাম জ্বলজ্বলে আশা নিয়ে।

জানি, একটু পর জ্ঞান ফিরবে ওর—মিনারা রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।

আমাদের দলের সদস্য সংখ্যা পাঁচে গিয়ে দাঁড়াবে।

কবরের অন্ধকারে

এক সকালে জন ও রুক নিজেকে আবিষ্কার করল শহরের ব্যস্ত এলাকার রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। বিভ্রান্ত চোখে দোকানপাট, গাড়ি-ঘোড়ার দিকে তাকাচ্ছে সে। বুঝতে পারছে না সে এখানে কেন এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে। যেন এইমাত্র স্বপ্নের জগতে ফিরে উঠেছে জন, ঢুকছে বাস্তব দুনিয়ায়।

রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল জন। তাকাল মাথার ওপরে সকালের উজ্জ্বল সূর্যের দিকে। রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার, মাথায় খচ করে বিঁধল তীক্ষ্ণ ব্যথার ছুরি। কপালে হাত থেকে আলোটা আড়াল করল ও, চোখ পড়ল হাতে লাল ফুটকি লেগে আছে। অদ্ভুত তো, ভাবল জন, ফুটকিগুলো যেন শুকিয়ে যাওয়া রক্তবিন্দু।

হঠাৎ খুব দুর্বল লাগল জনের, ফুটপাতে বসে পড়ল। ওর কী হয়েছে ভাবার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড পরে একটা গাড়ি হুশ করে পাশ কাটাল ওর। আরেকটু হলে ধাক্কা খাচ্ছিল। ঝট করে পেছন দিকে হেলে গেল জন, লাফ মেরে সিধে হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু শরীরে এমন ব্যথা, খাড়া হতে রীতিমতো কসরৎ করতে হলো। কাপড় থেকে ধুলো ছাড়ল জন, লক্ষ করল সে তার সেরা সুট এবং জুতো পরে আছে। কোর্টের আস্তিন গোটাল ঘড়ি দেখার জন্য। কিন্তু কব্জিতে ঘড়ি নেই। আশ্চর্য তো! জন ও রুক কখনোই ঘড়ি খোলে না, এমন কী ঘুমাবার সময়ও না। একটু পরপর সময় দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

নিজেকে ওর মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছে। শহরের মাঝখানে সে করছেটা কী? এখন ক'টা বাজে? উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল জন। সামনে, ফুটপাথে এক মহিলাকে দেখে চিনতে পারল ও। তার অফিসে কাজ করে মহিলা। মহিলার পেছনে হেঁটে গেল জন, টোকা দিল কাঁধে।

'মাফ করবেন, মিসেস এন্ডারসন, এখন ক'টা বাজে বলতে পারবেন? আমার ঘড়ি নেই সঙ্গে।'

ওর কণ্ঠ শুনে সাঁই করে ঘুরল মহিলা। জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। তারপর আর্তচিৎকার দিয়েই

ছুটল সে।

ফুটপাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকল জন। দেখছে পলায়নরত মহিলাকে। মহিলা ওকে দেখে এমন ভয় পেল কেন বুঝতে পারছে না। ওর চেহারায় কি ভীতিকর কোনও ব্যাপার আছে? মুখে হাত বুলাল জন। কপালটা আলুর মতো ফুলে আছে। আবার হাতে লাল ফুটকি দেখতে পেল ও।

ঘুরল জন। চলল ফুটপাত ঘেঁষা বড় কাঁচের জানালাঅলা দোকানের দিকে। জানালার কাঁচে ওর প্রতিবিম্ব ফুটল। সকালের আলোয় ভুতুড়ে লাগল। জনের কপালে একটা অদ্ভুত দাগ, মুখখানা কাগজের মতো সাদা, পরনের শার্ট কোঁচকানো।

জন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। বাসায় যাচ্ছে। ওখানে সে দুই বেডরুমের ছোট্ট একটি বাড়িতে থাকে সস্ত্রীক। ওদের সন্তান নেই। কারণ জন কখনোই বাবা হতে চায়নি। সন্তান মানেই ঝামেলা, কাজে বাধার সৃষ্টি। এজন্য জন বাচ্চাকাচ্চা নিতে দেয়নি তার স্ত্রীকে। কাজে দেরী হওয়া সে মোটেই সহ্য করতে পারে না।

এখন, কী কারণে জানে না জন, মনে হচ্ছে খুব জরুরী একটা কাজে দেরী হয়ে যাচ্ছে তার। ওর স্ত্রী বলতে পারবে কাজটা কী। সে জনের জন্য সুস্বাদু গরম নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একটুও খিদে লাগছে না জনের।

এমন সময় একটা বাস ওর পাশ কাটাচ্ছে, জানালার দিকে তাকাল জন। দেখল ওর দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ওদের পড়শীর ছোট মেয়ে লুসি পার্কার। জন মেয়েটিকে লক্ষ্য করে হাত তুলল। মুখ হাঁ হয়ে গেল লুসির, তবে সে হাসছে নাকি চিৎকার করছে ঠিক বুঝতে পারল না জন। তবে বাসের জানালায় সব ক'টা বাচ্চা যে ওর দিকে ভয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে তা বেশ বুঝতে পারল জন। সে ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল। চলে গেল বাস।

জনের পা আর চলতে চাইছে না। যদি কোনও সহৃদয় ড্রাইভার পেত তাকে অনুরোধ করত বাড়ি পৌঁছে দিতে। রাস্তার মোড়ে একটা স্পটলাইটে হেলান দিল জন, তাকাল রাস্তায়। দূর থেকে একটি গাড়ি আসছে। উজ্জ্বল, হলুদ রঙের। গাড়িটি দেখেই চিনতে পারল জন। ওর সেক্রেটারির গাড়ি। মেরুদণ্ড টানটান করল জন, হাত নাড়তে লাগল। স্পটলাইটের বাতি জ্বলে উঠল লাল হয়ে। থেমে গেল গাড়ি। কিন্তু জনের সেক্রেটারি মিস স্পেনসার তার বসকে লক্ষ্য করেনি। গাড়ি থামার ফাঁকে সে রূপচর্চায়

ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে।

জন হেঁটে গাড়ির পাশে চলে এল, প্যাসেঞ্জার সাইডের দরোজা খোলার চেষ্টা করল। বন্ধ। জানালায় আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিল সে। উঁকি দিল মিস স্পেনসারের দিকে। ফিরে চাইল সেক্রেটারি। নির্জলা আতঙ্ক ফুটল তার চেহারায়। স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল সে, চাপ দিল গ্যাস পেডালে। ট্রাফিকের বাতি তখনও সবুজ হয়নি, কিন্তু গাড়ি নিয়ে ঝড়ের বেগে সামনে বাড়ল মিস স্পেনসার। ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল জন।

অফিসে ফিরেই মিস স্পেনসারের চাকরি নট করে দেবে, কসম খেল জন। উঠে পড়ল রাস্তা থেকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এল ফুটপাথে। তীব্র যন্ত্রণায় ফেটে যেতে চাইছে মাথা। হাত কাঁপছে। চামড়াটা বিবর্ণ, ফ্যাকাসে এবং শুকনো।

টলতে টলতে একটা দোকানের সামনে চলে এল জন ও রুক। তাকাল আয়নায়। তার গর্তে ঢোকা চোখের চারপাশে গভীর কালি, ঠোঁট জোড়া রক্তশূন্য, হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু নড়ল না ঠোঁট। কপালের ভীষণ ক্ষতটার মতোই নীলচে ওর গায়ের চামড়া।

একটা ভয় গ্রাস করল জনকে, আতঙ্ক ঘিরে ধরল। কাজে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। যার সঙ্গেই অ্যাপয়েনমেন্টটা করা হোক না কেন, মিস করা যাবে না কিছুতেই।

আয়নায় একটা ফোনবুথের প্রতিবিম্ব ফুটে আছে। ওই তো জবাব পাওয়া গেছে। জন তার স্ত্রীকে ফোন করবে। বলবে এখানে এসে তাকে নিয়ে যেতে। স্ত্রী ক্যালেন্ডার চেক করে দেখলেই বুঝতে পারবে কার সঙ্গে কাজের সিডিউল আছে তার স্বামীর। আড়ষ্ট পা নিয়ে ঘুরল জন, চলল ফোনবুথের দিকে। দরোজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেছনে বন্ধ করে দিল দরোজা। এক মুহূর্তের জন্য ক্লস্ট্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হলো সে। মনে হলো বন্ধ ফোনবুথ তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। বুথটি এত সরু, কফিনের মতো।

কয়েনের জন্য পকেট হাতড়াল জন। খালি। মেঝেতে চকচক করে উঠল কী যেন। ঝুঁকল জন। একটা মুদ্রা। ফোন করতে আসা কারও পকেট থেকে পড়ে গেছে নিশ্চয়। সে কয়েনটা স্লটে ঢোকাল। বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করল।

প্রথম রিংটা মনে হলো অনেক দূর থেকে হচ্ছে। জনের নিঃশ্বাস নিতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। ছোট ফোনবুথের বাতাসই যেন ঢুকছে না। দ্বিতীয় রিং হলো। জনের স্ত্রীর দ্বিতীয় রিং হবার পরে সাধারণত ফোন ধরে। কিন্তু সে ফোন ধরছে না।

ফোন বুথে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না জন। সে দরোজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল। এমন সময় ফোন লাইনের ওপর পাশে ক্লিক করে শব্দ হলো। কেউ তুলেছে রিসিভার। অচেনা নারী কণ্ঠ সাড়া দিল। 'হ্যালো?'

'অ...ইয়ে মিসেস রুক আছেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল জন। মহিলা চুপ করে থাকল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর জবাব দিল, 'জি না। মিসেস রুক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে গেছেন। আপনি জানেন না? তাঁর স্বামীর দুইদিন আগে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।'

মহিলা বকবক করে আরও কীসব বলছে, কানে গেল না জনের। তার হাড্ডিসার হাতের ফাঁক গলে পড়ে গেল রিসিভার, ঝুলতে লাগল। ধাক্কা মেরে দরোজা খুলে ফেলল জন। বেরিয়ে এল।

ওকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। সময়মতো ফিরতে হবে নিজের কবরে।

জাল

এক

জামশেদ সাহেব রাঙামাটির সরকারী বাংলোতে উঠেছেন আজ বেশ কদিন হলো। সঙ্গে রয়েছে তাঁর স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান অপু। তিনি একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। ঢাকা থেকে ছুটি কাটাতে এখানে এসেছেন। তাঁর একমাত্র শখ মাছ ধরা এবং অবশ্যই রাতে। ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে অনেক মাছ ধরেছেন। আজও এই শখ ছাড়তে পারেননি। তাই যখনই ছুটি পান, লেক তীরবর্তী কোনও জায়গায় ছুটি কাটাতে চলে যান। সঙ্গে অবশ্য ছিপ নিতে ভোলেন না। বাংলোর বারান্দায় বসে সঙ্গে আনা নতুন ছিপটা পরীক্ষা করতে করতে স্ত্রীর সাথে কথা বলছিলেন।

'শোন, অপুর মা,' জামশেদ সাহেব বললেন। 'ছেলেটা আজ রাতে আমার সাথে মাছ ধরতে যেতে চাইছে। তুমি আপত্তি করো না, প্লিজ। তা ছাড়া ও এখন বড় হয়েছে।'

পাশে বসা অপুও মাকে অনুরোধ করে বলল, 'মা, প্লিজ, না করো না।'

মিসেস জামশেদ ছেলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, যাও। তবে সাবধানে থেকো। বাবার কাছ থেকে নড়বে না।' এরপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাছ ধরার নেশায় ছেলের কথা ভুলে যেও না। সবসময় ওকে চোখে চোখে রাখবে। ওর কিছু হলে তোমাকে আমি...'

'থাক, থাক, আর বলতে হবে না,' জামশেদ সাহেব কৃত্রিম ভয় পাওয়ার কণ্ঠে বললেন। 'তুমি একদম চিন্তা করো না।' তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলল। এখন মাছ ধরার সমস্ত জোগাড়যন্ত্র করো।'

মাছ ধরতে যাবে তাও রাতে, এই উত্তেজনায় অপুর সারা শরীর শিউরে উঠল। এর আগে কখনও সারা রাত বাইরে কাটায়নি ও।

সন্ধে নাগাদ জামশেদ সাহেব আর অপু মাছ ধরার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

যেখানে মাছ ধরতে যাবে, সেই জায়গাটা এই বাংলো থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ, পায়ে হেঁটে যেতে হয়। যেতে যেতে অপু বলল, 'জানো, বাবা, রেডিওতে শুনেছি, আজ রাতে নাকি খুব ঝড়বৃষ্টি হবে। তবে কি মাছ ধরতে পারব না?'

'তুমি কিছুই জানো না,' জামশেদ সাহেব হেসে বললেন। 'বড় বড় মাছ কেবল বৃষ্টির রাতেই ধরা যায়। তা ছাড়া বৃষ্টির কবল থেকে মাথা-শরীর বাঁচাবার জন্য দু'জনের জন্যই রেইনকোট এনেছি।'

দুই

পৃথিবীর বুকে রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে ঘন কালো মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। চাঁদের ঘোলাটে আলোয় পাহাড়ি পথের দু'পাশের লম্বা গাছগুলোর গোড়ায় আরও অন্ধকার জমেছে। রাতের পাহাড়ি শীতল বাতাসে গাছপালার ডালগুলো কাঁপছে। ম্লান আলোয় মনে হচ্ছে সেগুলো যেন কোনও বিরাট দৈত্যের হাত।

অপুর মনে হচ্ছে, ও যেন পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনও গ্রহে এসে পড়েছে। ওর গা অজানা আশঙ্কায় শিরশির করে উঠল। অল্প ভয়ও পাচ্ছে। তাই বাবার পাশ ঘেঁষে চলতে লাগল।

একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, পরে মুষলধারে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তীরের ফলার মতো ওদের শরীরে এসে লাগল। প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে লাগল। বাতাসের ধাক্কায় বড় বড় গাছগুলো দুলতে লাগল।

চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জামশেদ সাহেব অপুকে বললেন, 'দাঁড়াও, রেইন

কোট পরে নাও।'

দুজনে রেইন কোট পরে আবার হাঁটতে শুরু করল। প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটার পর অপু পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পেল, বুঝতে পারল লেকের কাছাকাছি চলে এসেছে।

লেকের পাড়ে এসে জামশেদ সাহেব কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামালেন। এতক্ষণে বৃষ্টিটা একটু কমে এসেছে। ব্যাগের ভেতর থেকে কৌটা বের করে টোপগুলো দেখতে দেখতে বললেন, 'এখানে বসব। জায়গাটা উঁচু আছে। আমি কী করছি তা মনোযোগ দিয়ে দেখো। তারপর মাছ ধরতে বসে পড়ো।' ছেলেকে উৎসাহ দেবার জন্য আরও বললেন, 'আজ আমরা পাল্লা দিয়ে মাছ ধরব। দেখি কে বেশি মাছ ধরতে পারে।' এ কথা শুনে অপু লাফিয়ে উঠল।

জামশেদ সাহেব সুতার মাথায় বড়শি বাঁধলেন। তারপর ওতে টোপ লাগিয়ে পানিতে ফেললেন। অপু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। মিনিট পনেরো দেখার পরই ওর মনে হলো মাছ ধরা তো খুবই সহজ। এবার ও নিজেই একটা জায়গায় বসে মাছ ধরতে পারবে। বাবার কাছে থাকলেই দু'জনে কোনও না কোনও কথা বলছে, আর সেজন্য মাছ আসছে না। রেইন কোটের হুড উঠিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বাবা বসে আছেন। এখনও ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে, তবে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে। অপু ভাবল, বাবার সাথে প্রতিযোগিতা করার সময় হয়েছে। তাই কোনও কথা না বলে একটা ছিপ আর টোপের কৌটা নিয়ে লেকের পাড় ধরে এগিয়ে গেল।

প্রায় আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে লেকের কিনারায় একটা জায়গা খুব পছন্দ হলো ওর। ছিপটাকে মাটির ওপর রেখে বড়শিতে টোপ লাগিয়ে সেটা পানিতে ফেলল। এরপর অপেক্ষা করতে লাগল।

তিন

আবার জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। আকাশের কোথাও যেন ফুটো হয়ে গেছে। তীব্র বৃষ্টির সাথে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। অপুর ভয় করতে লাগল। সঙ্গী বলতে কেউ নেই। ওর বাবা তো অনেক দূরে।

অবিরাম বৃষ্টির ফলে পাড় থেকে প্রচুর পানির ধারা লেকে পড়ছে। সেগুলোকে ছোট ছোট নদীর মতো লাগছে। হঠাৎ অপু দেখল, ওর ছিপটা পাড় থেকে নামা পানির সাথে ভেসে লেকের দিকে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে নিজের কথা না ভেবে সামনের দিকে ঝাঁপ দিল অপু। ছিপটা ধরার জন্য পানির স্রোতের মধ্যে হাত বাড়াল। কিন্তু ছিপটা ততক্ষণে স্রোতের টানে আরও অনেকটা সরে গেছে। অপু ভাবল, বাবার এত শখের ছিপ স্রোতে ভেসে যাচ্ছে! ছিপটাকে ধরার জন্য আরও এগিয়ে। কিন্তু ও লেকে পড়ে গেল। লেকের পানির তীব্র স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। গায়ের রেইন কোটটা ওর কাছে বিরাট বোঝা মনে হলো। এই বোঝার টানে পানির নিচে তলিয়ে যেতে লাগল। মাথাটা পানির ওপরে তুলে হাত-পা ছুঁড়ে কোনওরকমে ভেসে থাকতে চাইল। কিন্তু স্রোতের টানে ক্রমশ মাঝ ভেসে যেতে লাগল অপু।

আর তখনই মাঝ লেকে আলোর এক বিন্দুর দেখতে পেল ও। আরেকটু কাছে আসতেই বিদ্যুৎ চমকের আলোয় একটা নৌকা দেখতে পেল। নৌকার পাটাতনে একটা হারিকেন জ্বালানো রয়েছে। একজন শক্ত হাতে দুটো বড় বৈঠা দিয়ে সেটা বাইছে। নৌকাটা এখন অপুর দিকে এগিয়ে আসছে।

নিজেকে পানির ভেতরে তলিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হাত-পা ছোঁড়ার জন্য অপুর শক্তি ক্রমেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কোনরকমে সাঁতরে নৌকার দিকে এগুতে লাগল। নৌকার কাছাকাছি আসলে অপু দেখল, একজন লোক ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে রেখেছে ওকে ধরার জন্য।

তখুনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কালো বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সেই আলোয় অপু লোকটার চেহারা দেখতে পেল।

কিন্তু একি! এটা তো একটা কঙ্কালের মুখ! কঙ্কালটা হাসছে। কী ভয়ঙ্কর সেই হাসি! কঙ্কালটা তার কাছে আসার জন্য অপুকে

ইশারা করেছে। কঙ্কালটার পরনে একটা কালো আলখাল্লা। এক হাতে বৈঠা নিয়ে আরেক হাত বাড়িয়ে দিল। বিদ্যুতের আলোয় অপু দেখল সেই হাতে চামড়া, মাংস কিছুই নেই। কেবলই হাড়।

এ দৃশ্য দেখে অপু নৌকার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইল। কিন্তু অপুকে দূরে সরতে দেখে কঙ্কালটা বৈঠা নামিয়ে রেখে নৌকার পাটাতন থেকে একটা জাল তুলে নিল। তারপর রক্ত হিম করা হাসি হেসে অপুকে লক্ষ্য করে লেকে জাল ছুঁড়ল। জাল দিয়ে অপুকে নৌকায় তুলতে চায়!

প্রচণ্ড আতঙ্কে অপু চিৎকার করে উঠল। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই।

চার

আস্তে আস্তে অপুর জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলে দেখল হাসপাতালের নরম বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানার পাশে ওর মা-বাবা এবং পুলিশের এক অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার চেহারায় চিন্তার ছাপ।

'কী...কী হয়েছে? আমি এখানে কেন?' অপু প্রশ্ন করল।

'শান্ত হও, বাবা,' জামশেদ সাহেব ছেলেকে বললেন। 'তুমি লেকে ডুবে যেতে যদি না আমি সময়মতো যেখানে তুমি মাছ ধরতে বসেছিলে সেখানে যেতাম। দেখলাম আমার অন্য ছিপটা পাচ্ছি না। আর তুমিও পাশে নেই। তখন তোমার খোঁজে এগোলাম। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম তুমি ভেসে যাচ্ছ মাঝ লেকের দিকে। আমি লেকে ঝাঁপিয়ে তোমায় টেনে তুললাম। তোমার তখন জ্ঞান নেই।

'তোমার অজ্ঞান দেহটা নিয়ে কোথায় যাব বুঝতে পারছিলাম না। ঠিক সেই সময় এই পুলিশ অফিসারের সাথে দেখা হয়ে

যায়। উনিই তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন।'

'আমাকে ক্ষমা করো, বাবা,' অপু বলল। 'তোমার শখের ছিপটা হারিয়ে ফেলেছি।'

'আরে, বোকা, ওটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ওরকম ছিপ যোগাড় করা যাবে। কিন্তু তুমি লেকের পানিতে পড়লে কীভাবে?'

'তোমার ছিপটা ভেসে যাচ্ছিল, ওটা ধরতে গিয়েই তো আমি পানিতে পড়ে গেলাম।'

'পানিতে পড়ে যাবার পর পাড়ের দিকে আসার চেষ্টা না করে মাঝ লেকে চলে যাচ্ছিলে কেন?' জামশেদ সাহেব ছেলেকে প্রশ্ন করলেন।

অপু এবার সেই ভুতুড়ে নৌকা আর তার মাঝির কথা বলল।

অপুর কথা শেষ হলে পুলিশ অফিসার চিন্তিতভাবে গাল চুলকে বললেন, 'অপু, কঙ্কালটা তোমাকে বাঁচাতে আসেনি। ওটা তোমাকে পানিতে চুবিয়ে মারতে এসেছিল।'

জামশেদ সাহেব পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করলেন, 'কী বলতে চাইছেন?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'আমি আপনাকে যে কাহিনী বলব তা আপনার বিশ্বাস হবে না।'

জামশেদ সাহেব বললেন, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা পরে। আগে আপনার গল্পটা বলুন।'

পাঁচ

পুলিশ অফিসার বলতে লাগলেন, 'অনেক কাল আগের কথা। এদিকের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন এক পাহাড়ি আদিবাসীদের রাজা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লোভী এবং নিষ্ঠুর। উনি প্রজাদের বনভূমিতে শিকার করতে দিতেন না, মাছ ধরতে

দিতেন না। প্রজারা শিকার করতে অথবা মাছ ধরতে গেলে রাজাকে কর দিতে হত। কিন্তু প্রজারা কর দিতে পারত না। এজন্য তারা খিদেয় কষ্ট পেত। তাই অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বনে শিকার করত অথবা মাছ ধরতে যেত। যারা ধরা পড়ত রাজার আদেশে তাদের মৃত্যুদণ্ড হত। প্রজারা দলে দলে রাজ্য ছাড়তে লাগল।

'রাজার নিজের একটা ছোট নৌকা ছিল। সেটায় চেপে তিনি নিজে লেকে ঘুরে বেড়াতেন। লেক পাহারা দিতেন। কেউ লুকিয়ে মাছ ধরতে এসে ধরা পড়লে আর রক্ষা ছিল না। সাথে সাথে তাকে মেরে ফেলা হত।'

এতক্ষণ অপু মনোযোগ দিয়ে পুলিশ অফিসারের কথা শুনছিল। ও জিজ্ঞাসা করল, 'যে লোক লুকিয়ে মাছ ধরতে আসত সে তো থাকত লেকের পাড়ে। আর রাজা থাকতেন নৌকায়। তা হলে পাড়ে থাকা লোকটাকে ধরতেন কীভাবে?'

'খুব সহজেই,' পুলিশ অফিসার বললেন। 'রাজার একটা জাল ছিল। তুমি তো দেখেছ, তাই না?' অপু মাথা নাড়ল। 'রাজা ছিলেন জাল ছুঁড়তে খুবই ওস্তাদ। মাছ শিকারির অলক্ষে তার কাছাকাছি পৌঁছে যেতেন। তারপর বিদুত্যের মতো ক্ষিপ্রগতিতে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে জাল ছুঁড়তেন। মাছ শিকারি জালে আটকা পড়ে যেত। পরে হতভাগ্য লোকটাকে টেনে পানিতে চুবিয়ে মারতেন। এভাবে তিনি অনেক লোককে হত্যা করেছিলেন। এ রকম নিষ্ঠুরতা করে তিনি আনন্দ পেতেন।'

'কী ভয়ঙ্কর,' অপু বলল।

'হ্যাঁ,' পুলিশ অফিসার বললেন। 'কিন্তু প্রজারাও একদিন প্রতিশোধ নিল।'

'কীভাবে?' জামশেদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'প্রচণ্ড এক ঝড়ের রাতে তারা রাজার নৌকার তলায় একটা ফুটো করে দিল। রাজা জানতে পারেননি। তিনি সেই ফুটো নৌকা নিয়েই মাঝ লেকে চলে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সেই জাল আর একটা হারিকেন। পরনে ছিল কালো আলখাল্লা। তারপর যা ঘটার তাই ঘটল। ফুটো দিয়ে পানি ঢুকে নৌকা ডুবে গেল। আর সেই সাথে অত্যাচারী রাজার সলিল সমাধি হলো।'

পুলিশ অফিসার একটু থেমে জামশেদ সাহেবকে বললেন, 'এতদিন স্থানীয় জেলেদের কাছে শুনেছি, প্রায় প্রতিদিন রাতেই

নাকি তারা রাজার নৌকা দেখতে পায়। ওদের কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ আপনার ছেলের কথায় বিশ্বাস হলো।'

জামশেদ সাহেব আর অপু অবাক দৃষ্টিতে পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারক রায়

সেই রাত সেই সময়

নিউইর্য়ক থেকে যে প্রধান পথটা (এক নম্বর সড়ক) বেরিয়ে এসেছে, বাল্টিমোরের বারো মাইল দূরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের সঙ্গে তার ক্রসিং হয়েছে। এ ক্রসিংটা খুবই বিপজ্জনক। এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য পথচারীদের জন্য মাটির তলা দিয়ে একটা 'সাবওয়ে' তৈরি করার কথা অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটা পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। সরকারী লাল ফিতের বাঁধন কেটে এখনও পরিকল্পনাটার বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

শনিবারের রাত। ডাক্তার একারমল এক গ্রাম্য ক্লাব থেকে গাড়ি করে ফিরছিলেন। ক্লাবে একটা নাচের আসর ছিল। ডাক্তার নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ক্রসিংটার কাছে এসে গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন ডাক্তার।

একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হলেন ডাক্তার; এত রাতে নির্জন পথে একলা একটি মেয়ে! তার পরনে ইভনিং গাউন। মেয়েটি গাড়ি থামাবার ইশারা করছে। ও নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে! বোধহয় কোন পার্টিতে গিয়ে সময়ের হিসাব রাখতে পারেনি। এখন যানবাহন বন্ধ যাওয়ায় বাড়ি ফিরতে পারছে না।

গাড়ি থামালেন ডাক্তার। বললেন :

—'আপনি পিছনের সিটে বসুন। সামনে—আমার পাশে—গলফ খেলবার সাজসরঞ্জাম রয়েছে, এখানে আর বসার জায়গা নেই।'

মেয়েটি গাড়িতে উঠল। ডাক্তার গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

—'এত রাতে আপনি এখানে কি করছিলেন? আপনার মতো এক তরুণীর পক্ষে এত রাতে একলা পথে থাকা কি খুব নিরাপদ?'

—'সে এক বিরাট কাহিনী,' মেয়েটির কণ্ঠস্বর মিষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ, অনেকটা স্লেজ গাড়ির ঘণ্টাধ্বনির মতো।

—'দয়া করে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিন। সেখানে গিয়ে আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলব।' মেয়েটির গলার স্বরে আকুলতা।

—'আপনার ঠিকানা?'

—'ঠিকানা? ঠিকানা হলো... নং নর্থ চার্লস স্ট্রিট। মনে হয় আপনার নিজের পথ থেকে খুব দূরে যেতে হবে না।'

—'ঠিক আছে। জায়গাটা আমার একেবারে অচেনা নয়।' ডাক্তার বললেন।

মেয়েটির শঙ্কাতুর মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার একারমল। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। মেয়েটির বাড়ির ডাক্তারের নিজের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ওকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ঘাড়ে চাপায় বাড়ি পৌঁছতে ডাক্তারের আরো মিনিট দশেক বেশি সময় লাগবে। যাক, কি আর করা যাবে। বিপন্ন মেয়েটিকে সাহায্য করা তো একটা নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

নর্থ চার্লস স্ট্রিটে ঢুকে গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন ডাক্তার। এবার দুপাশের বাড়ির নম্বরগুলি দেখতে দেখতে যেতে হবে। বেশি দূর যেতে হলো না। একটু এগোতেই মেয়েটি যে নম্বরের কথা বলেছিল, সেই নম্বরের বাড়িখানা পেয়ে গেলেন ডাক্তার। গাড়ি থামালেন।

—'এই যে, আমরা এসে গিয়েছি,' ডাক্তার পিছনের দিকে মুখ ফেরালেন।

কি আশ্চর্য! পিছনের আসন একদম ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে।

—'একি অদ্ভুত ব্যাপার?' আপনমনেই বললেন ডাক্তার, 'মেয়েটা নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে পড়ে যায়নি।....কর্পূরের মতো উবেও যেতে পারে না।

তবে কি রাস্তায় ঢুকে গাড়ির গতি যখন কমিয়ে দিলাম তখনই ও নেমে গেল? কিন্তু তাই বা নামবে কেন? গাড়ি নিয়ে তো ওর

বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম।'

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটির দিকে এগোলেন ডাক্তার। সদর দরোজা বন্ধ। ভিতরে কোন আলোও দেখা যাচ্ছে না। বাড়িখানা নিঝুম...নিস্তব্ধ! পোড়োবাড়ি নাকি। কিন্তু না, তাও তো মনে হচ্ছে না।

হতবুদ্ধি ডাক্তার কলিংবেল টিপলেন। এ রকম অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আর কখনও হয়নি। কোন সাড়া নেই। বাড়িতে কোন লোকজন নেই নাকি! আবার বেল টিপলেন ডাক্তার। এ রহস্যের মীমাংসা না করে তিনি যেতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত দরোজা খুলল। একজন লোক চৌকাঠের ওপাশ থেকে ডাক্তারের দিকে তাকালেন। লোকটি বৃদ্ধ, তার মাথার চুল ধূসর। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ।

—'কাকে চাইছেন?' ক্লান্ত গলায় বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

—'দেখুন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার,' ডাক্তার বললেন, 'একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমার গাড়িতে উঠেছিল। সে এই বাড়ির ঠিকানাই দিয়েছিল। আমি তাকে নিয়ে এলাম, কিন্তু এখন দেখছি...'

—'সে আর গাড়িতে নেই, এই তো?' বৃদ্ধ প্রশ্নের সুরে বললেন।

—'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

—'মেয়েটি কোথায় আপনার গাড়িতে উঠেছিল?'

—'দুটো হাইওয়ে ক্রসিং-এ।' ডাক্তার উত্তর দিলেন।

—'জানি,' ক্লান্ত স্বরে বৃদ্ধ বললেন, 'এই নিয়ে তিনবার হলো। ও আমারই মেয়ে। তিন বছর আগে ঐ ক্রসিং-এর কাছে এক মোটর দুর্ঘটনায় ও মারা যায়। আজ ওর মৃত্যুর তারিখ। প্রতি মৃত্যুর তারিখেই ও বাড়ি ফিরে আসতে চায়, কিন্তু পারে না। ওর আগের দুটি মৃত্যুদিনেও একই ঘটনা ঘটেছিল।'

বৃদ্ধের গলার স্বর কেঁপে উঠল। চোখের কোণে টলমল করে উঠল অশ্রুবিন্দু।

বিমূঢ় ডাক্তার গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

বনগ্রামের বাসা

মতিন যখন অনেক কষ্টে জগন্নাথ কলেজে অনার্স পড়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেল, তখন থাকার জায়গা নিয়ে পড়ল সমস্যায়। দু'চারদিন এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাসায় থাকার পর ক্লাসেরই এক বন্ধু পুরানো ঢাকার বনগ্রামের দিকে এই বাসাটা ঠিক করে দিল।

বাসাটায় ওঠার পর প্রথম দিকে মতিনের মন খারাপ হয়ে গেছিল। বিহারিদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি। অনেক পুরানো বাড়ি। একেবারে ঘিঞ্জি। এক চিলতে উঠান। উঠানের পিছন দিকে একটা ঘর। জায়গায়-জায়গায় পলেস্তারা খসে বেরিয়ে পড়েছে পুরানো দিনের ছোট ছোট লাল ইট। দরোজাটার কাঠ বেশ ভারী, তবে নিচের দিকে ভাঙা। ফলে বাইরে দরোজার নিচ দিয়ে আলো আসে। জানালা একটা ঘুলঘুলির মতো ছোট ফাঁক মাত্র। শিকগুলো ভাঙা। কপাটের নাম-গন্ধ নেই। বাড়ির অন্যদিকে বাড়িঅলা থাকে। বাড়িওয়ালাদের পরিবারটাও অদ্ভুত। পরিবারের ছোট ছেলেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিদ্যায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে পাস করেছিল। এখন কোন এক কারণে পাগল। কারণটা মতিনের কাছে অজ্ঞাত। আর বড় ছেলে এ মহল্লার মাস্তান।

ছোট ছেলেটা শুধু মূর্তির মতো দোতলার রেলিং ধরে দূরে কোন এক অস্তপারে দৃষ্টি মেলে নীরবে তাকিয়ে থাকে। নিচ থেকে বাড়িওয়ালাদের রেলিংয়ের এককোণা দেখা যায়, মতিন মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে, ছোট ছেলেটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ন্যাড়ামাথা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শূন্য দৃষ্টি। খালি গা। অন্য সময় যাই হোক, বিকেলে ঘুম থেকে উঠলে মতিন উপরের দিকে তাকালেই ছোট ছেলেটাকে দেখতে পায়। হঠাৎ কখনও বা চোখ নামিয়ে মতিনের দিকে তাকায়। চোখে সেই শূন্য দৃষ্টি। একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত মতিনের শিরদাঁড়া বেয়ে নিচের দিকে নেমে যায়। এই দিকটা এত নীরব! বাড়িওয়ালাদের নিচতলাটায় একটা জুতোর কারখানা। রাস্তার দিকে দরোজা। মাঝেমধ্যে অল্পবয়েসী কারিগররা বিড়ি ফুঁকতে পিছনের দরোজা দিয়ে চিলতে উঠানে এসে দাঁড়ায়। কখনওবা উঠানের এককোণে আধা কাঁচা পায়খানায় গিয়ে প্রসাব করে। তবে বেশিরভাগ সময়ই পিছন

দিকের দরোজাটা বন্ধ থাকে। একেবারে নীরব এই কোণাটা। অথচ জুতোর কারখানার কারিগররা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হৈ হৈ করে কাজ করে চলেছে। রাস্তার দিকে শুধু জুতোর কারখানার দেয়াল ঘেঁষে সরু একটা গলি ভেতরে ঢোকার জন্য। মাঝে বাড়িওয়ালাদের দোতলার সিঁড়ি। গলির শেষটা এসে মিশেছে মতিনের ঘরের সামনের চিলতে উঠানে। তিনদিকে দেয়াল। মতিনের ঘরের সামনে তিন-চার হাত দূরে পুরানো দিনের প্রশস্ত দেয়াল সাত ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে। দেয়ালের উপর দিয়ে দূরের বড় বিল্ডিংগুলো দেখা যায়। আর দেখা যায় আকাশের গায়ে এলোমেলো সাজানো টিভির এন্টেনা। মতিনের এ বাসাটা একদম ভাল লাগে না। কিন্তু কী করা, ঢাকা শহরে বাসা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া ভাড়াও একটা ব্যাপার। টিউশনি করে চালিয়ে নেয়া যাচ্ছে কোনরকমে, এই ঢের।

রান্না করে দিয়ে যায় বুয়া। প্রায় একমাস হলো সে এখানে এসেছে, এরই মধ্যে সে বুঝে গেছে, আর যাইহোক বুয়াটা রান্না করে চমৎকার। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন-ষাট বছর। তিন কুলে কেউ নেই। কয়েকদিন ভিক্ষা করেও দিন চালিয়েছে বলে কথায় কথায় জানিয়েছে।

থাকে কোন এক বস্তিতে। দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায়। একদম ভোরে আর শেষ বেলায়, দুপুরের পরে। একটু পরেই বুয়া আসবে। বয়স বেশি বলে মতিন ওঁকে নানী বলে ডাকে। মতিন খেয়ে-দেয়ে একটা ফটোস্ট্যাট করা নোট উল্টাচ্ছিল। একটু পর বিভূতি আসার কথা। তারপর দু'জনে মিলে বেরুবে। বিভূতির আগেই বুয়া এসে গেল।

কী রান্না করবে? মতিন নোটের উপর চোখ রেখেই বলে।

ডিম, ডাইল।

বেগুন এনেছি, বেগুন ভাজি করো।

আচ্ছা। বুয়ার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মতিন লক্ষ্য করেছে, এই বুয়াটা চুপচাপ কাজ করে যায় সত্য, তবে মাঝেমধ্যে আড়চোখে মতিনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এটাই মতিনের কাছে অস্বস্তি লাগে। বুয়ার সেই চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক মনে হয় না মতিনের। কেমন ঘোর লাগা দৃষ্টি। অবশ্য মাঝেমধ্যে এ রকম হয়। সবসময় নয়। এছাড়া আর কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায়নি মতিন।

বুয়া রান্না করতে লেগে যায়। তেমন কোন আয়োজন তো নয়। শুধু ডিম আর ডাল। তাও সকালের রান্না করা ডাল আছে। শুধু ডিম রান্না করতে হবে। ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল বাইরে। এই ঘরটাতে যে ঘুলঘুলির মতো একটুখানি জানালা রয়েছে, তা দিয়েও বাড়িওয়ালাদের ছাদের কোণটা দেখা যায়। মতিন জানালা দিয়ে ছাদের দিকে তাকাল। বাইরে থেকে কেমন একটা বাতাস কাটার শিষের মতো শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মতিন অবাক হয়ে দেখল, উপরে বাড়িওয়ালাদের পাগল ছেলেটা নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। ব্যাপার কী? এই দিনের বেলা ভয় পেল কী দেখে? মতিন হাতের নোটটা ঝট করে রেখে চকি থেকে নেমে দাঁড়ায় বাইরেটা দেখার জন্য। বাইরে তো এদিকটায় কেউ নেই! বুয়া হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে ঘরের ভেতরে এসে ঢোকে।

বাইরে কেউ ছিল? বুয়াকে জিজ্ঞেস করে মতিন।

নাহ্।

মতিন বাইরে এসে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল, কোথায় কেউ নেই। বাড়িওয়ালার ছেলেটাও উধাও। সামনের জুতোর কারখানার হাতে টানা কাটার মেশিনের একটানা ঘটর ঘটর শব্দ। মতিন আবার এসে নোটটা চোখের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু এবার চোখ রাখে বুয়ার দিকে। বুয়াকে আজ অস্বাভাবিক লাগছে। মতিন কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করে, কি নানী, কি হলো?

বুয়া ঘুরে তাকাল। চোখ জ্বল জ্বল করছে। বলল, কী হইবো? কিছু না।

মতিন তবু হাল ছাড়ে না, কিছু নিশ্চয় হয়েছে–

বুয়া এবার রাগে গলা চড়িয়ে বলে উঠল, এই দ্যাখেন, এই বলে ডান হাতের তর্জনীটা তুলে ধরল, আঙুলটার উপরের কড়াটা কেটে প্রায় নখসহ আঙুলটা ন্যাড়া হয়ে গেছে, টপটপ রক্ত ঝরছে।

মতিন চকি থেকে লাফিয়ে নামল, আহা! কেমন করে হলো?

বুয়া শাসনের গলায় বলল, আপনার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই।

মতিন দেখল, বুয়া ঝটপট কাপড় দিয়ে আঙুল ব্যান্ডেজ করে ফেলল। প্রচুর যন্ত্রণা হওয়ার কথা। কিন্তু বুয়ার মুখ দেখে তেমন কিছু মনে হলো না। এমন সময় বিভূতি এল।

বিভূতি ঘরে ঢুকেই বলল, ঘরটা এমন মনে হচ্ছে কেন?

কেন? কেমন? মতিন জানতে চায়।

কেমন বলতে পারছি না। বিভূতির অবাক উত্তর।

বিভূতি আবার বলতে থাকে, কেন জানি না, আমার ভয় ভয়ই লাগে তোর এখানে আসলে। বিশেষ করে তোদের ওই উপরের পাগলটার জন্য—কেমন ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকে!

কিছুক্ষণ পর ওরা বেরিয়ে গেল। এক বন্ধুর বাসায় যাবে ক্লাসের নোটের জন্য।

রাতে ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। মতিন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পড়বে বলে বই খুলে বসেছে। অমনি দরোজায় টোকা পড়ল। মতিন খানিকটা ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে, কে?

কোনো জবাব শোনা গেল না।

রাত কত হবে? বেশি হলে এগারোটা। জুতোর কারখানাটা বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ। টুকটাক কথা শোনা যাচ্ছে এখনও। দেয়ালের ওপাশের বাড়িঘরের টিভি থেকে সিনেমার গানের সুর ভেসে আসছে। চারদিকে হৈ চৈ কোলাহল। শুধু এই এক চিলতে উঠানই অসম্ভব নীরব। দরোজায় আবারও টুকটুক। খুব আস্তে কেউ টোকা দিচ্ছে দরোজায়। মতিন কী করবে, ভেবে পেল না। তারপর বুকে সাহস সঞ্চয় করে গলায় খানিকটা জোর দিয়ে বলে উঠল, কে এত রাতে?

আমি।

আমি কে? মতিন এবার রাগত গলায় জিজ্ঞেস করে।

আমি ভাই—বুয়া।

মতিন অবাক হয়ে যায়। এত রাতে বুয়া কেন?

মতিনের চোখে বুয়ার সেই রক্তঝরা কাটা আঙুলটা ভেসে উঠল। মতিন কেমন একটা অশরীরী ভয় অনুভব করে। অবশ্য তেমন কিছু হলে চিৎকার দিলেই বাড়িওয়ালারা শুনতে পাবে। বাড়িওয়ালার বড় ছেলে বলে রেখেছে, কোন অসুবিধা হলে জানাতে। আর তাছাড়া দশ গজ গলি পেরোলেই জমজমাট বড় রাস্তা। হাজার মানুষের কোলাহল। তেমন কিছু দেখলে দরোজা খুলে এক দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে উঠলেই হবে।

মতিন বলল, এত রাতে কী?

আমার ছেলে আসবে এখানে।

ছেলে!

জ্বী, একটু দরোজা খোলেন, বসি। আসলে দেখা কইরা চইলা যামু।

মতিন ধাঁধায় পড়ে যায়। সে দরোজা না খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। বলে দেয়, নানী দরোজা খোলা যাবে না।

খোল ভাই।

নাহ্। মতিন দৃঢ়। দরোজা খুলবেই না। ঢাকা শহরে কত কী ঘটে যাচ্ছে।

বুয়ার গলা কেমন হতাশ শোনায়, আচ্ছা বাইরেই বসি।

অনেকক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নেই। মতিন অনেকক্ষণ পড়াশোনা করল। রাতও হলো অনেক। হঠাৎ বুয়ার কথা মনে পড়ল। কে জানে, এখনো বাইরে বসে আছে কি না! সে আবার ডাকল, নানী! সাড়া নেই। সে ঘরের লাইট জ্বেলে রেখেই দরোজা খুলল। কেউ কোথাও নেই। চারদিকে তাকিয়ে বাথরুমে গেল সে। আসার সময়ও দেখল কেউ নেই।

চারদিক সুনসান। শুধু শুধু ভয় পাওয়া। ঘরে ঢুকে মতিনের আফসোস হয়, বুড়া মানুষটাকে সে বাইরে বসিয়ে রেখেছিল। কি জানি হয়তো বেচারির ছেলে কোন অপরাধের আসামি। রাতে গোপনে মা'র সঙ্গে দেখা করতে আসে।... ও বাবা, প্রায় একটা বেজে গেছে! মতিন লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। বুয়া বোধহয় চলে গেছে।

তারপর আরেকটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। এমন কোনদিন হয়নি। গত একমাস হলো সে এখানে এসেছে। ক্লাসে গিয়েছে, টিউশনিতে গিয়েছে, ঠিকমতো ঘুমও হয়েছে। কিন্তু আজ, আজকের রাতটা যেন একটু অন্যরকম। কেমন একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। গলাটাও শুকিয়ে কাঠ। পানি খেতে হবে। মতিন চকি থেকে নামতে যাবে, এ সময় কানে আসে, ফিসফিস কথা বলার শব্দ।

মতিন চকির উপর বসেই কাঠ হয়ে গেল। কথা শোনা যাচ্ছে বাড়িওয়ালাদের ছাদ থেকে। সে ঘুলঘুলির মতো জানালাটা দিয়ে উপরের দিকে উঁকি দিল। যা দেখল তাতে মতিনের জ্ঞান হারাবার জোগাড়। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, কাজের বুয়া ছাদের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে বাড়িওয়ালাদের সেই পাগল ছেলেটা। চোখ দুটো হায়েনার মতো জ্বলছে। যেন দুটো হলদেটে লাইট বসানো। কিন্তু দুজনে যা বলছে, তা আরো ভয়ঙ্কর। মতিন কান পাততেই স্পষ্ট ভেসে আসে কথাগুলো।

মা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। গলার স্বর কেমন ফ্যাসফেসে। অনেক দূর থেকে আসা।

কেন, তুই ফাঁসি দিয়ে মরতে গেলি বাপ?

উপায় ছিল না, মা। তুমিও তো বিষ খাইলা?

তুই চলে গেলি—আমি কি নিয়া থাকব? গত পূর্ণিমায় তো আইলি না বাপ?

মা, অনেক কষ্ট করে এখানে আসতে হয়। পাগলের মাথা তো, অনেক সময় অর আত্মায় ভর করতে পারি না।

আমিও বাপ, ঐ কাজে বুড়িটার অবস্থাও ভাল না। কোনদিন হুট করে চলে আসবে আমাদের জগতে। বুড়ির গলায় রক্ত জল

করা এক ধরনের শাসানী।

মতিন এক মুহূর্ত ভাবে। সর্বনাশ, এরা তবে কেউ জীবিত নয়! দুজনের মধ্যে দুটো মৃত মানুষের আত্মা ভর করেছে! বুয়াকে তার নিয়তিই এত রাত্রে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। সে বিছানা থেকে খালি গায়ে নেমে সন্তর্পণে দরোজার ছিটকিনিটা খুলল, এখান থেকে বড় রাস্তায় যাবে। ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত শরীর। পা পাথরের মতো ভারী। দরোজা খুলে সাঁই করে খালি গায়ে খালি পায়ে দৌড় দিল গলি পেরিয়ে যাওয়ার জন্য।

মতিন বাড়িওয়ালাদের দোতলার সিঁড়ির ঘরটা পার হওয়ার সময় শুনতে পেল, পাগলটা বলছে, নতুন ছোঁড়া টের পেয়ে গেছে।

হ্যাঁ, বাপ। মেরে ফেলতে হবে ওকে—

মতিন এক দৌড়ে রাস্তায় নেমে আসে। রাস্তার এমাথা ওমাথা একেবারে ফাঁকা। মতিন সোজা পুব দিকে দৌড় দিল। খানিকটা দৌড়ে একটা বারান্দার দেয়ালের সাথে সেঁটে রইল। মাথা একটু ঝুঁকে এক পলক তাকাল।

পাগল আর বুয়া যেন বাতাসে ভর করে রাস্তার ও মাথা থেকে আসছে। পাগলটার চোখ বাতির মতো জ্বলছে। মতিন ঝট করে মাথা ভেতরে নিয়ে এল। সামনে দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। বুয়া হিংস্র গলায় বলছে, কোথায় যাবে?

রাস্তার বাতির আলোতে দুটো মানুষকে আরো ভৌতিক লাগছে। দুজনে প্রায় নিঃশব্দে, দ্রুত রাস্তার পুব দিকের মাথায় এগিয়ে চলল। ও মাথায় যেতেই মতিন বারান্দা থেকে নেমে রাস্তার পশ্চিম দিকে দৌড় দিল। খানিকটা দৌড়ে পিছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেয়েছে পাগল আর বুয়া, বাতাসে ভর করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। কোথাও রাস্তার একটা কুকুর কেঁদে উঠল। মতিন রাস্তার মাথায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারল। মোড়ের কাছে পৌঁছুতেই দুজন লোক জাপটে ধরে ফেলল ওকে। মতিন শুধু বলতে পারল, আমাকে বাঁচান।

লোক দুটো রাতের পাহারাওয়ালা। হাতে বাঁশের লাঠি। একটা লোক জিজ্ঞেস করল,

কী হয়েছে?

ঐ যে রাস্তার পুব দিকে আঙুল তুলে দেখাল মতিন। তারপর পাহারাওয়ালাদের হাতেই নেতিয়ে পড়ল।

পাহারাওয়ালারা তাকিয়ে দেখল, একটা বুড়া মহিলা আর এক যুবক রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় ঢুকে পড়েছে।

তালেব আলি বলল, দেখলি, ওই হারামজাদা।

অনেক দিন তো ছিল না। বলল সঙ্গী মিয়াচাঁন।

আবার আসছে।

তালেব আলি আর মিয়াচাঁন অনেকদিন থেকে এই গলিতে পাহারা দেয়। তারা এই গলির অন্ধিসন্ধি জানে। বারো নম্বর বাড়ির জানালায় অনেক রাত্রে যে আগুন জ্বলতে দেখা যায়, সেটা অনেকের মতো এরাও দেখেছে অনেকবার। সেটা না হয় কারণ ছিল যে, ওই বাড়ির একটা বউ শরীরে আগুন জ্বালিয়ে মরেছে। কিন্তু এরা রাতে কেন বেরোয়? কোনদিন সামনে পড়েনি। পড়লে মজা দেখিয়ে দিত। তালেব আলি আর মিয়াচাঁন মতিনকে রাস্তার একপাশে শুইয়ে দিল। মতিনের জ্ঞান ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। সে ওদের ঘটনাটা বলতে চাইল। ওরা বাধা দিয়ে বলল, ঠিক আছে, সব জানি।

তা এখন কোথায় যাবেন? তালেব আলি জিজ্ঞাসা করে।

আমাকে একটু এই মহল্লার ২০/৩ নং বাসায় পৌঁছে দিন।

বাসাটা এখান থেকে দূরে নয়। ওখানে বিভূতিসহ আরও কয়েকজন ছেলে মেস করে থাকে। তালেব আলি আর মিয়াচাঁন মতিনকে বিভূতিদের বাসায় পৌঁছে দেয়। এত রাতে মতিনকে খালি গায়ে দেখে সবাই অবাক। সবাই বুঝে নেয় খুব একটা বিপদ গেছে ওর ওপর দিয়ে। ধরে নেয়, ছিনতাইকারীরা ওর সব কিছু নিয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুধু বিভূতির কাছে মতিন সত্যি কথাটা জানায়। বিভূতি সব শুনে বলে, সত্যি নাকি? ঢাকা শহরেও ঘটে এসব। মতিন চুপ করে থাকে।

পরদিন সকালে মতিন বিভূতিকে নিয়ে বনগ্রামের বাসায় যায়। ঘরে তালা। চাবি একটি বুয়ার কাছে, একটি মতিনের কাছে

থাকে। মতিন ঘরের তালা খুলল। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। সকালে এসে বুয়া ডাল ভাত ডিম ভাজি রেঁধে রেখে গেছে!

বিভূতি বলল, চল, অনেক হয়েছে। আমার ওখানে ডাবলিং করে থাকব। দুজনে বিছানাপত্র গোছাতে লেগে যায়। বাড়িওয়ালাকে একমাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে গেলেই চলবে।

এই ঘটনার দশ বছর পর মতিন আবার বনগ্রামের বাসাটার খবর নিতে আসে। কোথাও পুরানো দালান বাড়িটার চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে ঝকঝকে একটা ছ'তলা বিল্ডিং। বারান্দায় মেলা কাপড়চোপড় আর বাহারি ফুলের টব দেখেই বোঝা যায়, এখানে পয়সাওয়ালা লোকেরাই ভাড়া থাকে। বাড়ির দারোয়ান তাকে দেখে চিনে ফেলে, আপনি স্যার! সেই যে রাত্রে রাস্তায় দৌড় দিছিলেন না?

মতিন তাকিয়ে দেখে, তালেব আলি বুড়ো হয়ে গেছে দ্রুত আর সব রাতজাগা মানুষের মতো।

আগের বাড়িওয়ালা কই? মতিন জানতে চায়।

সে স্যার কবে লাপাত্তা। বিক্রিবাট্টা করে কোথায় গেছে, কে জানে।

পাগল ছেলেটা?

সে তো স্যার কবে মইরা গেছে।

কাজের বুয়া?

কাজের বুয়া! কি জানি? জানি না স্যার।

মতিন তালেব মিয়ার হাতে একটা পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে বেরিয়ে আসে। তালেব মিয়ার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয় না। মতিন ভাবে, একদিন এই বুড়ো দারোয়ানটা তার জীবন বাঁচিয়েছিল। মতিন দ্রুত হাঁটা শুরু করে। আজ রাতেই তার নিউইয়র্কের ফিরতি ফ্লাইট।

অমল সাহা

Take screenshot

তিন ভূত

সুমনের গল্প লেখার ইচ্ছে হতো না, যদি না আকাশ মেঘলা থাকত, ঘরের ভেতর আধো আলো আধো অন্ধকার ভাবটা না থাকত। সুমনের কানে ওয়াকম্যান লাগানো। লেখার আগে টেবিলটি সাফ সুতরো করে নিয়েছে, ইচ্ছে তার জম্পেশ গল্প লিখবে সে আজ।

একটা সমস্যা অবশ্য রয়ে গেছে। সুমনের কল্পনাশক্তি খুব প্রখর নয়। অনেক ভাবাভাবি করেও কিছু একটা দাঁড় করাতে পারে না। ওর গল্পগুলো তাই মাঝপথেই থেমে যায়। সুমনের তাই আজকের ইচ্ছে, গল্প নয়, কিছু সত্যি কাহিনী সে শোনাবে পাঠককে। আর এভাবেই শুরু হলো গপ্প।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার্স কোয়ার্টারে এক বাড়িতে ভূত আছে তিনটি। একটি বাচ্চা, দুটো বড়।

১৮ই মার্চ, ২০০১।

গভীর রাত। প্রফেসর সাহেব পড়াশোনা করছেন স্টাডিতে। টেবিলের ওপাশে জানালার পর্দা সামান্য উঠানো। বাড়িতে অন্য দুজন মানুষ, স্ত্রী এবং কন্যা ঘুমাচ্ছে। চারদিক চুপচাপ। আত্মনিমগ্ন প্রফেসর। হঠাৎ শুনতে পেলেন শব্দটি। টকটক। কে যেন জানালার কাচে টোকা দিচ্ছে। চমকে তাকালেন প্রফেসর।

পর্দা তোলা জানালার ওপাশে হাসি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে একটি দশ-বারো বছরের ছেলে। 'টিকেট লাগবে স্যার, টিকেট?' ছেলেটির প্রশ্ন। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু থেকে মনোযোগ এখনও কাটেনি মাস্টার সাহেবের। আবার প্রশ্ন, 'লাগবে স্যার, টিকেট?'

সচেতন হলেন শিক্ষক। এত রাতে, জানালার ওপাশে, কে এই ছেলেটি? চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কে? কে?' ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে আগন্তুক। অত রাতে তিনি আর কাউকে জাগালেন না। ভাবলেন, চোর-ছ্যাঁচড় কেউ হবে। রসিকতা করেছে। মনে তবুও খটকা রয়ে গেল, রাত দুটোর সময় কেন?

২০ই মার্চ, ২০০১।

দুদিন পরের ঘটনা। এবারও মাস্টার সাহেবের পালা। রাত গভীর হচ্ছে। তিনি বসে আছেন স্টাডিতে। তিনি যেখানে বসেন সেখান থেকে ডাইনিং স্পেস স্পষ্ট দেখা যায়। ক্লাসের নোট তৈরি করছেন শিক্ষক।

হঠাৎ চোখের কোণে দেখতে পেলেন কেউ একজন যেন ডাইনিং স্পেসে এসে দাঁড়াল। টেবিলের উপর রাখা জগ থেকে পানি ঢালল গ্লাসে। প্রথমটায় ভেবেছিলেন বাড়িরই লোকজন কেউ হবে। হঠাৎ মনে হলো, স্ত্রী এবং কন্যা ছাড়া আর কেউ তো নেই বাড়িতে। ‘কে? কে?’ চেঁচিয়ে উঠলেন টিচার। উধাও হয়ে গেল আগন্তুক।

২১ মার্চ, ২০০১।

তৃতীয় ঘটনা স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে। দুপুরে ভাতঘুমে আয়েশ করে শুয়ে আছেন গৃহকর্ত্রী। ঘুম লাগি লাগি চোখে। হঠাৎ মেয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। বলল, ‘আম্মু, ওঠো তো, জলদি ওঠো,’ আঙুল ধরে টানাটানি করছে সে। বিরক্তি নিয়ে পাশ ফিরলেন মা। আবার হাতের আঙুল ধরল মেয়ে, ‘ওঠো না, একটু ওঠো দেখবে।’ মেয়ের পীড়াপীড়িতে উঠলেন মা, বললেন, ‘চল কি দেখাবি, চল।’

মায়ের ডান হাতের মধ্যমা ধরে আছে মেয়ে। পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে মেয়ের সঙ্গে চললেন মা। মেইন গেটের কাছে এলেন, তাকালেন বাইরে। কোথাও কিছু নেই। কষে বকা দেয়ার জন্য তাকালেন মেয়ের দিকে। নেই মেয়ে। অথচ হাতের যেন স্পর্শ লেগে রয়েছে তার। আচমকা মনে পড়ল মায়ের, মেয়ের তো এখন বাসায় থাকার কথা নয়। সে তো রয়েছে স্কুলে। আঙুল ধরে দরোজা পর্যন্ত টেনে আনল কে?

এই তিনটি রহস্যের পুরোটা আজও কিনারা হয়নি। তবে শুনেছে, ওই বাড়িতে নাকি কোন একটি ছেলে কবে আত্মহত্যা করেছে। ছোট ভূতটির না হয় জবাব পাওয়া গেল, কিন্তু অন্যজন কে?

এ তো গেল সাম্প্রতিক ভূতের গল্প। এ রকম আরেকটি ঘটনা শুনেছে বাবার কাছে।

বহু বছর আগের কথা। বাবাদের বাড়ির কাছে ছিল একটি কবরস্থান, সামান্য দূরে শ্মশান ঘাট। জায়গাটি নাকি খারাপ। নানা ঘটনা ঘটে ওখানে। দিনে-রাতে যে কোন সময় পাশ দিয়ে যেতে গা ছমছম করে। কবরস্থানের পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে করিমপুর। যদু মিয়া সে গ্রামের বাসিন্দা। বাজারে তরকারি বিক্রি করে। যদু মিয়ার তিন ছেলে। ছোটটিকে ভর্তি করিয়েছে মাদ্রাসায়। আলেম বানাবে। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, যদু মিয়ার ছোট ছেলে হালিমকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বেশ কয়েকদিন ধরে ওর জ্বর ছিল। মাদ্রাসায়ও যেত না। শুয়ে থাকত বাড়িতে, বিছানায়। নাই, নাই। হালিম কোথাও নাই। ধারেপাশে সব জায়গায় খোঁজা হলো। না, নেই সে। শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গেলে বাবা-মা।

হঠাৎ একরাতে হাঁটুরেরা বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পেল, কবরস্থানের দেয়ালের উপর কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আকৃতি বোঝা যায় না, তবে অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায় সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। বুকে ঝাড়ফুঁক দিয়ে সাহস করে এগিয়ে গেল দু'একজন।

কে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে? না, যদু মিয়ার ছেলে হালিম। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুটো লাল, মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই, কোথা থেকে এল সে এখানে? এতদিন কোথায় ছিল? কোন জবাব নেই। ধরাধরি করে ওকে বাড়ি নিয়ে এল সবাই। তিনদিন পরে স্বাভাবিক হলো সে। কোথায় ছিল সে এতদিন? প্রশ্ন করলে একটাই জবাব দেয় সে, পরীরা এসে ওকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কোথায়? সে জানে না। কেন তারা ওকে কবরস্থানে নামিয়ে দিয়ে গেছে, তাও সে জানে না।

এ গল্পটি সত্তরের দশকের। বলেছেন সুমনের চাচা। প্রথম গল্পটির টিচারস কোয়ার্টারের। এবারের গল্পটি ছাত্র হলের। গল্পটি এ রকম—মহসিন হলেন তিনশ চৌদ্দ নম্বর রুমে, থাকে গোবেচারা গোছের ছাত্র শাহনূর। কিছুদিন হলো শাহনূর খুব মনমরা হয়ে থাকে। এমনিতেই কথাবার্তা বলে কম, ইদানীং আর কথাই বলছে না। বন্ধুরা পীড়াপীড়ি শুরু করল, কি হয়েছে তার? বলতে হবে। শাহনূর জবাব দেয় না, শুধু বলে, 'তোরা বিশ্বাস করবি না।'

'কি এমন কথা যা বিশ্বাস করা যাবে না?' বন্ধুদের প্রশ্ন।

'আমার ঘরে পরী আসে।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল বন্ধুরা।

'আমি তো আগেই বলেছি, বিশ্বাস হবে না।' বলল শাহনূর।

'দেখাতে পারবি?' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল বন্ধুরা।

'পারব,' বলল শাহনূর। 'বৃহস্পতিবার রাতে এগারোটার পর আসিস।'

বৃহস্পতিবার রাত। হল এলাকা আস্তে আস্তে চুপচাপ হয়ে গেল। ঘরে ঘরে বাতি নিভে গেছে। তিনশ চৌদ্দ নম্বর রুমে শুধু জেগে আছে পাঁচটি ছেলে।

হঠাৎ করে যেন দমকা হাওয়া শুরু হলো। ঘরের পর্দা নড়তে লাগল বিষম জোরে। সুগন্ধিতে ভরে যায় রুম। হঠাৎ দেখা গেল, ঘরের মধ্যে হাজির হয়েছে অপূর্ব সুন্দরী অথচ খুদে আকৃতির এক পরী। সবাইকে সম্ভাষণ জানাল পরী, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, বিস্মিত সবার চোখের সামনে শাহনূরের কোলে এসে বসল পরী। ট্রান্সপারেন্ট পরীর দেহ ধরা যায় না, অথচ আছে। নানা প্রশ্ন করল সবাই পরীকে। উৎসাহী কেউ কেউ জানতে চাইল, সামনের পরীক্ষার ফল কি হবে? পরী জবাব দিল, শাহনূর বাদে সবাই পাস করবে, এমনকি একজন ফার্স্টক্লাসও পাবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তিন মাস পরে পরীক্ষার ফলাফল পরীটি ঠিক যেভাবে বলেছিল সেভাবেই হলো। তবে ওই ঘটনার পর পরীটিকে আর দেখেনি শাহনূর।

ব্যাংকক থেকে ফিরে এসে পরের গল্পটি শুনিয়েছিলেন সুমনের বাবা। তাঁকে শুনিয়েছেন মতিন আঙ্কেল। তিনি এখন ওখানেই ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। ঘটনাটি অবশ্য এই বাংলাদেশেরই। টিকাটুলীর।

উনিশ ঊনসত্তরের কথা। মতিন আঙ্কেলরা থাকেন টিকাটুলীতে। তাঁর বন্ধু শফিক। পাশাপাশি বাড়ি। শফিকের মা নেই। বাবা আছেন। সরকারী চাকুরী করেন। মফস্বলে পোস্টিং। ছুটির দিনে বাড়িতে আসেন। শফিক বাড়িতে একা থাকে। পুরানো কাজের বুয়া আছে, সে-ই রান্নাবান্না করে দেয়। রাতে চলে যায়। আর তাছাড়া মতিন আঙ্কেলের মতো বন্ধুরা তো রয়েছেই।

একসঙ্গে পড়াশোনা করে। মাঝে মাঝে মতিন আঙ্কেল শফিকদের বাড়িতেও রয়ে যায়, রাত বেশি হলে।

ইদানীং শফিককে বেশ উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখায়। চোখগুলো লাল হয়ে থাকে। বন্ধুদেরকে এড়িয়ে চলে। মতিনের সন্দেহ হলো, শফিকের হয়তো কোন অসুখবিসুখ করেছে। একদিন তাই সুযোগমতো প্রশ্ন করল শফিককে, 'কিরে তোর কি কোন অসুখ করেছে? চোখমুখ ওরকম দেখায় কেন? রাতে ঘুমটুম হয়?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল শফিক, জাপটে ধরল মতিনের হাত, বলল, 'ও আমাকে নিয়ে যেতে চায়।'

'কে? কে তোকে নিয়ে যেতে চায়?' রহস্যের গন্ধ পেল মতিন। শফিক কি গোপনে গোপনে প্রেম করছে?

'কোথায় থাকে সে? কোথায় নিয়ে যেতে চায়?' প্রশ্ন মতিনের।

'জানি না, বলে দূর কোন দেশে।'

'মেয়েটাকে দেখাবি তো? ঠ্যাং ভেঙে দেব।' বলল মতিন, 'নিশ্চয় বিহারি হবে?'

'না না, মানুষ তো নয়। পরী। দিনে আসে না, আসে রাতে।' বলল শফিক। 'আজ রাতে আসবে। তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

মতিন ঠিক বুঝতে পারছে না, শফিক কি সত্যি কথা বলছে, না পাগলের প্রলাপ বকছে।

মতিন তার মা-বাবাকে রাজি করাল, আজ রাতে সে শফিকের বাড়িতে পড়াশোনা করবে, আজ আর ফিরবে না।

শফিকের বাড়িটি টিনের। ঘরের মেঝে মাটির। বেড়ার দরোজা, জানালা। বাড়ির সামনে ছোট্ট উঠোনে কামরাঙ্গা আর লেবু গাছের ঝাড়। এলাকার সব বাড়িতে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি। শফিকদের বাড়িতেও আসেনি। হারিকেন জ্বালিয়ে লেখাপড়া করে সে।

মতিন এসেছে। দু'বন্ধু বসে আছে পড়ার টেবিলে। উত্তেজিত মতিন। হঠাৎ শুরু হলো দমকা হাওয়া। দরোজা তখনও ভেজানো হয়নি, হাওয়ার তোড়ে দুলে দুলে উঠছে দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডার, মাঝেমধ্যেই নিভু নিভু হয়ে যাচ্ছে হারিকেনের

সলতে। এক সময় থেমে গেল হাওয়া।

'এসেছো, তুমি এসেছো।' লাজুক ভঙ্গিতে বলল শফিক কারো উদ্দেশ্যে।

বিস্মিত মতিন, ধারেপাশে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

'কাকে বলছিস?' প্রশ্ন করল মতিন।

'এই যে একে।' শফিক ওর পাশে অদৃশ্য কারো দিকে ইঙ্গিত করল।

শফিকের এই আচরণ ও মুডে চিন্তিত হলো মতিন। 'না, আমি যাব না।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল শফিক।

'কোথায় যাবি না তুই?' প্রশ্ন করল মতিন।

'না, যাব না। ছাড়।' নিজের হাতটা টানছে শফিক।

হঠাৎ যেন ধস্তাধস্তি হলো ঘরের ভেতর। মনে হচ্ছে কেউ যেন শফিককে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দরোজার দিকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মতিন। 'আমাকে বাঁচা মতিন!' চিৎকার করে উঠল শফিক।

ওকে জাপটে ধরতে চাইল মতিন। কে যেন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ওকে। শূন্যে উঠে যাচ্ছে শফিক। নিজের অজান্তেই পা জাপটে ধরল মতিন। উড়ে যাচ্ছে শফিক। ধরে রাখতে পারছে না মতিন। ছিটকে বেরিয়ে গেল শফিকের পা। পারল না মতিন ধরে রাখতে। বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে শফিক।

হঠাৎ শোনা গেল প্রচণ্ড এক শব্দ। মনে হলো পাশের বাড়ির টিনের ছাদে কিছু একটা জিনিস সশব্দে পড়ল। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মতিন। পাশের বাড়ির টিনের ছাদে উবু হয়ে পড়ে আছে শফিক। মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে তুলে কেউ যেন আছড়ে ফেলেছে শফিককে। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে তার।

বিকট শব্দ শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে এসেছে লোকজন। ধরাধরি করে টিন থেকে নামানো হলো শফিককে। ওর মুখে কোন কথা নেই। চোখ-মুখ উদ্ভ্রান্ত। কোন ব্যাখ্যাও সে দিতে পারছে না। কেন যে টিনের ছাদে উঠেছিল, ব্যথাই বা পেল

কিভাবে। এ ঘটনার পূর্ব ইতিহাস মতিন জানলেও কাউকে সে বলতে পারল না আসলে কিভাবে ঘটল ঘটনাটি।

মতিন আঙ্কেল এই রহস্যের কোন কিনারা করতে পারেননি। পারার মতো কোন যুক্তি তো আসলে তার কাছে নেই।

আতঙ্কের দিনরাত

হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল আনুর। চোখের সামনে কালিগোলা অন্ধকার। কেমন অস্বাভাবিক লাগছে ঘরের পরিবেশ। ঘুটঘুটে অন্ধকারের সাথে অতিপ্রাকৃত কিছু মিশে আছে যেন। এমন তো হয় না কোনদিন। আনুর ভয় ভয় করতে লাগল। বুকটাও জমে বরফ। অন্ধকারে যেমন ভয় লাগছে তেমনি ভয় পাচ্ছে বাতি জ্বালতেও। আচমকা সুইচটা টিপেই দিল সে।

আলোটা চোখ সয়ে আসতেই আনু ঘরে বোলাতে লাগল ভীত দৃষ্টি। শফিক আমানের খাটের দিকে দৃষ্টি যেতেই অসম্ভব আতঙ্কে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো। ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে আনুর চোখ দুটো আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। এটা কি স্বপ্ন? নাকি চোখের ভুল? মাথায় প্রশ্ন খেলে যেতেই সে সাহস সঞ্চয় করে তাকাল আবারও।

হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের সাথে বাড়ি খেল দমাদম। বীভৎস কঙ্কালটা আগের মতোই ঝুলে আছে শফিক আমানের খাটের পাশে। লিকলিকে হাত-পাগুলো ছড়িয়ে এখনি তেড়ে আসবে যেন—এমনই কঙ্কালটার ভাবভঙ্গি। চোখহীন কোটরে নারকীয় উল্লাস তার। দুই সারি দাঁতে অশুভ হাসির রেখা। আনু আবারও একটি আর্তচিৎকার দিয়ে বন্ধ করে ফেলল চোখ দুটো।

দুই

'আনু, এই আনু, চোখ খোল।' শফিক আমানের কণ্ঠ শুনে আনু স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাকাল।

'তুই এত ভীতু?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল শফিক আমানের কণ্ঠ থেকে।

‘ওটা তো একটা সাধারণ কঙ্কাল রে!’

আনুর ভয় এখনও বিন্দুমাত্র কাটেনি। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, ‘সা-সাধারণ কঙ্কাল? কি-কিন্তু ওটা এ-এখানে কি-কিভাবে এল?’

‘পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আমিই এনেছি। পুরুষ মানুষের পরিচয় দিয়ে তুই এবার ঘুমা তো। সকালে সব খুলে বলব।’ বলে শফিক আমার বাতি নিভিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেল।

বিজ্ঞানের ছাত্র শফিক আমান। আনুর এক বছরের সিনিয়র। আনু কমার্সের। একই কলেজে পড়ে ওরা। এই মেসটাতে আছে অনেক দিন ধরেই। সাথে শফিক আমানের দুজন ক্লাসমেট। দিনতিনেক আগে ওরা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছে।

আজই সকালে শফিক আমান এবং আনু কবরখানার দিকে হাঁটতে গিয়েছিল। ভাঙা কবরটা আনুর নজরেই পড়ে প্রথমে। সে দেখায় শফিক আমানকে। দুই-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেছে কবরটার। ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একটা কঙ্কালের অনেকটা অংশ। অজানা ভয়ে আনুর বুকে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেলেও শফিক আমান স্বাভাবিকই রইল। ভয় পাবে দূরের কথা, বরং খুশিতে তার চোখ দুটো চকচক করে উঠেছিল। সকালের এ ঘটনাটি স্মরণে আসতেই আনু বুঝতে পারল শফিক আমান রাতের আঁধারে কবর থেকে তুলে এনেছে কঙ্কালটা। নিঝুম রাতে কবরখানা থেকে যে একাকী এমন একটা কঙ্কাল তুলে আনতে পারে তার সাহস আছে মানতেই হবে। তাই বলে এতবড় দুঃসাহস? আনুর ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শফিক আমান নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে শুরু করলেও আনুর চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। আতঙ্কটা বুকের উপর পাথর চেপে বসেছে যেন। উত্তেজনা এবং ভয়ে নার্ভগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে এক সময় আনুর চোখে ঘুম এলেও ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে জেগে উঠেছে বারবার।

তিন

পরের তিনটি দিন বলতে গেলে আনু কাটিয়ে দিয়েছে বাইরে বাইরেই। একটা কঙ্কালের সাথে অস্বস্তিকর সময় কাটানোর কথা কল্পনা করলেও গা শিরশির করে তার। কিন্তু রাতে বাধ্য হয়ে ফিরতেই হয়। ঘুম হয় ছাড়াছাড়া, আসেও দেরিতে। তার উপর দুঃস্বপ্ন তো আছেই। আনুর ধারণা—এ রকম আরও কয়দিন চললে সে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে!

শফিক আমানকে অনেক বুঝিয়েছে আনু। অনুরোধ করেছে কঙ্কালটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে আসতে। নতুবা যেকোন সময় ঘটে যেতে পারে খারাপ কিছু।

আনুর অনুরোধ এবং আশঙ্কার কথা শুনে শফিক আমান প্রতিবারই হো হো করে উঠেছে। বলে, 'তুই অযথাই ভয় পাচ্ছিস, আনু। বিজ্ঞান যারা পড়ে তাদের এভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতেই হয়।'

শফিক আমানের এই যুক্তি স্বস্তি দেয়নি আনুকে। বিজ্ঞানের স্বার্থে সবাই একটা করে কঙ্কাল কবর থেকে তুলে এনে ঘরে ঝুলিয়ে রাখবে—এটা মেনে নেয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

আনুর আশঙ্কাও কিন্তু অমূলক নয়। ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোই তাকে এমন ভাবতে বাধ্য করেছে। যে রাতে কঙ্কালটা আনা হয় তার পরদিন সকালে শফিক আমান এবং আনু হোটেল থেকে নাস্তা সেরে এসে দেখে—কঙ্কালটা মাটিতে সটান দাঁড়িয়ে আছে অবিকল মানুষের মতো। যে রশি দিয়ে ঝুলানো ছিল সেই রশিটি ছিঁড়ে ঝুলে আছে গলায়। আনু তো অবাক। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল শফিক আমানও। তবে পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নেয়। ইতোমধ্যে তার বিজ্ঞানমনস্ক মন কোন যুক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে হয়তো। এরপর কঙ্কালটাকে যেখানে খুশি দাঁড় করিয়ে রেখেছে শফিক আমান।

সেদিনই সকাল থেকে আনু তার পোষা বিড়ালটাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। শেষে শফিক আমানের খাটের নিচে সে আবিষ্কার করে ওটাকে। কোন অঙ্গই আস্ত নেই বিড়ালটার। দেহের মানচিত্র পাল্টে পরিণত হয়েছে একদলা মাংসপিণ্ডে! পোষা বিড়ালের এমন নির্মম পরিণতি দেখে আনু তো কেঁদেই ফেলেছে হাউমাউ করে। ওর বিশ্বাস—এই বর্বরতা

কঙ্কালটারই।

মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটেছে দুবার। একবার সিলিংফ্যানটা খুলে দুম করে পড়ে গেল মেঝের মধ্যে। শফিক আমান রক্ষা পেল অল্পের জন্য। গত রাতে শফিক আমান ঘুমিয়ে পড়ে বেশ আগে ভাগেই। আনুর ঘুমুতে একটু দেরি হয়। হঠাৎ সে দেখে—শফিক আমানের বিছানায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দুজন মিলে যখন আগুন নেভাতে সক্ষম হলো ততক্ষণে বিছানার অর্ধেক পুড়ে শেষ। শত অনুসন্ধান করেও আগুন লাগার কোন কারণ বের করতে পারেনি ওরা।

এইসব রহস্যময় ঘটনা বিন্দুমাত্র দুর্বল করতে পারেনি শফিক আমানকে। প্রতিবারই সে ঘটনাগুলোর পেছনে দাঁড় করিয়েছে কোন না কোন যুক্তি, ব্যাখ্যা! আনুর সেসব পছন্দ হয়নি একদম।

আজ সন্ধ্যেবেলায় যা ঘটেছে তা আনুকে এতই আতঙ্কিত করে তুলেছে যে— সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে—আজ রাতটা পার করে কাল সকালেই চলে যাবে খালার বাসায়। শফিক আমান কঙ্কালটাকে সরিয়ে ফেললে এই মেসে ফিরে আসবে, নয়তো নতুন ঠিকানা খুঁজবে।

সন্ধ্যেবেলা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছিল শফিক আমান। কঙ্কালটা দাঁড় করানো ছিল তার পেছনেই। আনুকে একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। সে ফিরে এসে দেখে—কঙ্কালটা হাত দুটো ধীরে ধীরে শফিক আমানের গলার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে—অনেকটা চেপে ধরার ভঙ্গিতে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে আনু। সাথে সাথে কঙ্কালটা ঝট করে হাত দুটো নামিয়ে ফেলে স্বাভাবিক হয়ে যায়। অবিশ্বাস্য ঘটনাটা শফিক আমানকে খুলে বললে সে আনুকে তিরস্কার করে বলে, ‘কুসংস্কারে পূর্ণ তোর মন। ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব—এসব অবাস্তব চিন্তা মস্তিষ্কে ঘুরপাক খায় সারাক্ষণ। এই মস্তিষ্ক নিয়ে কি দেখতে কি দেখিস—আল্লাই মালুম!’

আনু আর কিছু বলার সাহসই পায়নি।

চার

আনুর যখন ঘুম ভাঙল কাকভোর তখন। দরোজা-জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে ভোরের মৃদু আলো। ঘরের কোণগুলোতে বাদুড়ঝোলা অন্ধকার। যেন অদ্ভুত এক আলো-আঁধারির খেলা চলছে ঘরের ভেতর। সাধারণত এ সময়ে ঘুম ভাঙে না আনুর। চাদরটা সরিয়ে আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নামল সে। হাই তুলতে তুলতে জ্বালল বাতিটা।

শফিক আমানের বিছানাটা খালি দেখে অবাক হলো। কোথায় গেল শফিক আমান? মেঝের দিকে দৃষ্টি যেতেই রীতিমতো জমে গেল আনুর দেহ। অসম্ভব আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইল কোটর ছেড়ে। বুক ফাটিয়ে চিৎকার করতে চাইছে সে। কিন্তু গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই বের হলো না।

মেঝেতে শফিক আমানের দেহটা পড়ে আছে একতাল কাদার মতো, রক্তাক্ত। শরীরের একটা হাড়ও আস্ত নেই বোধহয়। হাত-পাগুলো মুচড়ে এমনভাবে ভাঙা হয়েছে যে—এগুলো মানুষেরই অঙ্গ ছিল কোনদিন—বিশ্বাস করা মুশকিল। কোটর শূন্য! রক্তভেজা চোখ দুটো মার্বেলের মত পড়ে আছে দেহের একপাশে। থ্যাঁতলানো নাক! গলাতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে পাঁচ আঙুলের চাপের দাগ। চাপটা যে রক্তমাংসের কোন হাতের নয়—এটাও বুঝতে অসুবিধা হলো না আনুর। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগ মুহূর্তে অনেক কষ্টে সে একবার সারা ঘরটাতে দৃষ্টি বোলাতে পেরেছিল। কঙ্কালটাকে কোথাও দেখতে পায়নি।

পাঁচ

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল বলতে পারবে না আনু। একসময় জ্ঞান ফিরলেও ঘোরটা কাটল না পুরোপুরি। এই ঘোরের মধ্যেই

বিচিত্র এক কৌতূহলে কবরখানার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। নির্জন কবরস্থানে তখন শান্তি সুবাতাস। সবুজ ঘাসে ভোরের মায়াবী আলোর স্নিগ্ধতা। ভাঙা কবরটার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল চরম সত্যটা। নিজেকে নিজেই মুক্ত করে কঙ্কালটা কবরে এসে শুয়ে আছে ঠিক আগের মতোই। আপন ঠিকানায়। কিন্তু এজন্য শফিক আমানকে বড্ড বেশি মূল্য দিতে হলো। কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আনুর বিপর্যস্ত বুক চিরে।

ইটভাটার পাহারাদার

আমি আর মনু মিয়া ছাড়া রাত্রিবেলায় এই কারখানাটায় কেউ থাকে না। আমার একটু ভয় ভয় করে। আমি নতুন মানুষ। আগে পাহারা দিতাম সাভার বাজারে। সেখানে অনেক ঘর, দোকান আর গুদাম ঘর ছিল। পাহারাদারও ছিল এন্তার। কিন্তু এখানে মনু মিয়া ছাড়া রাতে আর কোন মানুষ নেই। বেতন বেশি বলে এখানে চলে এসেছি। কাজ সেই একই। রাত্রি বেলার দারোয়ান। দিনের বেলা প্রাণভরে ঘুমাই। সন্ধ্যা হলেই কাজ শুরু।

সিরামিক ইটের এই কারখানাটা সাভার-আরিচা হাইওয়ের কাছেই। পঞ্চাশ গজ একটা মাটির রাস্তা হাইওয়ে থেকে নেমে গেছে ঢালে। তারপর সোজা এই কারখানাটার গেটে। আর কারখানার রাস্তার অপর পাড়ে ধু-ধু ঝোপঝাড়ের এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। কারখানাটার চারদিকে কোন দেয়াল নেই। কাঁটাতারের বেড়া। পশ্চিম দিকের এক কিনার ঘেঁষে বিরাট গুদাম ঘরের মতো কারখানা। ভিতরে গ্যাসের চুল্লি বা পুইন। আগে এসব পুইন জ্বলত গাছের গুঁড়ি দিয়ে। তারপর কয়লা। এখন এসব পুইন জ্বলে গ্যাসে। গ্যাসের মোটা পাইপ হাপরের মতো ফাঁকা জায়গায় গিয়ে ঢুকেছে। হাপরের মতো জায়গাটায় জ্বলে গনগনে চুল্লি। ইট পোড়ানো হয়। হাপর থেকে মোটা একটা চিমনি উঠে গেছে গুদাম ঘরের ছাদটা ফুঁড়ে। সেখান দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। সমস্ত কারখানাটার রং ইটের মতো। ইটা পোড়ানোর গুঁড়া উড়ে উড়ে এই অবস্থা হয়েছে।

কারখানার গুদাম ঘরের একপাশে কাঁচামালের স্টোর। গুদাম ঘরের দরোজার সামনের বিরাট মাটির ঢিবি। গেটের কাছে অফিস ঘর। গেটের একেবারে সঙ্গে বাক্সের মতো টিনের টালিঘর। দিনের বেলা এই ঘরটার সামনের টুল পেতে বসে থাকে টালিম্যান বিমল বাবু।

আরো লোকজন আছে এই ইটের কারখানায়। আমি এই পর্যন্ত ভাল করে চিনেছি, ম্যানেজার ফরিদ সাব, টালিম্যান বিমল বাবু আর আমার সঙ্গের দারোয়ান মনু মিয়াকে। দিনের বেলা এত লোকজন, অথচ রাতের বেলা একেবারে সুনসান। শুধু রাস্তার দিকে তাকালে দেখা যায়, রাতের দূরপাল্লার গাড়িগুলি লাইট জ্বালিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে চলেছে গন্তেব্যে। একপাশে একটা

কচুরিভর্তি বদ্ধ জলা। এটা গিয়ে মিশেছে একটা উঁচু জায়গায়। এখান থেকে উঁচু জায়গার পরের অংশটুকু দেখা যায় না। অনেকটা ফাঁকা। সরকারি খাসজমি। এরপরে দূরে গ্রামের সীমানা। ডানপাশে বড় একটা খাদ। পৌরসভার লোকজনেরা ট্রাক ভর্তি করে ময়লা নিয়ে এসে এখানে ডাম্পিং করে। কারখানার আবর্জনাও ফেলা হয় এখানে। বাম পাশে বুনো ঝোপ। ঝোঁপটা শেষ হয়েছে ঘন এক শালবনের মধ্যে। অবশ্য এখন আর বনটা অতো ঘন নয়। হালকা। মনু মিয়া জানিয়েছে, এই বন আগে যখন ঘন ছিল তখন নাকি রাত দুপুরে বুনো শুয়োরও এসে হানা দিত শেয়ালের বাচ্চা খাবার জন্য। এখন ওসব নেই। থাকার মধ্যে আছে দাঁড়াশ সাপের দল। গত পরশুদিনও দেখলাম, পাঁচ হাত এক দাঁড়াশ কারখানার কোণা থেকে বের হয়ে অফিস ঘরের সামনের ট্রাক ভেড়ানোর ফাঁকা জায়গা দিয়ে অতি দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছিল জঙ্গলের দিকে। চাঁদের আলো পড়ে গায়ের আঁশ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল। অবশ্য আমার ভয় লাগেনি। দাঁড়াশ সাপের যে বিষ নেই, তা আমি আগে থেকেই জানি। শুধু সাপটাকে দেখতেই যত ভয়। যেমনি বড়, তেমনি তার চলার গতি। বিপদ দেখলে ঝড়ের গতিতে ছুটে পালায়।

আমার থাকার জায়গা অফিস ঘরের ভিতরে একটা রুমে। মনু মিয়া আসে দূরের গ্রাম থেকে। জানে, আমি এখানে সর্বক্ষণ থাকি। তাই মনু মিয়া ইচ্ছা করেই মাঝে মধ্যে দেরি করে ডিউটিতে আসে। দেরি করে এলে কথায় কথায় নানা ছুঁতো ওঠায়, 'বোঝলা বদিউল ভাই, আইজ একটু নবীনগর বাজার হইয়া আসলাম। ম্যালাদিন ছুডু ভাইটার খবর পাই নাই। শুনছিলাম, জ্বর হইছিল। গিয়া দেখি সাইরা গেছে।'

আমি চুপচাপ শুনি। জানি, মনু মিয়ার এইসব কথাবার্তা মিথ্যা। নবীনগর বাজারে মনু মিয়া প্রায় দিনই যায়। এখানকার সবাইকে বাজারঘাট করতে নবীনগর বাজারেই যেতে হয়। হয়তো কোন কারণে আসতে দেরি করেছে, এখন মিথ্যা গল্প বলে আমাকে বুঝ দিতে চাইছে। কিন্তু আমার এসবে আপত্তি নেই। আমি একলা মানুষ, একটু বেশি ডিউটি করলেই কী আর একটু কম করলেই কী? আমি তো দুপুরবেলা উঠেই গোসল সেরে রান্না চড়িয়ে দেই। খেয়েদেয়ে আবার ঘুম। বিকালে উঠে অফিস ঘরের বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকি। কখনও ফরিদ সাব আর বিমলবাবুর জন্য চা করে দিতে হয়। তেনারা হিসেব-নিকেশ করতে করতে চা খান। তারপর লেবাররা লাইন ধরে নিত্যদিনের কাজের পয়সা বুঝে নিয়ে যায়। কারণ তখন কাজের অর্ডার

থাকে বেশি। তবে বেশ কিছু স্থায়ী শ্রমিকও আছে, যারা বেতন করা। মাসের শেষে বেতন নেয়। আমারটা যেমন, মাসের শেষে বেতন। লেবাররা যাওয়ার পর যান বিমলবাবু। সবার শেষে ফরিদ সাব।

ফরিদ সাব যাওয়ার সময় বারবার সাবধান করে দিয়ে যান, রাত্রিবেলায় যেন ঘুমিয়ে না থাকি। কিন্তু সত্য বলতে কী, রাত্রে আমি আর মনু মিয়া পালা করে ঘুমাই। না ঘুমিয়ে সারারাত পাহারা দেয়া অসম্ভব। সাভার বাজারের নিমাই দারোয়ান একটা কথা বলত, 'ঘুমই হইতাছে পাহারা দেওয়ার মূল শক্তি।' আর এই কারখানাটায় চুরি করার মতো আছেই বা কী? অফিস ঘরের দুটি ফ্যান। একটা স্টিলের আলমারী। আর কিছু খাতাপত্র। আমার বলতে একটা কেরোসিনের স্টোভ আর হারিকেনটা। টাকা পয়সা এখানে এক পয়সাও রাখেন না ফরিদ সাব। জায়গায় জায়গায় মাটির স্তূপ। স্টোরে আছে ব্ল্যাকস্টোনের গুঁড়ার বস্তা, জিপসামের বস্তা এইসব। বড়ই ওজনদার, কিন্তু অকর্মার জিনিস। চোরেরা ভুলেও এসব ধরবে না। তাই ঢিলেঢালা পাহারা দিলেও চলে যাওয়ার কথা। গত মাস দুয়েক তো এমনই করেছি। বর্ষার সময় কী হয়, কে জানে!

আজ মিনু মিয়া দেরিতে এলো। ফাল্গুনের শেষ দিন। আকাশ ফাটা রোদের পর আজ দুদিন যাবৎ আকাশটা ভারী ভারী। বাতাসটাও অনেকটা ঠাণ্ডা। আমি এতোক্ষণ একাই ছিলাম। বিমলবাবু আর ফরিদ সাব চলে গেছেন অনেকক্ষণ হলো। আমি হাতে পাকা বাঁশের লাঠিটা নিয়ে অফিস ঘরের বারান্দায় বসে আছি। অন্ধকার নেমেছে ইতিমধ্যে। সামনে এসেই মনু মিয়া একগাল হাসল, 'বদিউল ভাই, আইজ তোমারে একখান জিনিস দেখামু!'

'কী?'

'এখন কমু না, তুমি আচানক হইয়া যাইবা।'

এ রকম কথাবার্তা শুনে আমার তেমন ভাবান্তর হলো না। এইসব চালাকি গল্পগুজব হচ্ছে দেরিতে আসার বিষয়টা আমি যাতে না ওঠাই, সেই জন্য। আমি গুল দিয়ে দাঁত মাজি। মনু মিয়া আমার পাশে বসে পড়ে। তারপর পিঠে হাত দিয়ে বলে, 'আইজ তোমার সাহস পরীক্ষা হইবো।'

আমি বাহাদুরী ঝাড়ার জন্য তেরচা চোখে মনু মিয়ার দিকে তাকাই, 'আমি কইলাম আট বৎসর যাবৎ রাইত চড়ায়া খাই।'

‘আচ্ছা, দেখা যাইবো নে।’ মনু মিয়া মৃদু হাসে। আমি একমনে দাঁত মাজি। মনু মিয়া অফিস ঘরের ভেতর থেকে তাঁর লাঠিটা আনতে যায়।

বারান্দায় বসে আরো অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে অফিসঘরে তালা দিলাম। বাইরের বারান্দায় একটা ছালা বিছিয়ে বিছানা পাতলাম। তারপর দুজনে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

স্টোরের সামনে একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে। আরেকটু পাওয়ারের লাইট কিন্তু লাগানো যায়। লাগাবে না। এটা ফরিদ সাবের কিপটামি। মালিক এসব ছোটখাটো বিষয়ের খবরও রাখেন না। বড়লোক মানুষ। গুলশানে বাড়ি। আমি গত দুই মাসে দুইদিন দেখেছি তাঁকে। ঝকঝকে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের দিকে ফিরেও তাকান নাই। ফরিদ সাবের সঙ্গে মিনিট দশেক, আরেক দিন মিনিট পাঁচেক কথা বলেই চলে গেছিলেন।

লাইটটা আরেকটু বেশি পাওয়ারের লাগালে কিন্তু জায়গাটা অনেক দূর থেকেও ফর্সা দেখা যায়। কারখানার গুদাম ঘরেরও একই অবস্থা। চারদিকের লাইটগুলি টিমটিমে। সহজে নজর খোলে না।

কারখানার গুদাম ঘরটার চারদিকে দুই চক্কর দিয়ে সামনের খোলা জায়গাটায় এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে হাইওয়ের গাড়ির লাইটগুলি দেখা যায়।

দুইজন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির রেখে যাওয়া একটা ট্রাকের একপাশে দাঁড়ালাম। জায়গাটা ট্রাকের ছায়ায় অন্ধকার। এখান থেকে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। এই ট্রাকে করে কাল ইট ডেলিভারি যাবে। মাঝে মধ্যেই লোডিং-এর জন্য খদ্দেররা ট্রাক রেখে যায়। মনু মিয়া এখানে দাঁড়িয়ে থাকল। আমাকে বলল, ‘বদিউল ভাই, তুমি স্টোরের দিকে যাও।’

আমি স্টোরের দিকে রওনা দিলাম। জানি, এরপর আমার ঘুমানোর পালা। আমি সেই দুইটা-আড়াইটার দিকে ঘুম থেকে উঠব, এরপর শুরু হবে মনু মিয়ার ঘুমানোর পালা। তখন আমি বাকি রাত জাগব।

স্টোরের কাছে চলে এলাম। স্টোরের পিছনে জঙ্গল ঘেঁষে যে জলাটা, তার পাড়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছে চারটে শিয়াল।

আমাকে দেখে মুখ তুলে তাকায়। আমি লাঠি উঠাই। শিয়ালগুলি নড়ে না। রাত্রিবেলায় ওদের চোখ লাইটের আলোর মতো জ্বলে। আমি কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসি। থাকগে শিয়াল।

মনু মিয়া বলে, 'যাও, তুমি এইবার ঘুমাওগা।'

আমি মনু মিয়াকে বলি, 'কী জানি দেখাইবা বলছিলা?'

'দেখামুনে সময় মতন।'

কী দেখাবে, তা জানার জন্য আর অপেক্ষা না করে আমি অফিসঘরের বারান্দার দিকে হাঁটা ধরলাম। বারান্দায় পৌঁছে সোজা ঘুমিয়ে পড়লাম পাতা বিছানায়। রাত দুইটা-আড়াইটা থেকে আবার আমার ডিউটি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, জানি না। হঠাৎ শরীরে কার হাতের ঠেলায় জেগে উঠি। তাকিয়ে দেখি, মুখের উপর মনু মিয়া তাকিয়ে আছে। আমি উঠে বসি, 'কী, কয়টা বাজে?'

'আরে তেনারা আসছে, দেখবা না?' মনু মিয়া আমাকে প্রশ্ন করে।

'কী দেখুম?'

'আরে তোমারে যে কইছিলাম, একটা জিনিস দেখামু!'

এবার আমার মনে পড়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা মনু মিয়া আমাকে একটা জিনিস দেখাবে বলেছিল। আমি বললাম, 'চলো, কী জিনিস তোমার...'

'আসো, তাড়াতাড়ি আসো।' মনু মিয়া তাগাদা দেয়।

আমি লাঠি হাতে বারান্দা থেকে আসি। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হাইওয়ের উপর জোরালো লাইট ফেলে রাতের গাড়িগুলি ছুটে চলেছে। আমরা খালি জায়গাটায় নামতেই দুটো শেয়াল আমাদের সামনে দিয়ে

চলে গেল কারখানার গুদামের দিকে।

মনু মিয়া খানিকটা ভয় মেশানো গলায় আমাকে সাবধান করে দিল, 'ভয় পাইও না কিন্তু।'

মনু মিয়া আমাকে হাঁটাতে হাঁটাতে কারখানার গুদাম ঘরের সামনে নিয়ে এলো। বাইরে থেকে তালা দেয়া। বিরাট পাল্লা দেয়া লোহার দরোজা। জং ধরে জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। মনু মিয়া আমাকে ইশারা করল ফুটো দিয়ে তাকাতে। আমি একটা বড়সড় ফুটোতে চোখ রাখলাম, ভিতরে যা দেখলাম, তাতে আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল।

গ্যাসের ফার্নেশটা জ্বলছে সমানে—ফুলকি দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের লাল আভা। সেখানে পাঁজায় পাঁজায় কাঁচা ইট ঢোকাচ্ছে তিন-চার জন দৈত্যাকার লোক। ঘামে সমস্ত শরীর ভেজা। আরেকটা লোক গরম ইট সাজিয়ে রাখছে ভাটা থেকে তুলে। দু'তিন জন আবার সেইসব ইট অন্ধকারের মধ্যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। লোকগুলোর সবার চোখ-মুখ পোড়া পোড়া। অস্পষ্ট। লালচে আভার আলোয় সবকিছু দেখে মনে হলো, ভিতরে তোলপাড় কাজকর্ম চলছে। হুলস্থূল ব্যাপার। কিন্তু শব্দহীন। মনু মিয়া পিঠে টোকা দেয়, 'চলো, এখান থেকে যাই!'

আমার হাত-পা জমে গেছে। ব্যাপারটা বুঝে মনু মিয়া আমাকে কতকটা জোর করে সেখান থেকে টেনে আনে। চারদিক অন্ধকার। দূরের রাস্তার গাড়ির শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কোনরকমে অফিস ঘরের বারান্দায় এসে বসলাম। আমার পা তখনো কাঁপছে। হঠাৎ পেটে মোচড় দিয়ে বমি আসতে লাগল।

দূর থেকে কারখানার গুদাম ঘরটার দিকে চোখ গেল। আমি মনু মিয়াকে বললাম, 'চলো, ভিতরে চলো।'

ভিতরে এসে কাঁপতে লাগলাম। মনু মিয়া বলল, 'ভয় পাইছোনি?'

'আমি একটু শুই, তুমি বসো। বাইরে যাইতে অইবো না।'

'নাহ্।' আমি মনু মিয়াকে ঘুমাতে বারণ করি।

জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখি, খালি জায়গাটার তিন-চারটে শিয়াল এসে জড়ো হয়েছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

আমার বারবার চোখ চলে যাচ্ছে কারখানার গুদাম ঘরটার দিকে। আমি সারারাত বসে রইলাম। সূর্য ওঠার একটু আগে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকাল এগারোটা। মাথা ভারি ভারি ঠেকছে। উঠে বসলাম। ফরিদ সাব এখনো আসেননি। বিমলবাবু গেটের টালিঘরের সামনে বিষণ্ন মনে দাঁড়িয়ে আছেন। নিত্যদিন যেমনটা থাকেন। লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে।

আমি প্রথমেই উঠে আস্তে আস্তে কারখানার দিকে হাঁটা দিলাম। দিনের আলো চারদিকে। কারখানার দরোজায় দাঁড়াতেই দেখি, গোটা পঞ্চাশেক লোক কাজ করছে। উপরের গাংমারির বিরাট ফাঁক দিয়ে দিনের আলো এসে গুদামটাকে আলোকিত করে ফেলেছে। কালকের সেই অনেক ইটের কোন চিহ্নও নেই। আমারও মনে হলো, সব বোধহয় স্বপ্ন।

আমি ফিরে এলাম। বিমলবাবু তখন অফিস ঘরের বারান্দায় একটা টুলের উপর এসে বসেছেন। মাল ডেলিভারি শুরু হলে তাঁর কাজ শুরু। আমি সামনের গিয়ে বললাম, 'দাদা, একটা কথা জিগাইতাম।'

'কী কথা?' বিমলবাবু জানতে চান।

'রাত্রে খারাপ জিনিস দেখলাম।'

'কী, কী দেখেছো?'

বিমলবাবুকে রাত্রের ঘটনাটা বললাম। তিনি মাথা নেড়ে বিষণ্ন গলায় বললেন, 'ঠিকই দেখছো—ওরা আসে প্রায় প্রতি রাত্রে, এই কারখানারই শ্রমিক। পাঁচ-ছ'বছর আগে গ্যাস বার্নার ব্লাস্ট হয়ে দশ-বারোজন শ্রমিক মারা যায়। সবাই বীভৎসভাবে পুড়ে যায়! ওরাই আসে রাতে। কাজ করে কারখানায়। পুরানো অভ্যাস ছাড়তে পারেনি।'

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'আমি আর চাকরি করুম না!'

আমি সেদিন বিকালেই ওই ইটাভাটার পাহারাদারের চাকরি ছেড়ে সাভার বাজারে আমার পুরানো জায়গায় চলে আসি।

সাভার থেকে নবীনগর যাওয়ার পথে বাস থেকে সিরামিক ইটের কারখানাটা দেখা যায়। কোন সময় কাজেকর্মে নবীনগর

গেলে, কারখানাটার দিকে তাকিয়ে থাকি, এখানে রাত্রিবেলায় কাজ করতে আসে প্রেতাত্মারা! ভাবলেই বুক কাঁপে।

অমাবস্যার রাতে

কিশোর বয়সের কিছু বিপদ আছে। উঠতে-বসতে তাদের ধমক খেতে হয় বড়দের কাছে। সবসময় ভেতরটা তাদের ফেটে পড়ে কৌতূহলে, কিন্তু বেশি কৌতূহল দেখাতে গেলেই 'পড়াশোনা সব গেল' বলে হাঁ হাঁ করে ওঠে বড়রা; কিংবা নিদেনপক্ষে চোখ গোল গোল করে 'এই ছোঁড়া, বেশি প্যাট প্যাট করিস না তো!' কিশোরেরা বুঝতে পারে অনেক কিছুই, কিন্তু সেটা বলতে গেলেই ঝামেলা। এই তো আজই বলতে গিয়ে একটা ধমক খেল দেবাশীষ।

সে গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র। বেশ ভাল ছাত্র হিসেবে ভালবাসে সে ক্রিকেট খেলা দেখতে, আবৃত্তি করতে আর গল্পের বই পড়তে। বিশেষ করে, ভূতের গল্প। বইয়ে ভূতেদের নানা রকম কাহিনী পড়ে সে মনোযোগ দিয়ে, কারও মুখে ভূতের গল্প শুনলেও শুনতে শুনতে তার চোখ হয়ে যায় বড় বড়। এই ভূতের গল্প শোনার লোভেই সে সুযোগ পেলেই যায় তার রঞ্জিতদার কাছে। রঞ্জিত বসাকপাড়ায় তাদের কটা বাড়ির পরেই থাকে। সে-ও গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিল, বর্তমানে মেডিকেল শেষ বর্ষে পড়ছে। তুখোড় ছাত্র, তাই যতক্ষণ তার সঙ্গে থাকছে, সে যে ছেলেই থাকুক, বসাকপাড়ার সব বাবা-মার কাছে তার সাত খুন মাফ। মাঝেসাঝে ছুটি কাটাতে বাড়ি আসে রঞ্জিত, আর তার আসার সংবাদ পেলেই দেবাশীষ ছুটে যায় তার বাড়িতে।

দেবাশীষদের বয়সের ছেলেকে প্রশ্রয় দেয় না প্রায় কেউই। বয়ঃসন্ধিক্ষণের দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তনটাকে বড়রা কেন যেন মেনে নিতেই পারে না। তারা ভুলে যায় যে এরকম সময় একদিন তাদেরও পেরিয়ে আসতে হয়েছে।

আজ সকালে উঠেই সে শুনেছে রঞ্জিতদা এসেছে। তাই স্কুল ছুটির পর বাড়িতে বই-খাতা রেখেই ছুটে গেল সে রঞ্জিতের কাছে। তাকে মুড়ি দিয়ে নিজেও মুড়ি চিবোতে চিবোতে রঞ্জিতও শুরু করল ভূতের গল্প। গল্পের এক পর্যায়ে সে বলল, 'তিনটে অস্ত্রের কাছে ভূতেরা কাবু।'

'কী কী অস্ত্র, রঞ্জিতদা?'

'আগুন, বেত আর লোহা।' রঞ্জিত জবাব দিল।

'কেন?' আবার প্রশ্ন দেবাশীষের।

'আগুনকে ভয় করে তারা নিজেরাই আগুনের তৈরি বলে।'

'আর?'

'বেতকে ভয় করে বেতের বাড়ি তারা এড়াতে পারে না বলে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ভূতেরা তো অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে। এই ধর, তোর পাশে বসেই একটা ভূত মুড়ি খাচ্ছে, তুই টেরও পাবি না।'

চমকে উঠে দেবাশীষ তাকাল তার মুড়ির থালার দিকে, আর তার এই ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল রঞ্জিত।

'আরে না রে,' বলল সে। 'আজকাল ভূতেদের রুচিও খুব বেড়েছে। সেকেলে ভূতের মতো তারা আর মুড়ি-টুড়ি খায় না, মাংসের চপ হলে তবু কথা ছিল।'

রঞ্জিতের এই পরিবেশ তরল করে ফেলাটা দেবাশীষের ঠিক পছন্দ হলো না। গম্ভীর মুখে সে বলল, 'বেতকে কেন ভয় করে, সেটা কিন্তু বললে না তুমি।'

'বেশ,' যেন বুঝিয়ে বলার জন্যই নড়েচড়ে বসল রঞ্জিত। 'ধর, তুই একা একা রাতে বাড়ি ফিরছিস, এমন সময় একটা ভূত তোর নাকে একটা ঘুষি মারল। তুই তো লাফিয়ে উঠবি "আঁউ" করে, কিন্তু ভূতটাকে পাল্টা আঘাত করার কোনও সুযোগ তোর নেই। যাকে চোখেই দেখতে পাচ্ছিস না, তাকে মারবি কিভাবে? আমার কথা বুঝতে পারছিস?'

মাথা হেলাল দেবাশীষ, বুঝতে পেরেছে।

'কিন্তু সে সময় যদি তোর হাতে একটা বেত থাকে, আর সেই বেত যদি চালাস সাঁই করে, তাহলে বাড়ি খেয়ে ভূতটাই লাফিয়ে

উঠবে “আঁউ” করে। অবশ্য সেই চিৎকার তুই শুনতে পাবি না। ভূতেদের চিৎকার শুনতে পায় না মানুষ।’

এবার দেবাশীষও মজা পেতে শুরু করেছে। মুখ হাসি হাসি করে বলল, ‘আর লোহা ভয় পায় কেন?’

‘ওই, ভয় পায় আর কি,’ বিড়বিড় করতে লাগল রঞ্জিত।

‘তার মানে, এটা তুমি জানো না।’

‘এই ছোঁড়া তো বেজায় প্যাট প্যাট করে,’ ধমকে উঠল রঞ্জিত।

হঠাৎ ধমক খেয়ে অবাক হলেও কিছুটা লজ্জাও পেল দেবাশীষ। এভাবে রঞ্জিতদাকে বলাটা তার বোধহয় ঠিক হয়নি।

একটা সত্যি ভূত দেখার দেবাশীষের খুব শখ। ভয় পাক আর না-ই পাক, খুবই ইচ্ছে তার, অন্তত একটা ভূত যেন তাকে দেখা দেয়।

ভূত সম্বন্ধে তার এই কৌতূহল নিয়ে পলি, তিথিরাও হাসাহাসি করে। তাদের গ্রাম আর স্কুল নদীর এপার আর ওপার। ছোট যমুনার পশ্চিমপাশে তাদের গ্রাম বসাকপাড়া আর পুবপাশে গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ছোট যমুনার ওপর ছোট একটা সেতু। সেই সেতু পেরিয়ে সে, পলি আর তিথি বসাকপাড়া থেকে একসঙ্গে পড়তে যায় স্কুলে। ছুটির পর আবার ফিরেও আসে একসঙ্গেই।

এই তো গত সপ্তাহেই স্কুলের পথে এগোতে এগোতে টিপ্পনী কাটল পলি, ‘জানিস দেবা, গত রাতে আমি একটা ভূত দেখেছি। ঠিক তোর মতো সাদা একটা শার্ট আর নেভি ব্লু একটা প্যান্ট পরেছিল।’

‘ভূতদের নিয়ে অত ঠাট্টা নয় বুঝলি,’ বলল দেবাশীষ বসাক মুখ কালো করে, ‘যেদিন জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে নাকে চিমটি কাটবে, সেদিন বুঝবি মজা।’

‘তিথি, বুড়ো খোকার কথা শুনেছিস?’ খিলখিল করে হাসতে লাগল পলি। ‘সবসময় তো ভূত ভূত করিস, চিমটি যদি কাটে তোকেই কাটবে, যে ফর্সা নাক তোর, ভূতের চিমটি খেয়ে একেবারে লাল টকটকে হয়ে যাবে!’

ততক্ষণে খুকখুক করে হাসতে শুরু করেছে তিথিও। বলল, 'বাবার কাছে শুনেছি, ভূত নাকি নানা জাতের আছে। তাদের মধ্যে একটা জাত হলো—সুড়সুড়ি ভূত। সুযোগ পেলেই মানুষের পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয়। চন্দনের তো ভূত দেখার খুব শখ, আমার মনে হয় দেখা দিলে একটা সুড়সুড়ি ভূতই দেখা দেবে ওকে। ও যখন পড়তে বসবে, পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়ে বিরক্ত করবে।'

এবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল তিথি আর পলি। ওদিকে রাগে গা জ্বলে গেল দেবাশীষের। মুখে কিছু বলল না সে, কিন্তু গজরাতে লাগল ভেতরে ভেতরে, 'একটা ভূতের দেখা আগে পেয়ে নিই, তাহলে বজ্জাতগুলো আর হাসার সুযোগ পাবে না।'

প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পরপরই ঘোর বর্ষা নামল। তাদের ক্লাসেরই বসাকপাড়ার একটা ছেলে, শুভ একদিন ফিসফিস করে বলল, 'এই দেবা, মাছ ধরতে যাবি? খুব মাছ হচ্ছে ত্রিমোহনীর খাঁড়িতে।'

গয়েশপুর গ্রামের পাশেই বিশাল ঘুকসি বিল। গয়েশপুর থেকে শুরু হয়ে ষোলো-সতেরো মাইল পেরিয়ে সোজা চলে গেছে ভারতে। শুকনো সময়ে বিলটায় খুব একটা পানি থাকে না। কিন্তু ফুঁসে ওঠে বর্ষায়। বিলের পুব-দক্ষিণ কোণায় একটা খাঁড়ি এসে মিলেছে ছোট যমুনার সঙ্গে। খাঁড়িটা একরকম শুকনোই থাকে, কিন্তু বর্ষার সময় সেদিক দিয়ে তোড়ে পানি এসে পড়ে ছোট যমুনায়। এই জায়গাটা থেকে খানিকটা সামনেই ছোট যমুনা বয়ে গেছে তিন দিকে। তিনটে মোহনা এসে মিলিত হবার ফলে সেখানকার নাম—ত্রিমোহনী।

কিশোরেরা প্রায় সবসময়েই কৌতূহলে টগবগ করে ফোটে, শুভর কথা শোনামাত্র তাই লাফিয়ে উঠল দেবাশীষ। 'কবে যাবি?'

'আজ রাতেই চল না।'

মাছ ধরার খুব একটা অভ্যাস নেই দেবাশীষের। কেবল কোঁচ দিয়ে একটু-আধটু মাছ গাঁথতে পারে। কিন্তু সে ওসব নিয়ে

মাথা ঘামাল না। তার কাছে মাছ ধরাটা খুব বড় বিষয় নয়। একটা অ্যাডভেঞ্চার করা যাবে, সেটা আসল কথা। তাই বলল, 'চল, কখন যাবি?'

'তুই তৈরি হয়ে থাকিস,' বলল শুভ। 'ঠিক রাত এগারোটায় শেয়াল ডাকবে তোর জানালার কাছে, বেরিয়ে আসবি সঙ্গে সঙ্গে।'

রাতে মাছ ধরার ব্যাপারটা এমনই উত্তেজনা জাগাল দেবাশীষের মনে যে, মুখে কোনও জবাবই দিতে পারল না সে, সায় দিল কেবল মাথা হেলিয়ে।

শুভ চলে যাবার পর একটা কথা ভেবে সামান্য অস্বস্তি বোধ করল দেবাশীষ। আজ রাত অমাবস্যার রাত। পরক্ষণেই চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল সে। সঙ্গে শুভ থাকবে, সে তো আর একা যাচ্ছে না।

সারাদিন চুপিচুপি প্রস্তুতি নিল সে। তার বাবা বৈদ্যনাথ বসাক খুব মেজাজী মানুষ। এমনিতে ভালই থাকেন, তবে রেগে গেলে একেবারে অগ্নিমূর্তি। যা-ই হোক, মাছ ধরার এই চরম উত্তেজনা দমন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে ভাগ্য একদিক দিয়ে সুপ্রসন্ন তার, আজ বিকেলে রঞ্জিতদা আসবে। অবস্থা বেগতিক দেখলে সে সোজা গিয়ে উঠবে রঞ্জিতদার বাড়িতে, তারপর রঞ্জিতদা-ই সব সামলাবে। এদিকে আবহাওয়াও খুব ভাল। ক'দিনের অবিরাম বর্ষণের পর গতকাল থেকে আকাশ একদম পরিষ্কার।

কোঁচের শিকগুলো র‍্যাদা দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষে ডগার সব মরচে তুলে ফেলল সে। একটা বেত জোগাড় করে রাখল আর লণ্ঠন বাবারটাই নেবে বলে স্থির করল।

ভূতের বিরুদ্ধে কার্যকরী তিনটে অস্ত্রই নেয়া যাচ্ছে দেখে মনে মনে খুশি হলো দেবাশীষ। ১) বেত, ২) লণ্ঠনের আগুন আর ৩) কোঁচের শিক তো লোহারই তৈরি।

সারাদিনের ছটফটানির শেষে সন্ধ্যে নামল গাঢ় হয়ে। সময় যতই এগোল, রাত হলো নিকষ। খুব মনোযোগী ছাত্র সে, কিন্তু

আজ কোন পড়াই তার মাথায় ঢুকল না। জানালার পাশে বসে রইল দেবাশীষ উৎকর্ণ হয়ে। গ্রামের রাত। নয়টা বাজতেই তাদের বাড়ি একেবারে নিশুতি হয়ে গেল। দশটা বাজতে আশপাশেও আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সাড়ে দশটার পর থেকে একেবারে অস্থির হয়ে উঠল দেবাশীষ। খুট করে একটা শব্দ হলেই, কিংবা একটা ঝিঁঝি পোকা ডাকলেই চমকে চমকে উঠতে লাগল সে।

বাজল রাত এগারোটা। কিন্তু কই, শিয়াল তো ডাকে না! সোয়া এগারোটা বাজতে মনে মনে শুভকে গালি দিতে লাগল সে। একেকটা মিনিট কাটতে লাগল একেকটা বছরের মতো। এগারোটা বিশ-একুশ-বাইশ-তেইশ আর তখনই—

হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া হুয়া হুয়া।

থপাস করে বইটা বন্ধ করেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল দেবাশীষ। হাসি পেল তার। শুভটা পারেও, কে বলবে যে একটা মানুষ শেয়ালের ডাক নকল করছে।

ঘরের এক কোণ থেকে লণ্ঠন, দেয়াশলাই, বেত আর খাটের নিচে লুকিয়ে রাখা কোঁচটা নিয়ে, ঘরে শেকল তুলে দিয়ে, চুপিসারে বেরিয়ে এল সে বাড়ির বাইরে।

কয়েক ধাপ এগোতেই অন্ধকারে মিশে থাকা শুভ বলল, 'চন্দন?'

'হু,' জবাব দিল সে শুভর মতোই চাপা স্বরে।

'চল।'

বসাকপাড়া ঘিরে থাকা নিবিড় বাঁশবন পেরিয়ে দু'বালক এগোতে লাগল নদী অভিমুখে। হাঁটতে হাঁটতেই লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিল দেবাশীষ। আর তাই দেখে প্রায় ধমকে উঠল শুভ, 'লণ্ঠন আবার কী হবে?'

'লণ্ঠন নেব না, বলিস কী রে?' অবাক হলো দেবাশীষ। 'অন্ধকারে হোঁচট খেলে তখন?'

'হোঁচট খাবি না ছাই হবে,' গজগজ করতে লাগল শুভ, 'এ তো চেনা রাস্তা।'

ছোট যমুনার তীরে এসে উঠে পড়ল তারা গয়েশপুরের আবদুল মাঝির ডিঙিতে। গাঢ় কালো স্রোত বয়ে চলেছে কলকল করে। তবে চিন্তার কিছু নেই। শুভ পাকা মাঝি। কাজ চালানোর মতো বৈঠা সে নিজেও ধরতে পারে।

ডিঙি এগোতে আবার গজগজ করতে লাগল শুভ, 'তোর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধে যাচ্ছিস। লণ্ঠন, বেত, কোঁচ, নেয়ার মতো আর কিছু ছিল না?'

আবারও অবাক হলো দেবাশীষ। 'বা রে, সাপ-টাপ কত কী থাকতে পারে, তাই বেত নিলাম। আর কোঁচ নেব না, তাহলে মাছ ধরব কী দিয়ে?'

'আমি কিচ্ছু নেইনি,' বলল শুভ। 'খাঁড়ি দিয়ে যেখানে মাছ নামে, সেখানে তো পানি এক হাঁটুর চেয়েও কম। ওই পানিতে হাত দিয়েই মাছ ধরা যায়।'

'তুই সব সময় মাছ ধরিস। তোর কথা আলাদা। আমি কোঁচ ছাড়া মাছ ধরতে পারি না।'

ডিঙি গিয়ে ভিড়ল ওপারে। তীরের ওপর ডিঙি বেশ খানিকটা টেনে তুলে রওনা দিল শুভ, পেছনে পেছনে দেবাশীষ।

আট-দশ ধাপ যেতেই জোর একটা বাতাস উঠল। দপদপ করতে লাগল লণ্ঠনটা। সেটা কোনরকমে সামলে সামনে তাকাতেই আঁতকে উঠল দেবাশীষ। শুভ নেই!

'শুভ, শুভ!' ভাঙা শুকনো গলায় ডাকতে লাগল সে। আবার জোর একটা বাতাস বইল, দপ করে উঠেই নিবে গেল লণ্ঠনটা। আকাশের দিকে তাকাল দেবাশীষ। দিগন্ত বিস্তৃত ডানা মেলে যেন ঝুলে আছে প্রকাণ্ড এক কালো বাদুড়। যেকোন সময় ছোঁ মেরে নেমে আসবে নিচে। বেশ কয়েকটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি নষ্ট করার পর লণ্ঠনটা ধরিয়ে আবার শুকনো গলায় ডাকল সে, 'শুভ, শুভ!'

'এই তো আমি,' কথা ভেসে এল পেছন দিক থেকে, 'এত চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'তুই তো সামনে ছিলি, পেছনে গেলি কখন?'

‘পায়ে শামুক ফুটেছে।’

আবার এগোতে লাগল দু’বন্ধু। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পৌঁছল খাঁড়ির ধারে। ডানপাশে বর্ষার বিশাল ঘুকসি বিল। গাঢ় অন্ধকারে তার জলরাশিকে মনে হচ্ছে, উপুড় হয়ে আছে যেন প্রাগৈতিহাসিক কোন নাম না জানা অতিকায় দানব।

বিল থেকে খাঁড়ি দিয়ে তোড়ে পানি নামছে ছোট যমুনায়। লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখার পরপরই কোঁচে মাঝারি একটা শোল গেঁথে উল্লসিত হয়ে উঠল দেবাশীষ। ‘এই শুভ, তুই নাকি খালি হাতেই মাছ ধরবি, নাম না পানিতে।’

‘নামব,’ জবাব ভেসে এল ফ্যাঁসফেঁসে গলায়। সামান্য অবাক হলো দেবাশীষ, শুভর গলা তো এরকম নয়। কিছু একটা বলতে চাইল সে, আর ঠিক তখনই আবার বয়ে গেল দমকা বাতাস। দপদপ করতে করতে আবার নিবে গেল লণ্ঠন। গাঢ় অন্ধকারে চোখ কিছুটা সয়ে আসতেই তাকাল সে পাশে। শুভ নেই! তাড়াহুড়ো করে পকেট থেকে বের করতে গিয়ে, হাত ফসকে দেয়াশলাইটা পড়ে গেল পানিতে।

এই সময় খনখন করে হেসে উঠল কে যেন। এটা তো শুভর হাসি নয়! সড়সড় করে মাথার সব চুল দাঁড়িয়ে গেল দেবাশীষের। হঠাৎ উথাল-পাথাল হতে লাগল খাঁড়ির পানি। পানি তোলপাড় করছে বিরাট কোন মাছ, খুব সম্ভব বোয়াল। ঘুকসি বিল যখন কানায় কানায় ভরে যায় পানিতে, বিরাট সব বোয়াল যেন এসে উপস্থিত হয় কোত্থেকে।

অন্ধকারেই শুকনো গলায় ডাকল দেবাশীষ, ‘শুভ, এই শুভ!’ কোন সাড়া নেই।

আবার কে যেন হাসল খনখনে সেই হাসি। সামনের মাছটা এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। খুব বড় হবার কারণে মাছটা কি আটকে গেছে খাঁড়ির অগভীর পানিতে, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে তাই নামতে চাইছে নদীতে?

মাথার ভেতরে ঝলকে ঝলকে চিন্তা বয়ে গেল দেবাশীষের। খুব করে মনে পড়তে লাগল বাবা-মার কথা। যত রাগী মানুষই হোন বাবা, সবরকম বিপদে কেমন আগলে থাকেন তাদের সবাইকে।

বুকের গহীনে দেবাশীষ যেন স্পষ্ট শুনতে পেল বাবার স্বর, ‘চন্দন, ঘাবড়ে যাস না, বাবা। সামনে ভীষণ বিপদ। মাথা ঠাণ্ডা

রাখ, বাবা।’

আর এই সময়েই একটা জিনিস লক্ষ করে কেঁপে উঠল দেবাশীষের অন্তরাত্মা। মাছটা নদীতে নামার চেষ্টা করছে না। একবার এগোচ্ছে ওটা, আবার পিছিয়ে ফিরে আসছে তার কাছে।

বুকের ভেতরে বসে আবার যেন সাহস জোগাল বাবা। ঝট করে কোঁচ তুলল সে মাথার ওপরে। কিন্তু এতবড় মাছের বিপক্ষে এই কোঁচ নিতান্তই হাস্যকর। মাছটা এখন তার একেবারেই মুখোমুখি, যেন যে কোন মুহূর্তে লাফিয়ে উঠবে তীরে।

সর্বশক্তি দিয়ে কোঁচ চালাল দেবাশীষ। থ্যাচ করে ভোঁতা একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে পানির ভেতর থেকে ভেসে এলো রক্ত হিম করা এক আর্তনাদ। ছটফট করতে লাগল মাছটা। কোঁচ প্রায় ভাঙার জোগাড়। তবু ঠেসে ধরে রইল দেবাশীষ।

ক্রমে কমে এল ছটফটানি, আর্তনাদ পরিণত হলো গোঙানিতে, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল একসময়। রাত আবার সেই আগের মতোই গাঢ়, কালো, নিঃশব্দ।

ছুটতে লাগল দেবাশীষ। এক হাতে তার নেবানো লণ্ঠন, আরেক হাতে কোঁচ। কোঁচের ডগায় কোন মাছ গেঁথে নেই। তবু বেশ ভারী ঠেকছে, নিকষ অন্ধকারে সে ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

ডিঙিটা এক ধাক্কায় পানিতে নামিয়েই বৈঠা চালাল সে প্রাণপণে। প্রয়োজন খুব বড়মাপের শিক্ষক। মুহূর্তে মাঝারি থেকে দেবাশীষকে সে রূপান্তরিত করে ফেলল পাকা মাঝিতে। নদী পার হতেই বৈঠাটা রেখে কোঁচ আর লণ্ঠন তুলে নিল দেবাশীষ। তারপরই ছুটল পড়িমরি করে। ডিঙিটা যে পাক খেতে খেতে চলে গেল নদীর মাঝখানে, লক্ষ করল না।

বাড়ি যাবার সাহস পেল না সে। তাই গেল তার রঞ্জিতদার বাড়ি। চাপা গলায় ডাকল, ‘রঞ্জিতদা, রঞ্জিতদা।’

রঞ্জিতের ঘুম খুব পাতলা। বলল, ‘কে রে?’

‘আমি, দেবাশীষ।’

‘চন্দন?’

‘হু।’

এবার তড়াক করে বিছানা ছেড়ে, বাড়ির বাইরে এসে রঞ্জিত বলল, ‘কী ব্যাপার রে, এত রাতে?’

‘মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।’

তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল রঞ্জিত। তারপর তার হাত থেকে কোঁচ আর লণ্ঠনটা নিয়ে, উঠোনের এক কোণে রেখে নিয়ে গেল তাকে ঘরের ভেতরে।

‘কার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিলি?’

‘শুভর সঙ্গে।’

‘কার সঙ্গে বললি?’ মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রঞ্জিতের স্বর।

‘শুভর সঙ্গে,’ বলল সে আবার। ‘দেখো না রঞ্জিতদা, অন্ধকারে আমাকে একা ফেলে পালিয়ে এসেছে শয়তানটা।

কিন্তু রঞ্জিত এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। বিড়বিড় করে বলল, ‘হুঁ, এজন্যই বজ্জাতটা জ্বরের মধ্যেও “আমার কাজ আছে, আমার কাজ আছে” করছিল।’ মিনিট চারেক পর দেবাশীষকে রঞ্জিত নিয়ে গেল ঘরের আরেক পাশে। কোণে টিম টিম করে জ্বলা লণ্ঠনটার আলো বাড়িয়ে তুলে ধরল ওপরে।

নিজের চোখকে যেন দেবাশীষ বিশ্বাস করতে পারল না। খাটের ওপর শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে শুভ। মাথায় জলপট্টি।

‘গত রাতে আমি বাড়ি আসার ঘণ্টাখানেক পরেই একটা অঙ্ক বুঝে নিতে এল শুভ। অঙ্কটা বোঝাতে বোঝাতে হঠাৎ গা কাঁপিয়ে জ্বর এল ওর। দেখতে দেখতে সে জ্বর বেড়ে গেল খুব। এবার আমি সঙ্গে করে কোন ওষুধ আনিনি, তাই ননীবাবুকে ডেকে ওকে ওষুধ খাওয়ালাম। সংবাদ পাঠালাম ওদের বাড়িতে। ও-র বাবা-মা এল। কিন্তু আমি ওকে যেতে দিতে চাইলাম না। মাথায় পানি ঢেলে জলপট্টি দিতে দিতে মা-ও বলল, “আজ ছেলেটা এখানেই থাক।” শেষমেষ জ্বর কমতে, এই তো কিছুক্ষণ আগে, চলে গেল ওর বাবা-মা। তারপর আমি ঘুমাতে না ঘুমাতেই এসে ডাক দিলি তুই।’

শুনতে শুনতে মাথার চুল আবার দাঁড়িয়ে গেল দেবাশীষের। 'এবার বুঝতে পেরেছিস?' বলল রঞ্জিত। মুখে কথা ফুটল না, কেবল ওপর নিচে মাথা দোলাল সে। বুঝতে কিছুই আর বাকি নেই তার।

থরথর করে কাঁপতে থাকা ছেলেটাকে বুকে টেনে নিল রঞ্জিত। প্রচণ্ড আতঙ্কের পর এই পরম স্নেহের পরশ পেয়ে ফোঁপাতে লাগল দেবাশীষ। মিনমিন করে বলল, 'বাবা খুব রাগ করবেন, তাঁকে না বলে গেছি।'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে,' একটা গামছা এগিয়ে দিল রঞ্জিত। 'এখন গা-মাথা মুছে শুবি চল।'

গা মাথা মুছল দেবাশীষ, তারপর পরল রঞ্জিতেরই একটা শার্ট আর লুঙ্গি। কেবল শুতে যাবে সে, এমন সময় রঞ্জিত বলল, 'একটু বাইরে চলতো।'

শুভর কপালে আলতো করে একটা হাত ছুঁইয়ে সে বলল, 'না, আর জ্বর নেই।' তারপর লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল উঠোনে, পেছনে পেছনে দেবাশীষ।

উঠোনের এককোণে পড়ে আছে দেবাশীষের কালিমাখা নেবানো লণ্ঠন, কিন্তু তার পাশে পড়ে থাকা কোঁচটার দিকে তাকাতেই বিস্ফারিত হয়ে গেল দুজনের চোখ।

কোঁচের শিকগুলোর ডগায় গেঁথে আছে কঙ্কালের আস্ত একটা মুণ্ডু!

খসরু চৌধুরী

নিশি আতঙ্ক

এক

কৃষ্ণপক্ষ চলছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। আকাশজুড়ে যখন তারার মেলা বসে তখন চারদিকের সবকিছু আবছা হলেও দেখা যায়। কিন্তু আজ আকাশে তারাও দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণ একটা গুমোট ভাব ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই শুরু হলো দমকা বাতাস। ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে হাত দশেক বিস্তৃত এক দীর্ঘ রাস্তায় কোনো জনমানুষ নেই। অন্য দিন রাস্তায় একটা-দুটো গরুর গাড়ি দেখা যেত। টিমটিমে হারিকেন জ্বালিয়ে ক্যাঁচক্যোঁচ শব্দ করে চলে। আজ তাও নেই। হঠাৎ করেই শরীরটা ছমছম করে উঠলো মঙ্গল শেখের। সে ইলিশ মাছ ঝুলানো দড়িটা শক্ত করে ধরলো। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে পথ চলতে লাগলো। বাতাসের তীব্রতা বেড়ে গেলো অনেকগুণ। তার কাঁধের গামছাটা উড়িয়ে নিয়ে গেলো বাতাস। মঙ্গলের বয়স চৌদ্দ কি পনেরো হবে। বয়স যেমনই হোক, তার সাহস আছে বুকভরা। সেই মঙ্গলের বুকটা আজ কেন যেন কেঁপে উঠলো।

বাবার সাথে সে গিয়েছিল রূপা ভাঙার হাটে। হাটে গিয়েই শুনল কবিয়াল গান হবে। তাই তার বাপ খবির শেখ তার হাতে একটা বড় ইলিশ মাছ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মঙ্গল বাপ তুই বাড়ি যা। তোর মায়রে কবি আমি রাইতের কবি গান শুইনা পরদিন সকালে বাড়িতে আসমু। কত হাটুরে লোক বাড়ি ফিরবো, তাগো লগে তুই যাগা। যাইতে পারবি তো?'

তখন বেলা শেষ। সন্ধ্যা হয় হয়। তার বাপ তাকে দুটো গোলগোলা কিনে দিল আর হাতে ধরিয়ে দিল টর্চ। মঙ্গল এক দল বাড়িফেরা লোকের সঙ্গে রওনা দিল বাড়ির দিকে। মাইলখানেক আসার পর, লোকগুলো অন্য রাস্তায় মোড় নিল, তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত নেমেছে। আর তখনই মঙ্গল হয়ে গেল একা। তবু তার বুকভরা সাহস আছে। সে একাই পদ্মপুকুর সাঁতরে পার হতে পারে। তরতর করে শিমুল গাছে উঠে সে নামিয়ে আনে পাখির ছাঁ। আজ তবু তার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। চারদিকে নির্জন কালো অন্ধকার। শুধু যেখানে টর্চের আলো পড়ে সেটুকু পরিষ্কার। বাতাসের প্রকোপটা কমছে না। কোথাও মটমট

আওয়াজে গাছের ডাল ভাঙলো।

পথ যেন শেষই হতে চায় না। বাড়ি আরো এক মাইলের পথ। টর্চটা একবার নিভাচ্ছে, একবার জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে। এভাবে জ্বালাতে-নিভাতে তার বাপজান তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। তা-না হলে নাকি ব্যাটারি তাড়াতাড়ি ডাউন হয়ে যায়। তার অনেক দিনের শখ ছিল ইলিশ মাছের ভাজা খাবে। এই ইলিশটায় যদি চপচপিয়ে তেল উঠে, তার মা সে তেল কড়াই থেকে তুলে বাটিতে রেখে দেবে। তারপর ইলিশের তেল দিয়ে লাল করে ভাত মেখে মচমচে ইলিশ ভাজা দিয়ে ভাত খেতে কি মজা। তখন একটা কাঁচামরিচ অবশ্যই থাকতে হবে।

আবার টর্চ জ্বালালো মঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো। জ্বলজ্বলে জ্বলন্ত সবুজ চোখে একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী তাকিয়ে আছে। কলজেটা লাফিয়ে উঠল। ওটা আসলে একটা শেয়াল! কুচকুচে কালো শরীর। টর্চের আলো শেয়ালের চোখের ওপর পড়তেই বার কয়েক মিট মিট করল টর্চের আলো, তারপর নিভে গেল ওটা। অনেক চেষ্টা করেও আর জ্বালানো গেল না। বাল্ব বোধহয় ফিউজ হয়ে গেছে। দাঁড়িয়েই থাকলো সে অমঙ্গলের আশঙ্কায়। সামনে থেকে একটা গড়গড় শব্দ ভেসে এল! তার পরই লাফ দিলো ওটা...।

খবির শেখ যখন বাড়ি পৌঁছলো তখন সকাল আটটা বাজে। বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কি এক আশঙ্কায় তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। তার বউ, মঙ্গলের মা উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে আছে। চুল এলোমেলো। খবির শেখকে দেখেই দৌড়ে এসে বলল,—

‘তুমি আসলা? আমি তো ডরাইয়া শেষ। কি জানি কি হইল। রাইতে আসো নাই কেন কও তো? সারা রাত ঘুমাইতে পারি নাই। যারেই তোমাগোর খবর নিতে কইলাম কেউ যাইতে রাজি হয় নাই। এদিকে রাইতেও তো ছিল উতাল-পাতাল হাওয়া, ভাবলাম অঘটন ঘটল নাকি। আমার মঙ্গল কই?’ ছ্যাঁৎ করে উঠলো খবির শেখের বুক। প্রায় চিৎকার করে সে বলল,—

‘কি কও? রাইতে মঙ্গল আসে নাই?’

মঙ্গলের মা বলল,—‘আসে নাই মানে? মঙ্গল কেমনে আইবো?’

খবির শেখ বলল,—'আমি তারে একটা ইলিশ মাছ কিইন্যা দিয়া বাড়িতে পাঠাইয়া দিছি। আমি থাইকা গেছি কবি গান শুনতে।'

'ও-আল্লারে আমার মঙ্গলের কি হইল রে...।' বলে চিৎকার করে মাটিতে শুইয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেছে। ধপ করে বসে পড়ল খবির। প্রতিবেশী দু'একজন মহিলা এসে মঙ্গলের মা'র জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়ালো খবির শেখ। দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে লাঠিটা নিয়ে এল। সাথে আরও দু'জনকে নিল। ওদের হাতেও লাঠি, রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা ভালো করে জঙ্গলের দিকে নজর রাখতে রাখতে চলল।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। তবে ওদের ধারণা, মঙ্গল নিশ্চয় পথ ভুল করে জঙ্গলে ঢুকে গেছে বাতাসের দাপটে। এখনো হয়তো জঙ্গলেই আছে। চিৎকার করে তিনজনেই তার নাম ধরে পালা করে ডাকতে থাকল। কিন্তু কোনো সাড়া মিলল না। জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলল ওরা। আরো অনেকক্ষণ পর একটা ঝোপের উপর মঙ্গলের গামছাটা পাওয়া গেলো। ওটা বুকে চেপে ধরে হঠাৎ কেঁদে উঠলো খবির শেখ। প্রতিবেশী চিনু মিয়া প্রস্তাব দিল,—

'চলো, আমরা তিনজনে তিন দিকে যাই। আধ ঘণ্টা পর তিনজনেই আবার এই ঝোপের কাছে মিলিত হমু। কি কও?'

তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। এখানকার জঙ্গল সত্যিকার অর্থেই গভীর। ঝোপঝাড়, গাছপালায় ঠাসা। লতানো গাছে প্রায় চলা দায়। মাটিতে হঠাৎ কি একটা চকচক করতে দেখল খবির শেখ। নিচু হয়ে দেখল মঙ্গলের টর্চটা। হাতে তুলে নিল ওটা। কাঁচটা ফাটা। আরো সামনে এগিয়ে গেল সে। একটা সাপ তার সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেল। কালো চকচকে শরীর। কিন্তু সেদিকে নজর দিল না খবির শেখ। চারপাশে খুঁজতে থাকল। কিন্তু কোথাও তার ছেলে নেই। চিৎকার করে সে মঙ্গলের নাম ধরে ডাকতে থাকল কিন্তু সাড়া পেল না। আরো আধঘণ্টার মতো খুঁজে সে ফিরে এল সেই ঝোপটার কাছে। আরও দুজন কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল। একটু পরেই ঝোপঝাড় ভেঙে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসতে লাগল চিনু মিয়া, 'খবির শেখ, ও খবির শেখ।'

দৌড়ে এসে হাঁপাতে লাগল সে। তারপর বলল,—

'তোমার পোলারে পাওয়া গেছে। ঐখানে তেঁতুল গাছটার তলায়।'

'আমারে তাড়াতাড়ি নিয়া চল,' —খবির শেখ বলল।

চিনু মিয়া বলল,—'কিন্তু কথা হইল কি...'

খবির শেখ বলল, 'কিন্তু-টিন্তু নাই চল।'

দুই

দৌড়াতে থাকল ওরা। চিনু মিয়া আগে পৌঁছুল। পেছন পেছন ওরা। খবির শেখ দেখল, তেঁতুল গাছের তলায় হাত-পা ছড়িয়ে পরে আছে তার ছেলে। গলার টাটকা রক্তে ভেসে গেছে। প্রচণ্ড আক্রোশে কোন প্রাণী তার ছেলের কণ্ঠনালি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে।

'ম-ঙ-গ-ল-রে-।' বলে একটা চিৎকার দিয়েই জ্ঞান হারাল খবির শেখ।

মঙ্গলের দাফন সম্পন্ন করতে করতে বিকেল হয়ে গেছে। সমস্ত গ্রামে অজানা জন্তুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। রাতের রাস্তা বিরান হয়ে গেল। সন্ধ্যে হতেই ঘরে খিল তুলে দিয়ে ঘুমায় সবাই। কিন্তু একজনের চোখে ঘুম পায় নেই। সে কোনো জন্তুকে ভয় পায় না। সে খবির শেখ। খবির শেখের বউ মঙ্গলের মা ছেলের শোকে বোবা হয়ে গেছে। কোনো কথা নেই মুখে। শুধু চোখের জলে ভাসছে। খবির লাঠি হাতে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। হাতে একটা চার ব্যাটারির টর্চ। খুঁজে চলে পুত্র হত্যাকারী অজানা জন্তুটাকে। কিন্তু খোঁজ পায় না। আজ রাতেও বের হলো খবির শেখ। আয়াতুল কুরসী পড়ে নিল সে। তারপর ছেলের গামছাটা বাঁধল কোমরে। হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। তার বুকের ভেতর আগুন জ্বলছে। হাতের মুঠি

শক্ত হয়ে এল। কিলবিল করে উঠল হাতের পেশী। দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল। বাড়ির বাইরে ঘরে তার অসুস্থ স্ত্রী। ঐ জন্তু, হোক সে শরীরী কিংবা অশরীরী, তাকে সে ছাড়বে না। তার একমাত্র বুকের ধনকে কেড়ে নিয়েছে সে।

রাত নিশুতি। আকাশে আজ তারা আছে। চারদিকে ঝাপসা আলো। তাতেই সবকিছু দেখা যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় চলে এলো সে। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে দাঁড়াল। চারদিকে নজর দিলো। নীরব রাস্তা। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। হঠাৎ মনে হলো একটা বিশাল জন্তুর ছায়া যেন সরে গেল একদিকে। স্যাঁৎ করে গেছে ওটা! বিশাল শরীর। টর্চের আলোয় একটুর জন্য দেখা গেল। তারপর চারদিকে আলোটা ঘুরিয়ে আনল। কিন্তু দেখা গেলো না কিছু। পাগলের মতো চারদিকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না। চিৎকার করল সে,–

'কে তুই? দেখি তোর কত সাহস, আমার একমাত্র বংশপ্রদীপ কাইরা নিলি। দেখি তোর কত বুকের পাটা, আমার সামনে আয় আয়...আ...য়... .. আ...য়...।'

তার চিৎকার জঙ্গলের এ মাথা থেকে ও মাথায় প্রতিধ্বনি তুলল। চিৎকার থেমে যেতেই পেছন থেকে শোনা গেল একটা গ.র...র..র শব্দ। তারপর শব্দটা আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল। আর শোনা গেল না। ধপ করে জঙ্গলের মাটিতে বসে পড়ল খবির শেখ। রাত তখন আরো নিশুতি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল খবির শেখ। একটা বাদুড় এসে ঝুপ করে বসে পড়ে অর্জুন গাছে। ঝিঁঝি কোরাস গাইতে থাকে। এতক্ষণ কিসের ভয়ে যেন নিঝুম হয়ে ছিল জঙ্গলটা। হয়তো ঐ অশুভ শক্তি আজ জঙ্গল ছেড়ে চলে গেছে। খবির শেখের ভয়ে নাকি অন্য কোন কারণে। খবির শেখ জানে না,–সে যখন এই জঙ্গলে ছেলের হত্যাকারীকে খুঁজে মরছে, ততক্ষণে হত্যাকারী গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেছে কোন নতুন পরিকল্পনায়। আবার আঘাত হানতে যাচ্ছে। এদিকে খবির শেখ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর বেরিয়ে এল সে জঙ্গল ছেড়ে। বুকের মধ্যে চাপা কষ্ট অনুভব করছে সে।

ছ'মাসের ছোট্ট মেয়েটাকে বিছানায় রেখে কূপিটা নেভানোর জন্য ওটার দিকে হাত বাড়াল যয়তুনের মা। ছোট্ট মেয়েটার নাম যয়তুন। ছ'মাসের শিশু। তার বাপ গেছে গাওয়াল করতে। চানাচুর বিস্কুট গাওয়াল করে ফেরে সে। দু'তিন দিন এক জায়গায় থাকে। তারপর ফিরে আসে। ঘরে একটা মাচাও নেই। ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে যয়তুনের মাকে থাকতে হয় মাটিতেই

বিছানা করে।

কূপিটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েই সে শুনতে পেল শব্দটা। আঁচড়ের শব্দ! পাটকাঠির বেড়ায় আঁচড় কাটছে কিছু একটা! কান খাড়া করল যয়তুনের মা। আঁচড়ের শব্দ বাড়লো। ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেলো তার। দেখতে দেখতে বেড়াটা ফাঁক হয়ে গেল। বড় একটা ফোকর। তারপর ঐ ফাঁক দিয়ে যে প্রাণীটা ঢুকলো ওটার চোখ দেখেই বুকের রক্ত ছলকে উঠল যয়তুনের মার! জ্বলন্ত সবুজ চোখে ওটা তাকাল কূপির দিকে। সাথে সাথে কূপিটা নিভে গেল।

অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। একটা গরগর শব্দ করল জন্তুটা। দেখতে বিশাল কালো শেয়ালের মতো। হঠাৎ গর্জন করে লাফ দিল ওটা। ধূপ করে পড়লো যয়তুনের মা'র সামনে। চিৎকার করে উঠল যয়তুন। বাচ্চাটার ঘাড় কামড়ে ধরল রাক্ষুসে শেয়ালটা। এবার সম্মোহন ভাঙল যয়তুনের মা'র। চিৎকার করে উঠল সে—'ওরে আল্লারে আমার যয়তুন মায়েরে নিয়া গেল রে। তোমরা কে কই আছ বাঁচাও রে!'

বিষণ্ন মনে বাসায় ফিরে আসছিল খবির শেখ। যয়তুনের মা'র চিৎকার শুনতে পেল সে। থমকে দাঁড়াল। তারপর দৌড় দিল চিৎকার লক্ষ্য করে। যয়তুনের মা'র বাড়ির সামনে আসতেই টর্চের আলোয় সে রাক্ষুসে শেয়ালটাকে দেখতে পেলো। কচি বাচ্চাটার ঘাড় কামড়ে ধরে ছুটে যাচ্ছে কালো শয়তানটা।

হে-ই-ই করে হাঁক দিল খবির শেখ। থমকে দাঁড়াল ওটা, জ্বলন্ত চোখে তাকাল খবির শেখের দিকে। সাথে সাথে মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল তার। ততক্ষণে রাক্ষসটা পালিয়ে গেছে। এদিকে আরো ক'জন মানুষ আলো নিয়ে ছুটে এল। যয়তুনের মা তখনো বিলাপ করে চলেছে,—

'আমার যয়তুনরে কোন রাক্ষসে নিলোরে, এ কোন আজাব নাম-লো-রে।'

এদিকে গ্রামবাসী দেখল তাদের হাতের হারিকেনের আলোয় খবির শেখের চোখ চকচক করছে। সে চিৎকার করে বলল,—

'পাইছি ঐ হারামজাদারে পাইছি। আমি দেখছি অরে। অই আমার মঙ্গলরে মারছে। অরে আমি ছাড়মু না, হ্যাঁ।'

চিনু মিয়া বলল,—'আরে কি হইছে কইবা তো?'

ওদের কথাবার্তার আওয়াজে চিৎকার করতে করতে যয়তুনের মা বের হয়ে এল। বলল,—'ঐ রাক্ষইস্যা এক কালা শেয়াল আমার মাইয়্যাডারে নিয়া গেল গো বাপরা।'

খবির শেখ বলল,—'আমি দেখছি ঐটারে। আমি হে-ই-ই কইরা চিক্কুর দিতেই আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে চাইয়া দেখলো। ভয়ে কাঁটা দিয়া উঠল শইল। বিশ্বাস করো তোমরা ঐটা কোন হেজি পেজি শেয়াল না। আমি কইয়া দিলাম ঐটা পিশাচ। তোমরাই কও দেহি শেয়াল কি কোন দিন কুইচ্চা কালা হয়? কি কও, হয়? ওইডা পিশাচ। আর ঐডা যেই হউক না কেন আমি ঐডারে ছারমু না। আমি এর শেষ দেইখা ছারমু।'

যয়তুনের মা'র বিলাপ চলতেই থাকল। মানুষগুলোকে দেখে মনে হলো কেউ যেন ওদের মুখের রক্ত ব্লটিং পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে। একজন আরেকজনের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে ওরা যেন ওরা কেউ একে অপরকে চেনে না।

রাতের অন্ধকারেই কুপি জ্বেলে কিংবা পাটকাঠির মুঠা জ্বেলে যয়তুনের মা'র কান্নার কারণ দেখতে এসেছে মহিলারা। বয়স্ক মহিলারা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক তখনই চারদিক কাঁপিয়ে অসংখ্য শেয়াল ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া করে। চিৎকারটা এমন জোরে হল যে চমকে উঠে চিনু মিয়া হাতের হারিকেনটাই ফেলে দিল। যেন গরম লোহা!

তিন

গিরি কবিরাজকে চেনে না এ তল্লাটে কেউ নেই। এমন কি অন্য জনপদের লোকও তাকে চেনে। তার বাপ ও ছিলো নামকরা কবিরাজ। গিরি কবিরাজের বাস গ্রামের একেবারে শেষ মাথায়। একটা বাংলোর মতো সুন্দর বাড়ি তার। তারই একটি কক্ষে

তার ওষুধ তৈরির গবেষণাগার। নতুন একটা ওষুধ তৈরিতে নজর দিয়েছে সে এখন। প্রায় সফল হবার পথে। কর্কট রোগের ওষুধ মানে ক্যান্সারের। বিশ্বের কেউ আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। গিরি কবিরাজ সফল হবে। জতুই গাছের শিকর, রক্তচোষার হাড়চূর্ণ, হলুদ গুই সাপের রক্ত আর। না সবকিছু বলে দিলে তো কেল্লা ফতে। গ্রামের লোক সব 'টা অকাট মূর্খ। সে যে কি,—এর মানেই ওরা বুঝল না। জানল না। তার বয়স এখন কতো। চন্দন মাইলের দু ফোঁটা খেয়েই যে আজ তার এমন সুন্দর সুস্বাস্থ্য তা কেউ জানে না। তার বয়স একশ দশ পেরিয়ে গেলেও যে, তার এখনো পেটানো শরীর কেন, তাও কেউ জানতে চাইল না। আর তার সর্বক্ষণের চাকর মনাই যে আসলে কে, তার আলামতও কেউ পায়নি। একবার গিরি কবিরাজ আসামের জঙ্গলে গিয়েছিল চন্দন গাছের খোঁজে। তখন সে গিয়েছিল কামরূপ কামাক্ষার তন্ত্র পীঠে। সে সময়ই সে আসাম জঙ্গলে ঢুকে একটা চন্দনের চারার সন্ধান করে এবং পেয়েও যায়। সাথে পায় মনাইকে। উঁচু একটা গাছের ডালের প্যাঁচানো লতায় পা আটকে মনাই ঝুলছিল মাথা নিচের দিকে দিয়ে। মাটি থেকে ছয় কি সাত ফুট উপরে ঝুলছে মনাই। সে অবস্থাতেই হাতটা লম্বা করে দিয়ে ছয়, সাত ফুট নিচের মাটি ছুঁয়ে দিচ্ছে সে। দেখতে দেখতে চোখের সামনে ছয়-সাত ফুট উঁচু থেকে যে লোক হাত লম্বা করে দিয়ে মাটি ছুঁতে পারে, সে আর যাই হোক মানুষ নয়; অন্য কিছু।

গিরি কবিরাজ মনাইকে গাছ থেকে উদ্ধার করে বললো,—

'আমার সাথে চল, আমার ফাই-ফরমাস খাটবি। এটা-সেটা করবি। তবে আর যাই করিস তোর হাতকে আট-দশ ফিট লম্বা করা আর গজ বিশেক দূরে পা ফেলে হাঁটা বন্ধ করতে হবে। বুঝলি?'

মনাই বললো,—'বুঝলাম। এখন কনতো দেখি আমি বাংলা কথা বলা শিখলাম কেমনে?'

গিরি কবিরাজ বললো,—'আমার জানার দরকার নাই। এখন চল দেখি।'

সেই থেকে মনাই গিরি কবিরাজের সাথে আছে। কতোদিন হবে তার হিসেব নেই। তারও যেন বয়স বাড়ে না। যেমন আছে তেমন ঠিক আগের মতো। গিরি কবিরাজ তার এই মনাইকে সভ্য করতে কম চেষ্টা করেনি। অনেকখানি পরিবর্তনও এসেছে তার চরিত্রে। কিন্তু কাঁচা মাংস খাওয়ার অভ্যাসটা দূর করতে পারেনি। যখনই সুযোগ পায় বাংলোর দাওয়ায় বসে বিশ-পনেরো

গজ দূরের জাম গাছটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। চড়ুই পাখি ধরে আনে আর কচাকচ চিবিয়ে খায়। দেখেও না দেখার ভান করে কবিরাজ। ভয়ও পায়। কোনো দিন না আবার বিগড়ে যায় বেটা। তার পর তাকেই খেতে শুরু করে। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও গিরি কবিরাজ জঙ্গলে বের হলো তার শেকড়-বাকড় যোগাড় করতে। অনেক ঘুরে ঘুরে অনেক লতা শেকড়ই সে সংগ্রহ করল। তার পর হাতের লাঠিটা ঘুরাতে ঘুরাতে যখন ফিরে আসছিল তখনই দেখল ওটা। একটা ঝোপের মধ্যে একটা কুকুরের কালো বাচ্চা। এগিয়ে গেল সে কাছে। কৌতূহলে উঁকি দিলো ঝোঁপের ভেতর। না, তার ধারণা ভুল। কুকুরের বাচ্চা নয়, ওগুলো শেয়ালের বাচ্চা। কালো শেয়ালের বাচ্চা! শেয়াল আবার কালো হয় নাকি! গিরি কবিরাজ অবাক হয়ে গেলো। ভাবল এগুলো নিতেই হবে। বিরল প্রজাতি। কালো শেয়াল তা হলে আছে! সাথে নিয়ে নিল। তিনটে শেয়ালের বাচ্চা!

বাংলোতে বাচ্চা তিনটিকে নিয়ে এলো গিরি কবিরাজ। বাচ্চা তিনটে দেখেই মনাইর কৌতূহল বেড়ে গেল। তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। জিবটা সে বারদুয়েক ঠোঁটের বাইরে নিয়ে এলো। এসবের কিছুই খেয়াল করল না গিরি কবিরাজ। সে বাচ্চা তিনটিকে খাঁচায় ভরে গবেষণাগারে ঢুকে গেলো। সাথে নিয়ে আসা শেকড়-বাকড় হামান দিস্তায় পিষতে বসে গেলো। একাগ্র মনে তৈরি করতে লাগলো কর্কট রোগের মহৌষধ।

সে রাতেই এক আজব ঘটনা ঘটল। কি এক কাজে বাইরে বেরিয়েছিল গিরি কবিরাজ। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চমকে গেল। তার বাংলোর সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল জন্তু। তাদের জ্বলন্ত চোখে চেয়ে দেখছে বাংলোটাকে! কপাল কুঁচকে গেল গিরি কবিরাজের। সে ভাবতে চেষ্টা করল আসলে ওগুলো কিসের চোখ, এমন চোখ সে কোনো দিন দেখেনি। ঘরে ঢুকে পেছন দিকের দরোজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এদিকেও ঘিরে আছে অসংখ্য চোখ। তার মানে তাঁর বাংলোটাকে ঘিরে রেখেছে জ্বলন্ত চোখের জন্তুগুলো। কিন্তু সে ভেবে পেল না ওগুলো কি। সে টর্চ নিয়ে আসার জন্য ঘরে ঢুকল। চার ব্যাটারি টর্চ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, নেই! হাওয়া! চিন্তিত মনে ঘরে ফিরে এল গিরি কবিরাজ। মনাই রাতের খাবার দিয়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না অনেকক্ষণ। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে গেল বিচিত্র এক শব্দে। কান খাড়া করল। আর কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ পর আবার শোনা গেল কারো পদশব্দ। কোনো লোক

হাঁটছে। সেই সাথে কোন জন্তুর কুঁই কুঁই শব্দ। তড়াক করে উঠে বসল গিরি কবিরাজ। আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলো চুপ করে।

তারপর টর্চটা বালিশের কাছ থেকে হাতে নিল। আস্তে করে দরোজা খুলে বেরিয়ে এল। মনাইর ঘরে আলো জ্বলছে। দরোজাটা ভেজানো। দরোজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল গিরি কবিরাজ। সাথে সাথে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। মনাইর খোলা মুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে কিছু খাচ্ছে। তাকে এখন অন্যরকম লাগছে। মাংস গলে পড়া ক্ষতবিক্ষত মুখ। বড় বড় ভাঁটার মতো চোখ। তার সাধের কালো শেয়ালের বাচ্চাগুলো খাচ্ছে কচ কচ করে। ওগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। ওহ্ খোদা! হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হলো একটা কথা। সন্ধ্যের সময় বাংলোর সামনে দেখা জ্বলন্ত চোখগুলো ছিল শেয়ালের। ওগুলো বাচ্চাগুলোকে মুক্ত করতে এসেছিল। তার মানে ওরা সহজে ছাড়বে না! এখন ওদের বাচ্চা ওদেরকে ফিরিয়েও দেয়া যাবে না। সব শেষ। টলমল পায়ে ঘরে ফিরে এলো গিরি কবিরাজ। বিপদের সবে শুরু। আর মনাই যে অস্বভাবিক কিছু, এটা জানত গিরি। কিন্তু কদাকার একটা রাক্ষুসে পিশাচ, সেটা সে ভাবতেও পারেনি।

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল গিরি কবিরাজের। সে বাচ্চা শেয়ালগুলোর খাঁচার কাছে গিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিল। মনাই ছুটে এল। বলল,—'কি হল কবরেজ দাদা?'

গিরি বলল,—'শেয়ালের বাচ্চাগুলো পালিয়েছে। একটু নজর দিলি না?'

গিরি কবিরাজ মনাইকে বুঝতে দিল না যে সে সবকিছুই জানে। মনাই বলল,—'এত কাজ, কত দিকে নজর দিবো কন দেখি দাদা।'

গিরি কবিরাজ কোন উচ্চবাচ্য্য করল না। নাস্তা শেষ করে জঙ্গলে চলে এল হাতের লাঠিটা নিয়ে। ওটা শুধু লাঠি নয়। অন্য কিছু। আরো বিশেষ গুণ আছে ওটার। কোন অশুভ আত্মা ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না ওটা হাতে থাকলে। কিন্তু সে জঙ্গলে ঢোকার সাথে সাথে টের পেল কিছু একটা তার পিছু নিয়েছে। কে পিছু নিয়েছে বুঝতে পারল না। কিন্তু বুঝতে সময়ও লাগল না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলে দিল, এ আর কিছু নয় শেয়ালের বাচ্চাগুলোর মা কিংবা আত্মীয়-স্বজন!

চার

এদিকে খবির শেখের ছেলে মঙ্গল আর ছ'মাসের শিশু যয়তুন শেয়ালের হাতে মরা যাবার পর সমস্ত গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। গ্রামজুড়ে ভয়। পারতপক্ষে কেউ রাতে বের হয় না। দূরের হাটে লোকজন গেলেও দল বেঁধে গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু খবির শেখের ভয়-ডর নেই। তার বুকে ধিকি আগুন। সন্তান হারিয়ে তার স্ত্রী পাগল। লাঠি হাতে নিয়ে সমস্ত রাত জেগে কাটায় সে। ঘুরে বেড়ায় ভূতের মতো। টের পায়, তার আশেপাশে কারা যেন ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু দেখা দেয় না। তাই বলে খবির শেখও আশা ছাড়ে না। সন্তানহারা পিতার আক্রোশ কমে না কিছুতেই।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সন্ধ্যা হতেই ঘরে ফিরে দরোজায় খিল তুলে দিল কাঁকনভাঙ্গা গ্রামের লোক। এর কিছুক্ষণ পরই রাস্তায় দেখা গেল একটা প্রাইভেট কার। এ ধরনের টেক্সি সাধারণত এ রাস্তায় দেখা যায় না। এনজিওর লোকেরা মাঝে মধ্যে কাঁকন ভাঙ্গা পার হয়ে হাটখোলার দিকে চলে যায়। হাটখোলা একটা বড় বাজারের মতো জায়গা। অনেক দোকানপাট। বড় একটা বাজার বলে সব সময় লোক সমাগম হয়। ওখানে একটা বাংলো আছে। ওখানকারই একটা এনজিওর জরিপে মাঝে মাঝে কোন কর্মকর্তা এলে ঐ বাংলোতে থাকে। আজও এসেছেন মিঃ জোয়ারদার সস্ত্রীক। সাথে তিন বছরের ছেলে রাকি। ওদের একমাত্র সন্তান। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এলেন। এমনিতেই জঙ্গুলে রাস্তা, লোকজন নেই। তার উপর হঠাৎ করেই গাড়ির স্টার্ট গেলো বন্ধ হয়ে। গাড়ির হেড লাইটের আলোতে রাস্তা পরিষ্কার দেখা গেল। মিঃ জোয়ারদার বলল,—

'লিলিয়ানা, তুমি রাকিকে নিয়ে চুপ করে গাড়িতে বসে থাকো। আমি দেখি আশেপাশে পানি আছে কিনা।'

লিলিয়ানা বলল,—'না, এই বিরান জায়গায় আমার ভয় করছে।'

মিঃ জোয়ারদার বলল,—'জানালাগুলো আটকে বসে থাক। যত যাই হোক গ্লাস খুলবে না। আমি যাব আর আসব। ফেরিতে

ফেঁসে না গেলে এতক্ষণে কখন চলে যেতাম।'

মিঃ জোয়ারদার টর্চ জ্বালাতে জ্বালাতে চলে গেলেন একদিকে। লিলিয়ানা ছেলেকে আঁকড়ে ধরে কাঁচের জানালা দিয়ে তাকাতে লাগলো ভয়ে ভয়ে। দুদিকেই নিকষ কালো অন্ধকার। শুধু সামনের দিকটা ছাড়া। ভয় করছে তার। প্রচণ্ড ভয়। পাঁচ মিনিট হবে জোয়ারদার গিয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন পাঁচ ঘণ্টা।

আবার বাইরে তাকাল লিলিয়ানা। সাথে সাথে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল কলজেটা। এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ দেখা যাচ্ছে বাইরে। তারপর একটা গরগর শব্দ শোনা গেল। আরো জোরে আঁকড়ে ধরলো লিলিয়ানা তার ছেলেকে। আবছাভাবে একটা জন্তুর অবয়ব ধরা পড়লো তার চোখে। তারপর হিংস্র এক গর্জন ছেড়ে লাফ দিল জন্তুটা! আছড়ে পড়ল গাড়ির জানালার কাঁচে।

কাঁচ ভেঙে ওটার মাথাসহ অর্ধেক শরীর ঢুকে গেল গাড়ির ভেতরে! গাড়ির ভেতরের আলোতে ওটার কুচকুচে দেখা গেল। আর ঠিক সে সময়ই কোথা থেকে যেন লাফ দিয়ে এসে পড়ল খবির শেখ। শয়তান কালো শেয়ালটার লেজ ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বের করে আনল গাড়ির ভেতর থেকে। শরীর মুচড়ে শেয়ালটা এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল খবির শেখের উপর। দু'জনে জড়াজড়ি করে চলে এল গাড়ির সামনে হেড লাইটের আলোতে। ধস্তাধস্তি করছে ওরা।

বোবা আতঙ্কে নীল হয়ে গাড়ির ভেতরে বসে এই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখছে লিলিয়ানা। তার ছেলে রাকি এখানো ঘুমাচ্ছে। শেয়ালটার লক্ষ্য খবির শেখের কণ্ঠনালি। কিন্তু খবির শেখও কিছুতেই ওটাকে তার কণ্ঠনালি ছুঁতে দেবে না।

সে তার কোমর থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা ফলার ছোরা বের করে হাতে নিল। কিন্তু এতো আঘাত করছে, এতো ঘাই মারছে, কোনটাই ঐ পিশাচটাকে বিদ্ধ করছে না।

আশ্চর্য! এবার ওটার গলায় ছুরিটা চালিয়ে দিল। কিন্তু কোন আঘাত লাগল না ওটার! শেয়ালটা সফল হচ্ছে। প্রতিবার ওটা চিরে দিচ্ছে খবির শেখের শরীর তার ধারাল নখ দিয়ে।

কিন্তু খবির শেখও নাছোড়বান্দা। তার ছেলে হারানোর জ্বালা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে মিঃ জোয়ারদার চলে এসেছে। সে দেখলো পশু আর মানুষে এক ভয়ংকর লড়াইয়ের মত্ত। দৌড়ে সে স্ত্রীর কাছে এলো। জানালার ভাঙা কাঁচ দেখে চোখ কুঁচকে গেল জোয়ারদারের।

এদিকে হঠাৎ করে একটা সুযোগ এসে গেল খবির শেখের, ধারাল ছোরার তীক্ষ্ণ ডগাটা ঢুকিয়ে দিল রাক্ষুসে শেয়ালটার বাম চোখের ভেতর। আর্তনাদ করে মুহূর্তেই ওটা মিলিয়ে গেল হাওয়ায়!

এতক্ষণ বাঁচার তাগিদে আর প্রতিশোধস্পৃহায় গায়ে যে শক্তি পেয়েছিল খবির শেখ, এখন ওটা চলে যাওয়ার পর অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। দৌড়ে তার কাছে এল মিঃ জোয়ারদার। চোখের সামনে জন্তুটা হাওয়া হয়ে যেতে দেখেছে সে। খবির শেখের অবস্থা সিরিয়াস। এখনই ব্যবস্থা না করতে পারলে লোকটা রক্তক্ষরণেই মারা যাবে।

খবির শেখকে তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। খবির শেখ তার ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যাওয়া ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকাল। হ্যাঁ, আছে। বাঁশিটা আছে। ওটা বের করে এনে মিঃ জোয়ারদারের হাতে দিয়ে বলল,—

'এইটাতে ফুঁ দেন স্যার। এই বাঁশির শব্দে গ্রামবাসী ছুটে আসবে।'

বলেই জ্ঞান হারাল সে। কাঁপা হাতে বাঁশিটা হাতে নিল মিঃ জোয়ারদার। চোখের সামনে যা ঘটে গেল তা তার বিশ্বাস হতে চাইছে না। তার স্ত্রী এখনও বিহ্বল অবস্থায় আছে। ঘোর কাটেনি তার।

বাঁশিটাতে শরীরের শক্তি দিয়ে হুইসেল বাজাল মিঃ জোয়ারদার। একবার, দুইবার, তিনবার। কিছুক্ষণ পর অনেক লোকের হৈ চৈ শোনা গেল। ছুটে আসছে গ্রামবাসী। ওরা যেন কিছু একটার জন্য আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল। কিসের জন্য কিছুতেই বুঝতে পারে না মিঃ জোয়ারদার। জ্ঞান হারানো লোকটার দিকে তাকালো সে। এত বড় সাহসী এক মানুষ। অশুভ শক্তির সাথে কি লড়াইটাই না লড়ল! ওটা একটা কালো শেয়াল। আর কি হিংস্র! শেয়াল কোনদিন কালো হয়? তবে ওটা কি ছিল? শেয়ালরূপী কোন পিশাচ! লোকগুলো ততক্ষণে এসে গেছে। চিনু মিয়া খবির শেখকে দেখেই চিৎকার করে বলল,—'ওরে আল্লাহ্, কি হইলো!'

মিঃ জোয়ারদার বলল,—'সব কথা পরে হবে। একে এখন হাটখোলা স্বাস্থ্য ক্লিনিকে নেয়া দরকার।'

পাঁচ

গিরি কবিরাজ দুশ্চিন্তায় আছে। মহা দুশ্চিন্তায়। কাঁকনভাঙ্গা গ্রামের খবর তার কানে এসেছে। রাক্ষুসে এক কালো শেয়াল নাকি গ্রামের শিশুদের ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আহত করে গেছে খবির শেখ নামের এক গ্রামবাসীকে। সে এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে এখন কিছুটা সুস্থ।

ঐ শেয়ালই যে তার জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা বাচ্চাগুলোর মা তাতে ভুল নেই। কাঁকনভাঙ্গা গ্রামের মোড়ল বৃদ্ধ মানুষ। বড় ভালো লোক। তিনি ঐ গ্রামের মানুষদের একতাবদ্ধ হয়ে বিপদ মোকাবেলার পরামর্শ দিয়েছেন। একা কাউকে বাইরে যেতে মানা করছেন। কিন্তু এই বিপদের জন্য গিরি কবিরাজ নিজেই দায়ী। একটা মাত্র শেয়ালের পৈশাচিক তাণ্ডবে নিরুপদ্রব একটা জনপদ কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।

ঐ রাক্ষস মনাইটার জন্য এসব হচ্ছে। মাঝে মধ্যে মনাইকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার ভয় হয়। হয়তো মনাইর ঘাড় ধরার আগেই মনাই নিজেই না তার ঘাড় ভাঙে। গ্রামবাসীর বিপদে তাদের পাশে থাকা গিরি কবিরাজের উচিত। কিন্তু কথা হচ্ছে ওরা যখন জানবে,—ঐ বিপদের জন্য সে-ই দায়ী তখন ওরা ছেড়ে কথা বলবে না। যে কোনভাবেই হোক ওরা তাকে মেরে ফেলবে।

এদিকে মনাই এখন যখন তখন জঙ্গলে বের হয়ে যায়। ফিরে আসে প্রশান্ত মনে। ওর কাঁচা মাংসের ক্ষুধা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর তার শরীরের জেল্লাও যেন বেড়ে চলেছে। কোন দিন আবার মানুষের মাংসের স্বাদ নেয়ার ইচ্ছে জাগে কে জানে।

জঙ্গলে সে কেন যায় গিরি কবিরাজ ভাল করেই জানে। কিন্তু আজ রাতের রক্ততৃষ্ণাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল মনাইর। তাই তার খেসারত তাকে একটু আগেই দিতে হয়েছে।

অন্য দিনের মতো সে রাতেও গিরি কবিরাজকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজের ঘরে চলে এল মনাই। তারপর তৈরি হয়ে বাইরে থেকে দরোজাটা একটু চাপিয়ে বারান্দা ছেড়ে নিচে নামতে গিয়েই তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। একটা গর গর গ-র-র শব্দ ভেসে এল বারান্দায় ওঠার সিঁড়িটার কাছ থেকে।

সবুজ চোখ দেখা গেল একজোড়া। দৌড়ে ঘরে চলে এলো মনাই। এ অশুভ শক্তি তার চেয়েও অনেক ক্ষমতাধর, এর সাথে সে কিছুতেই পারবে না দেখেই চিনেছে সে কি ওটা। সেই শেয়ালের বাচ্চাগুলোর মা পিশাচিনীটা। মনাই নিজেও এক আত্মা। যার এখনো কোনো মুক্তি হয়নি। এখনো তাকে অন্য লোকের দেহ আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু এই রাক্ষসটার বিরুদ্ধে সে কিছুই করতে পারবে না। মনাই ছিল আসামের এক গ্রামের এক চাষী। তার ভাই জমি আর সম্পদের লোভে তাকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলে। কেউ কিছু বুঝতে পারে না। আর লাশ না পেয়ে মনাইর সৎকারও হয়নি।

অপঘাতে মরা সহজে কি মুক্তি পায়? ঘুরতে থাকে এদিক-সেদিক। হঠাৎ করে জঙ্গলে একদিন মনাই একটা কিশোরের লাশ দেখতে পায়। কলেরায় মরা লাশ। কারা এনে ফেলে দিয়ে গেছে। ব্যস, মনাইর আত্মা সাথে সাথে ঢুকে পড়ে ঐ লাশে। আর সাথে সাথে আবার দেহধারী একজন হয়ে যায়। এতদিন ভালই ছিল। কিন্তু বিপদ হল বেশি লোভ করতে গিয়ে। এখন তাকে বাঁচতে হলে দৌড়ে গিয়ে দরোজায় খিল দিতে হবে।

ঘরে দৌড়ে গিয়ে দরোজা বন্ধ করে খিল দিল মনাই। তার পরপরই দরোজার উপর লাফিয়ে এসে পড়ল কিছু একটা। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল দরোজাটা ঘরের ভেতর দিকে। চমকে উঠে নিজের ভয়ংকর রূপটা ধরল মনাই। কিন্তু ঐ রাক্ষুসে শেয়ালের চোখ দুটো ভাটার মতো জ্বলছে।

অসম্ভব বড় একটা শেয়াল। ওটার ভেতরটা দেখল মনাই। মহা ক্ষমতাধর এক প্রেত ওটা। তার শক্তির কাছে মনাই অসহায় হলেও সে শেষ চেষ্টা করে দেখবে। জীবন পণ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিল মনাই।

এদিকে বিকট শব্দে দরোজা ভেঙে পড়ার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল গিরি কবিরাজের। দৌড়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। মনাইর ঘর থেকে আলো এসে পড়েছে খোলা দরোজা দিয়ে বারান্দায়। দৌড়ে সেদিকে গেল গিরি কবিরাজ। ভেতরে তাকিয়েই জমে গেল ভয়ে। মনাইকে কোণঠাসা করে ফেলেছে শিয়ালিনী। মনাই আক্রোশে ফেটে পড়ছে।

তখনই শিয়ালটা তাকালো ঘরের আলোটার দিকে। সাথে সাথে হারিকেনের চিমনিটা ফেটে গেল। নিভে গেল ওটা। তারপরই অন্ধকার ঘরে বেঁধে গেলো লঙ্কাকাণ্ড। মরণপণ লড়াই শুরু হয়ে গেল দুটো পৈশাচিক শক্তির মধ্যে। তাদের লড়াইয়ের দাপটে কেঁপে উঠতে লাগল বাংলোটা।

হঠাৎ মনাইর ডাকে সম্বিত ফিরে পায় সে। মনাই তাকে চিৎকার করে বলছে,—

'কবরেজ দাদা গো আমারে বাঁচান কবরেজ দা-দা। আমি আর পারলাম না—ক-ব-রে-জ-দা-দা-গো-ও-ও।'

তারপর থেমে গেল। একলাফে জন্তুটা বেরিয়ে এলো বারান্দায়। ঝাপসা দৃষ্টিসহা আলোয় দেখা গেল ওটা লাফিয়ে নামল মাটিতে তারপর হারিয়ে গেলো অন্ধকারে। দৌড়ে নিজের ঘর থেকে হারিকেনটা নিয়ে মনাইর ঘরে এল গিরি কবিরাজ। হারিকেনের আলোয় দেখল মনাইর লাশটা গলে গলে যাচ্ছে!

ওটা আস্তে আস্তে একটা কঙ্কালে রূপান্তরিত হল। তারপর পরিণত হল ধুলোয়। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল গিরি কবিরাজ। ভাবল এবার হয়তো রাক্ষুসে শেয়ালটার সুমতি হবে। এবার হয়তো তার হত্যা তাণ্ডব বন্ধ করবে।

ঠিক তখনই রাতের স্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে চমকানো পিলেকে আরো চমকে দিয়ে হুক্কা-হুয়া করে অন্ধকার কাঁপিয়ে ডেকে উঠল অসংখ্য শেয়াল। কলজে লাফানো বুক নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকল গিরি কবিরাজ। তার মনে হচ্ছে আজ আর রাত ভোর হবে না। একা একা তার কেমন ভয় করছে। কোনদিন সে কোন কিছুকে ভয় করেনি। অথচ আজ কেন যে তার ভয় করছে! তার রক্ষাকবচ লাঠিটা জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। সব রাতেরই শেষ আছে। এই রাতও শেষ হয়ে যাবে।

অবশেষে শেষ হলো এই অন্তত রাত্রি। পাখির কলকাকলী ঘুম ভাঙিয়ে দিল গিরি কবিরাজের। নতুন আরেকটা দিনের সূচনা

হলো তার জীবনে।

ছয়

আজ নিয়ে দশ দিন হতে চলল। গ্রামের মোড়ল হায়দার চৌধুরী গ্রামে মজলিস ডেকেছে। ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানলো সে খবির শেখের কাছে। তার দেহের ঘায়ের দাগগুলো গভীর। মজলিসে এনজিও অফিসার মিঃ জোয়ারদারও আছে। সে বলল,—

'আমি আপনাদের সাথে আছি। আমি অবশ্য পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। আজ বিকেলের দিকে দারোগা আমান আলী দুজন কনস্টেবলসহ আসার কথা। তবে ওরা বলছে রাতের পর রাত ওরা একটা জন্তুর পেছনে সময় নষ্ট করতে পারবে না। ওদের অন্য কাজও আছে। আজ রাতে ওরা বিট করবে জঙ্গলে। অর্থাৎ গ্রামবাসীরা টিনের কন্টেনার, ঢোল, কাঁসি বাজিয়ে হৈ-হুল্লা করে জঙ্গলের এক দিক থেকে দাবড়ানি দেবে। আর দুজন কনস্টেবলসহ আমান আলী দারোগা থাকবে জঙ্গলের শেষ মাথায়। বিটারদের হৈ চৈ ও তাড়া খেয়ে কোন জন্তু বা ঐ হিংস্র শেয়ালটা ওদের দিকে দৌড়ে গেলে, গুলি করবে ওরা।' মজলিসে মোড়ল বলল,—'এটা ভাল ব্যবস্থা।'

কিন্তু খবির শেখ সন্তুষ্ট হতে পারল না। বলল,—'আমি কইতে চাইছিলাম কি, শুধু শুধু খাটনি করা হইব। এইটা কোন সাধারণ শিয়াল তো না যে মারা যাইব। এইটা একটা ডাইনি। পিশাচ।'

বিকেলের দিকে পুলিশ চলে এল। বিটাররা বিটিং শুরু করল। অর্থাৎ শুরু হল জঙ্গলের পশু তাড়িয়ে নেয়া। হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। জঙ্গলজুড়ে হৈ চৈ বেসুরের বাজনা। জঙ্গল তছনছ করে ছুটে চলল পশুর দল। ঘণ্টাখানেক ধরে চলল এই অভিযান। শেষে ফলাফল দেখা গেল পুলিশের হাতে মারা পড়েছে চারটে শেয়াল। একটা খরগোশ। শেয়ালগুলো দেখে নিরাশ হলো খবির

শেখ ও মিঃ জোয়ারদার।

মিঃ জোয়ারদার বলল,—'আমি অবশ্যই এর শেষ দেখে ছাড়ব। কিন্তু আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। ওই পশুরূপী অশরীরীটা হঠাৎ শিশুদের প্রতি ক্ষিপ্ত হলো কেন? কেন ওটা শুধু শিশুদেরই ধরে নিয়ে যায়? নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।'

খবির শেখ বললো,—'তাই তো এইটা তো ভাইবা দেখি নাই। হঠাৎ কইরা কোন কারণ ছাড়া তো এমন হইতে পারে না। কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে।'

মিঃ জোয়ারদার বলল,—'এর কারণ খুঁজে বের করতে হবেই।'

মিঃ জোয়ারদার হাটখোলায় চলে গেল। কাল তাকে বের হতেই হবে। লিলিয়ানা রাতে শোয়ার সময় মিঃ জোয়ারদারকে বলল,—

'চলো আমরা ফিরে যাই ঢাকায়। আমাদের এখানে থাকার দরকার নেই।'

মিঃ জোয়ারদার বলল,—'না, যে লোকটা আমার ছেলের জীবন বাঁচালো তাকে কথা দিয়েছি তার সাথে থাকব শেষ পর্যন্ত।'

পরদিন সকালেই বের হলো জোয়ারদার। হাতে বন্দুক। তার শিকারি জীবনের অনেক দিনের সঙ্গী। হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের শেষ মাথায় চলে এল। আর তখনই দেখতে পেল গিরি কবিরাজের বাংলোটা। কৌতূহল হলো। এমন জায়গায় এত সুন্দর একটা বাংলো। আশ্চর্য! বাংলোর দিকে হাঁটা দিল সে। চুম্বকের মতো টানছে ওটা তাকে। বন্দুকটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে সেদিকে এগিয়ে গেল মিঃ জোয়ারদার। বাংলোর আশেপাশে ছড়ানো-ছিটানো কিছু সুপারী গাছ। বাংলো বারান্দায় উঠতেই ডিম ভাজার গন্ধ নাকে এলো তার। একজন শক্ত-সামর্থ্য বৃদ্ধ লোক ডিম ভাজছে স্টোভে। জোয়ারদারের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো না। পরিচিতের মতো হেসে বলল,—

'এক মিনিট। ডিমটা নামিয়ে নিই আগে।'

বারান্দায় এসে দাঁড়াল জোয়ারদার। এক মিনিট নয় পাঁচ মিনিট পর দুটো প্লেটে করে পরোটা আর দুটো ডিমের অমলেট

নিয়ে বেরিয়ে এল গিরি কবিরাজ। বলল,—'চলুন, বসার ঘরে যাই।'

গিরি কবিরাজের পিছু পিছু বসার ঘরে চলে এল জোয়ারদার। সোফায় বসল। গিরি কবিরাজ বলল—'আগে নাস্তা করে নিই। তার আগে আমার পরিচয়টা দিই। আমি গিরি কবিরাজ। ব্যস। একাই থাকি। একটা চাকর অবশ্য ছিল, এখন নেই। আপনি?'

জোয়ারদার বলল,—'হাটখোলায় যে এনজিওটা আছে আমি ওখানে সার্ভে করতে এসেছি।'

গিরি কবিরাজ বলল,—'নিন নাস্তা করুন আমার সাথে, তেমন কিছু না।'

জোয়ারদার বলল,—'আন্তরিকতাটাই বড়।'

তারপর নাস্তা শেষ করার আগ পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না। খাওয়া শেষ হলে জোয়ারদার জিজ্ঞেস করল,—

'গ্রামের খবর কিছু জানেন?'

প্রশ্নটা শুনে গিরি কবিরাজের মুখ কালো হয়ে গেল। বলল,—

'হ্যাঁ, শুনেছি। আর আমি ওটাকে দেখেছি। ওটা আমার চাকর মনাইকে হত্যা করেছে। একটা কথা আমি বলতে চাই। হয়তো কথাটা শুনে আমাকে আপনি ঘৃণা করবেন। আসলে এই প্রেতের উপদ্রবের কারণ আমিই। আমার জন্যই এই ছবির মতো সুন্দর গ্রাম কাঁকনভাঙ্গা আজ প্রেতপুরী। আজ আক্রান্ত।'

জোয়ারদার বলল,—'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। আপনার কারণে এই গ্রামে রাক্ষুসে শেয়ালের উপদ্রব শুরু হয়েছে? কিন্তু কীভাবে?'

গিরি কবিরাজ তখন সব কিছু খুলে বলল। মনাইয়ের পরিচয়ও দিল। আর সব শুনে জোয়ারদারের তো চোখ ছানাবড়া! ঢোক গিলে সে বলল,—

'ওহ্ মাই গড! এও সম্ভব!'

সাত

সেদিন গভীর রাত। শুক্লপক্ষের শুরু। এখন চাঁদ উঠবে। আস্তে আস্তে ভরাট হতে থাকবে চাঁদ। শন শন একটা বাতাস বইছে। গাছের পাতা নাড়িয়ে যাচ্ছে বাতাস। কখনো কখনো ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। ঝোপে ঝোপে জ্বলছে জোনাকি। ঝিঁঝি ডাকছে ঝি-কির ঝি-কির। একটা মোটা বিশাল আমগাছের নিচে দাঁড়াল ওরা তিনজন—জোয়ারদার, খবির শেখ, গিরি কবিরাজ। ফিস ফিস করে কথা বলছে ওরা। খবির শেখ বলল,—

'আপনে যে কেন এই ভুলটা করতে গেলেন, কবিরাজ দাদা। আপনার ভুলের জন্যে জীবন দিল আমার পোলা মঙ্গল, আর ছোট্ট মাইয়া যয়তুন। আমার শইলে ক্ষত হইছে এতে আমার আফসোস নাই। কিন্তু আইজ আবার কার সর্বনাশ করে কে জানে?'

জোয়ারদার বলল,—'আপনার মনে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক, খবির ভাই। কিন্তু যে ভুলের জন্য উনি সেই প্রথম থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন, মর্মে মর্মে যন্ত্রণা ভোগ করছেন তাকে বোধহয় ক্ষমা করা যায়।'

গিরি কবিরাজ বলল,—' খবির শেখ আমি কথা দিলাম, আমি জীবন দিয়ে হলেও ঐ পিশাচটাকে শেষ করব। বিশ্বাস করো তুমি।'

ওরা তিনজন আজ রাতে একসাথে বের হয়েছে। উদ্দেশ্য রাক্ষুসে শেয়ালটার গতিবিধি লক্ষ করা। আর পারলে খতম করা। হঠাৎ করে একটা শুকনো ডাল ভাঙল কোথাও। সাথে সাথে জমে গেলো ওরা তিনজন।

সামনের কোথাও থেকে শব্দটা এসেছে। আস্তে আস্তে ঝোপ ঠেলে ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল ওরা। ওখানেই কোন একটা

জায়গা থেকে চপ চপ একটা আওয়াজ আসছে। কিছু খাচ্ছে নিশ্চয়ই শেয়ালটা।

ওরা ঝোপের কাছে বসে পড়ল। জোয়ারদার টর্চ জ্বেলে দিল সামনে। আলোর বন্যা বয়ে গেল। খাওয়া অবস্থাই মুখ তুলে তাকাল দুটো শেয়াল। কুচকুচে কালো। তার মানে শেয়াল একটা নয়, দুটো। একটা পুরুষ অন্যটা নারী! একটা বাচ্চা ছেলের গাল খাচ্ছে! চোখ দুটো জ্বলে উঠল দুটো শেয়ালেরই। তারপরই একটা শেয়াল বাচ্চা ছেলেটাকে মুখে কামড়ে ধরে দৌড় দিল। পিছে পিছে অন্যটা। আশ্চর্য! এতদিন ওরা যখন ভেবেছে শেয়াল একটা, আসলে তখন আক্রমণ করত দুটো শেয়াল। গিরি কবিরাজ বলল,—

'শেয়াল আরো অনেক বেশি হবে। কারণ, বেশি না হলে আমার বাংলো ঘেরাও করলো কিভাবে?'

খবির শেখ বলল,—'কার বুক জানি আবার খালি হইল। তাজা পোলা। রক্তের ধারাটা দেখছেন?'

ওরা দেখল টর্চের আলোতে একটা কালচে রক্তের ধারা।

জোয়ারদার বলল,—'একটা রহস্যের এবার সমাধান হবে যদি ওরা ছেলেটার লাশটা আস্তানায় নিয়ে যায়।'

গিরি কবিরাজ বলল,—'অন্য কোন ঝোপের ভেতর বসেও খেতে পারে। আর যদি ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরেই যায় তো আগামীকাল ওদের শেষ দিন।

খবির শেখ বলল,—'ওরা আমার শিকার। আমি যা করার করব।'

জোয়ারদার বলল,—'ওরা কার শিকার কার শিকার নয় সেটা ভাবার কোন পথ এখন আর নেই। এখন শুধু একটাই কাজ ওদের হত্যা করা। আসল কথা আমরা এই গ্রামকে পিশাচমুক্ত করতে চাই।'

ভোরের দিকে ওরা তিনজনই উঠে দাঁড়ালো গাছতলা থেকে। কোন ঝামেলা হয়নি। শয়তান দুটো সে রাতের মতো চলে যাওয়ায় ওরা গাছতলায় প্রায় নিরাপদেই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

গিরি কবিরাজ বলল,—'যথেষ্ট ফর্সা না হলে রক্তের দাগ বুঝা যাবে না। চলো এখন গ্রামে ফিরি। খোঁজ নেয়া যাক হতভাগ্য ছেলেটা কার।'

গ্রামে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে মর্মান্তিক ঘটনাটা জানতে পারল ওরা। হতভাগা ছেলেটা হারাধনের ছোট ছেলে। সাধন। হারাধন জাতিতে কৈবর্ত। বাড়ি দাসপাড়া। দাসপাড়াটা গ্রামের একেবারে দক্ষিণে। নদীর কাছাকাছি। হরাধনের পেশা মাছ ধরা আর বেচা। হারাধন চলে যায় মাছ ধরতে। হারাধনের বউ হরবালার ভয় করতে থাকে। সে হারিকেন জ্বালিয়েই রাখে। চারদিক কেমন নিঝুম মনে হলো। একেবারে স্তব্ধ। ঝিঁঝির ডাকও নেই। হঠাৎ উঠোনে পদশব্দ শুনতে পেল। হরবালা! কাঁপা গলায় হরবালা জিজ্ঞেস করল,—'কে? কে উঠানে?'

কোন সাড়া শব্দ নেই। পদশব্দ থেমে গেছে। তারপর যখন আবার শোনা গেল তখন একেবারে ঘরের দরোজায়। কে যেন বলল,—

'হরবালা দরোজা খোল আমি।'

স্বামীর গলা চিনতে পারল হরবালা। কোনো কারণে হারাধন ফিরে এসেছে। হরবালা দরোজা খুলতে খুলতে বলল,—'যা ভয়টাই না পাই—'

তার কথা মুখের মধ্যেই রইল। খোলা দরোজা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুটো রাক্ষুসে শেয়াল। কালো কুচকুচে শরীর। একটা হরবালাকে নিয়েই মাটিতে পড়ল। আতঙ্কে একটা চিৎকার দিয়েই জ্ঞান হারাল হরবালা। অন্য শেয়ালটা তখন হারাধনের ছোট ছেলে সাধনটার ঘাড় কামড়ে ধরে দুই লাফে বেরিয়ে গেল। পিছু নিল অন্য শেয়ালটা যেটা হরবালাকে আটকে রেখেছিল।

ঘুম থেকে উঠে বিহ্বল দৃষ্টিতে সব দেখল—ভজা, হারাধনের বড় ছেলে। বয়স বারো-চৌদ্দ। তাকে আক্রমণ করল না কেন? এটা এক রহস্য হয়েই রইল। হারাধনের মুখে সব শুনে তাকে সান্ত্বনা দিল জোয়ারদার। হারাধন বললো,—'স্যার আমিও আছি আপনেগো লগে—ঐ পিশাচ দুইটারে শেষ না কইরা আমি এক ফোঁটা জলও মুখে দিমু না। খাওন তো দূরের কথা।'

এদিকে গিরি কবিরাজ ভাবল এই প্রথম দুটো শেয়াল একসাথে শিকার করল। এর আগে প্রত্যেকবারই একটাই শিকার ধরেছে। খবির শেখও তখন একই কথা ভাবছে। তবে একটা বা দুটো যতগুলোই হোক মারতে ওদের হবেই।

আট

চারজনই আবার জঙ্গলে চলে এল। এখন বেলা দশটার মতো হবে। প্রত্যেকেই উত্তেজিত। আর খবির শেখ ও হারাধনের অবস্থা অন্য রকম। চরম আক্রোশে জ্বলছে ওদের চোখ। ছেলে হারানোর বেদনায় ভারি হয়ে আছে বুক। টগবগ করে ফুটছে বুকের রক্ত। হারাধনের মুঠোয় ধরা কোঁচা। এটা দিয়ে সে মাছ ধরে। মাছ গেঁথে তোলে পানি থেকে। কোন কোন এলাকায় এই কোঁচাকে কাইট্টাও বলে। খবির শেখের হাতে একটা লাঠি। মিঃ জোয়ারদার তার বন্দুকটা সাথে নিয়েছে। গিরি কবিরাজের সম্বল তার বিশেষ লাঠিটা। যেখানে রাতে বাচ্চা ছেলেটাকে খাচ্ছিল শেয়াল দুটো সেখানে চলে এলো ওরা। জমাট বাঁধা কালচে রক্ত দেখা গেলো। তারপর রক্তের ধারা চলে গেছে অনেক দূর। রক্তের দিকে তাকিয়েই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হারাধন। কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে। তার পিঠে হাত রাখল খবির শেখ। আরো কিছুক্ষণ কাঁদলো হারাধন। তারপর মন শক্ত করে উঠে দাঁড়াল।

রওনা দিলো ওরা রক্তের ধারা লক্ষ্য করে। আস্তে আস্তে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। রক্তের ধারা এখন রূপান্তরিত হয়েছে ফোঁটায়। হাঁটতে থাকল ওরা। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবার দৃষ্টি পড়ে ভাঙাচোরা সিমেন্ট ক্ষয়ে যাওয়া ইটের একটা পুরোনো দালানে। মিঃ জোয়ারদার তাকাল খবির শেখের দিকে। জিজ্ঞেস করল,—

‘আচ্ছা খবির ভাই এই দালানের ব্যাপারে কিছু জানেন?’

খবির শেখ বলল,—‘এর আগে ভিতরে ঢুকি নাই। আর আমাগো জঙ্গলে ঢুকার তেমন দরকার পড়ে না। মাঝে মইধ্যে

লাকড়ির দরকার হইলে জঙ্গলের আশপাশ থাইক্কা নিতাম।'

হারাধন বলল,—'আমার বাবার মুখে এই দালানের কথা শুনছিলাম। কিন্তু আমি এইখানে আগে আসি নাই।'

ওরা দালানটার সামনে এসে দাঁড়াল।

মিঃ জোয়ারদার বলল,—'এটা বোধহয় নীলকর সাহেবদের কুঠি।'

ওরা দালানের ভাঙা বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে যেতেই হঠাৎ ওদের চমকে দিয়ে একঝাঁক চামচিকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। চামচিকেদের পাখার ঝাপটা লাগল ওদের নাকেমুখে।

দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। ভেতরটা অন্ধকার। যদিও যেখানে যেখানে ছাদ ধসে পড়েছে সেখান দিয়ে রোদ এসে পড়ছে। টর্চ জ্বালাল মিঃ জোয়ারদার আর গিরি কবিরাজ। একটা কক্ষ পেরিয়ে এসে আরেকটা কক্ষে ঢুকল। ওদের মনে হচ্ছে যদি রাক্ষস দুটো থাকে তো এখানেই থাকবে। আরেকটা কক্ষ পেরিয়ে এসে ডানে মোড় নিল। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত কিছুই দেখতে পেল না। চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখতে গিয়ে কিসে যেন হোঁচট খেলো হারাধন। সাথে সাথে টর্চের আলো ফেলল জোয়ারদার।

একটা কঙ্কাল। ছোট সাইজের। বুঝতে কষ্ট হলো না কোন হতভাগার কঙ্কাল ওটা। হারাধন চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওটার ওপর। তার আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে গেলো।

দুপুর গড়িয়ে গেল, কোথাও হত্যাকারীদের সন্ধান মিলল না। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল হতেই ওরা থমকে গেল। ওরা বের হবার পথ পাচ্ছে না! ওরা শুধু চক্রাকারে ঘুরছেই। কিন্তু বের হবার রাস্তা পাচ্ছে না। হন্যে হয়ে ওরা খুঁজে বেড়াতে লাগল দরোজা। বেলা যখন শেষে পথে ঘড়িতে যখন সাড়ে পাঁচটা বাজে, ধপ করে বসে পড়ল ওরা। অসম্ভব ক্লান্ত। দুপুরে খাবারও জোটেনি কারও।

হারাধন বলল,—'মরলে মরমু তবু এই হারামীগোরে শেষ কইরা তয় মরমু। আমার কেন জানি মনে হইতাছে পিশাচগুলি

এইখানেই আছে। আমাগোরে ঘোলাপানি খাওয়াইতাছে, তা না হইলে আমরা সহজেই বাইর হইয়া যাইতে পারতাম।'

মিঃ জোয়ারদার বলল,—'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

গিরি কবিরাজ বলল,—'শোনেন আমি বলি কি আমরা আর ওদের খুঁজব না, বরং ওরাই আমাদের খুঁজে বের করবে। তবে তার আগে একটা কাজ করতে হবে,—ওরা যাতে বের হয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে আমরা এখানে ওদের খোঁজায় ব্যস্ত থাকব আর এই ফাঁকে ওরা গ্রামে আবার হানা দেবে।'

খবির শেখ বলল,—'ঠিকই কইছেন, কিন্তু ব্যবস্থা করবেন কেমনে?'

গিরি কবিরাজ বলল,—'আমার এই লাঠিটা দেখছেন? এইটা এমন একটা লাঠি...।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা গর-গর শব্দ শোনা গেলো। শব্দটা পাশের ঘর থেকে আসছে। ওরা সবাই সাহস সঞ্চার করে পাশের ঘরের দরোজায় দাঁড়াল।

ভেতরে অন্ধকার। চারটে জ্বলন্ত চোখ দেখা যাচ্ছে। দুটো শেয়াল এবার ওদের বিচলিত হলো না। মাঝখানে গিরি কবিরাজ। হাতে তার বিশেষ লাঠিটা। এই লাঠিটার জন্য এদিকে আসতে পারছে না রাক্ষস দুটো। হারাধনকে আর খবির শেখকে গিরি কবিরাজ বলল,—

'দেখ চেষ্টা করে বের হবার রাস্তা পাও কিনা, আমার বাংলোয় গিয়ে দেখ দুটো বড় বড় কন্টেইনারে কেরোসিন আছে। ও দুটো নিয়ে এসো। দিয়াশলাই বাক্সও আনবে একটা।'

ওরা দুজন গিরি কবিরাজের কথামতো বের হল এবং আশ্চর্য একটু খুঁজতেই পথ পেয়ে গেল! এদিকে শেয়াল দুটোর পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ারদার আর গিরি কবিরাজ। আটকা পড়ে শেয়াল দুটো গর্জন করছে। ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু দরোজাজুড়ে ওরা অটল দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর ফিরে এলো খবির শেখ আর হারাধন। বুদ্ধি করে এক বোঝা লাকড়িও নিয়ে এসেছে। যার যার গায়ের জামা

খুলে কাঠে প্যাঁচাল। মশাল তৈরি হয়ে গেল। চারটা মশাল চুবাল কেরোসিনে। এর মধ্যে একটা টর্চ জ্বেলে ছিল জোয়ারদার। কিন্তু টর্চের আলো একটা শেয়ালের চোখে পড়তেই টর্চটা ফেটে গেল, নিভে গেল। এই ফাঁকে হারাধন আর খবির শেখ মেঝেতে কেরোসিন ঢালতে লাগল। ছড়িয়ে পড়লো কেরোসিন সমস্ত ঘরে। লাকড়ির চেলাগুলো ছুড়ে ছুড়ে দিল ঘরজুড়ে। তারপর মশালে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিল।

তিনটে মশাল ছুড়ে দিল শেয়ালগুলোকে লক্ষ করে। থৈ থৈ কেরোসিনের মেঝেতে পড়ল মশাল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। লাকড়ির চেলাগুলোতেও আগুন লেগে গেল।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো শেয়াল দুটো ঠিক মানুষের মতো! আরেক কন্টেইনারে যে কেরোসিন ছিল, তাও ছুঁড়ে মারা হলো আগুনের মাঝে। দৌড়ে চলে এল তারা আগের ঘরে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল ওই ঘরে। মর্মভেদি চিৎকার শোনা গেল পিশাচ দুটোর। বিজয়ের আনন্দে হা হা করে হাসতে লাগল খবির শেখ আর হারাধন। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে চারদিক অন্ধকার করে। এইবার মুক্ত হলো গ্রামবাসী।

রতন চক্রবর্তী

জমিদারবাড়ি

ঢাকা থেকে যখন বাস ছাড়ল, তখন আকাশ ছিল একদম ঝকঝকে পরিষ্কার। কিন্তু টাঙ্গাইল বাইপাস পার হতে না হতেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। গোটা দুনিয়া একেবারে সাদা হয়ে গেল। বাসের গতিও হঠাৎ করেই গেল কমে। এমন বর্ষণের মধ্যে গাড়ির স্পিড না কমিয়েই বা ড্রাইভার কী করবে? জোরে চালাতে গিয়ে চাকা পিছলে এতগুলো মানুষসুদ্ধ বাসটি একেবারে খাদে গিয়ে পড়বে। এভাবে চলতে চলতে গাড়িটা যমুনা সেতুর কাছে পৌঁছে গেল। বৃষ্টিতে তখন চারদিক একেবারে সাদা। গাড়ি আর এগোতেই পারছে না। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে গাড়ি প্রায় থামিয়েই দিল ড্রাইভার। তখন হুট করে গাড়ির দরোজা দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল একটা ছেলে। ছেলেটার পরনে কালো প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট। গাড়ির ভেতরে ঢুকে যাত্রীদের দিকে সে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকাল। মইন অবাক হয়ে দেখল ছেলেটার চেহারা। ছেলেটাকে খুব চেনা চেনা লাগছে ওর। তবে ওর বাঁ চোখ আর কপালজুড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকায় একেবারে নিশ্চিতও হতে পারছে না সে। ছেলেটাকে কাছে ডাকবে কিনা ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ করেই গাড়ির স্পিড একটু বেড়ে গেল। আর তড়িঘড়ি করে নেমে গেল ব্যান্ডেজ বাঁধা ছেলেটা। ওকে দেখার জন্যে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মইন। কিন্তু অঝোর ধারায় ঝরতে থাকা বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না ওর। কোত্থেকে যে ছেলেটা এল আর কোথায়ই বা হারিয়ে গেল, তার কোনো হদিসই পেল না। একবার ভাবল, গাড়ির সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করবে। আবার ভাবল কোথাকার কে গাড়ির দরোজা খোলা পেয়ে হঠাৎ করে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিয়েছে, তা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কী দরকার।

ও যখন নিমগাছির মোড়ে গাড়ি থেকে নামল, তখনও বৃষ্টি থামেনি। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছেই। রাস্তাঘাট প্রায় পুরোপুরি ফাঁকা। বড় সড়ক থেকে কিছু দূরে ঝাঁকড়া একটা বটগাছের নিচে শুধু দুটো রিকশা দেখা যাচ্ছে। রিকশার ভেতরে কোনো চালক বসে আছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে ভিজেই রিকশার কাছে গেল মইন। দেখল, রিকশার ভেতরে গুটিসুটি মেরে চালক বসে আছে। এই রিকশায় চেপেই ও বাড়ি পৌঁছল। ওদের ওই গ্রামের বাড়িতে তেমন কেউ থাকে না। ওরা সবাই থাকে

ঢাকার বাড়িতে। গ্রামের বাড়ি আর জমিজমা দেখাশোনা করেন কলিম চাচা। ওদের বাড়িরই একটা অংশে পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকেন কলিম চাচা। জমিজমার কিছু দরকারি কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য মইনকে ওর বাবা গ্রামে পাঠিয়েছেন। কাল দিনের বেলায় ওকে সেন্টেলমেন্ট অফিসে যেতে হবে কলিম চাচাকে নিয়ে। পরশুই ও ফিরে যাবে ঢাকায়। সন্ধে নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। রাতে প্রকাণ্ড থালামতো পূর্ণিমার চাঁদ উঠল আকাশে। বহুদিন এমন সুন্দর চাঁদনী রাত দেখেনি মইন। শহরের বিজলি বাতির ভিড়ে জোছনার সৌন্দর্যই বোঝা যায় না।

বাড়ির সামনের বড় আমগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল ও। মনে হলো যেন গাছের ফাঁক দিয়ে চুইয়ে পড়ছে মোলায়েম আলো। কিন্তু এই আলো দেখার জন্যে কেউই জেগে নেই গাঁয়ে। সূর্য ডুবতেই রাতের খাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে গাঁয়ের লোকজন। রাত আটটা বাজতে না বাজতেই মহানিদ্রা শুরু হয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাড়ির আশপাশটায় হাঁটাহাটি করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল ও। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না। রাত বারোটার আগে কখনও ঘুমায় না ও। তাই বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে অনেকটা রাত পার করে দিল। তারপর ঘুম ঘুম ভাব এল। চোখের পাতাগুলো সবে বন্ধ হয়েছে, এমন সময় দরোজায় শব্দ হলো, ইঁদুর বা ছুঁচোর সাথে কোন কিছুর গুঁতো লেগে অমন শব্দ হচ্ছে। কিন্তু পরে বুঝল, দরোজায় কেউ টোকা দিচ্ছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা ছাড়তে কেউ টোকা দিচ্ছে। গাঁও-গেরামে এত রাত অবধি কেউ জেগে থাকে নাকি? কে এসেছে, কে জানে। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরোজা খুলে দিলও। আর দরোজা খুলতেই সাঁই করে ওর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল ওরই সমবয়েসী একটা ছেলে। প্রথমটায় ছেলেটাকে চিনতে না পারলেও পরক্ষণেই ওকে চিনে ফেলে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আরে, লতিফ! কতদিন তোকে দেখিনি। সেই ছোটবেলায় আমরা একসাথে কত খেলেছি, বেড়িয়েছি। তারপর ঢাকায় চলে যাওয়ার পর থেকে আর একবারও দেখা হয়নি তোর সাথে।'

লতিফও খুশি মনে বলল, 'সে জন্যেই তো এতকাল পরে তোকে দেখতে পেয়ে কী যে ভাল লাগছে আমার!'

'আমারও খুব ভাল লাগছে। তুই যে আমার গাঁয়ে আসার সংবাদ পেয়েই ছুটে এসেছিস, এতে সত্যি আমার খুব আনন্দ লাগছে।'

‘চল, বাইরে যাই, বাইরে দারুণ সুন্দর চাঁদের আলো। এতকাল পরে গ্রামে এসেছিস, রাতের ফটফটা জ্যোৎস্নায় গ্রামটা ঘুরে দেখবি।’

লতিফের কথায় আনন্দে নেচে উঠল মইনের মনটা। জ্যোৎস্না রাতে পুকুরঘাটে বসে আকাশের ছুটে চলা মেঘের ঝাঁক দেখার আনন্দই আলাদা। নিস্তব্ধ গাঁয়ের ওপর দিয়ে শিমুলের তুলোর মতো উড়ে যাওয়া মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশের অগণিত তারার মেলা দেখার আনন্দই আলাদা। তাই লতিফের আহ্বানে রাজি হয়ে সে বলল, ‘চল, আজ সারা রাত আমরা গল্প করব আর সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াব।’

দু’বন্ধুতে বেরিয়ে পড়ল গাঁয়ের পথে। বেরোনোর আগে মইন আলতো করে ঘরের দরোজাটা টেনে দিল।

ওরা দু’জন হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল গাঁয়ের একেবারে প্রান্ত সীমানায়, যেখানে পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো একটা বটগাছ আর অন্যধারে পুরোনো আমলের জমিদারবাড়ি। বাড়িটায় এখন কেউই বাস করে না। জমিদার মারা গেছেন বছর পঞ্চাশ আগে। তাঁর ছেলেমেয়েরা কোলকাতায় লেখাপড়া শেষে সেখানেই থেকে গেছে। বছর ত্রিশেক আগে নাকি একবার জমিদারের বড় ছেলে এ বাড়িতে এসেছিল। তখনও বাড়িটার এমন জীর্ণদশা হয়নি। কিন্তু মাত্র দু’দিন গাঁয়ে থাকার পরে এক অমাবস্যার রাতে ভদ্রলোক খুন হয়ে গেলেন। এরপর থেকে এ বাড়িতে আর কেউ আসেনি। বাড়ির ইটগুলোর ওপর থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে। ইটেও নোনা ধরেছে। লতিফ মইনকে বলল, ‘পূর্ণিমার আলোয় বাড়িটা কী চমৎকার লাগছে দেখেছিস?’

মইনের কিন্তু একটুও চমৎকার লাগছিল না বাড়িটা। ঝোপঝাড়ে ছেয়ে আছে জায়গাটা। লতা-পাতার ভেতর থেকে মাঝেমাঝে মাথা উঁচিয়েছে ভাঙা দেয়াল। বেশিরভাগ ঘরেরই ছাদ ধসে পড়েছে। কোনো কোনো জায়গায় ছাদের ওপর জেঁকে বসেছে বট-পাকুড়ের চারা। এমন একটা বিশ্রী পোড়া বাড়িকেই কিনা চমৎকার বলছে? তবে চক্ষুলজ্জার খাতিরে বন্ধুর মুখের ওপর না বলতে পারল না। অনেকটা নিমরাজি ভাব দেখাল সে লতিফকে। লতিফ তখন ওকে একরকম টেনে নিয়ে ঢোকাল সেই বাড়িটার ভেতর।

বাড়ির ভেতর ঢুকে বেশ অবাক হলো মইন। বাইরে থেকে বাড়িটাকে যতটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা বলে মনে হচ্ছিল, ভেতরে ঢুকে

ওটাকে তেমন লাগল না। বরং মনে হলো যেন এ বাড়িতে কেউ বাস করে। বড় বড় থামওয়ালা একটা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। এমন সময় দমকা হাওয়ায় বারান্দার সাথে লাগোয়া ঘরটার বন্ধ দরোজা খুলে গেল। অমনি ভেতর থেকে ভেসে এল তবলা আর হারমোনিয়ামের আওয়াজ। সেই সাথে কে যেন বাঁশিতে তুলেছে মিষ্টি সুর। সেই সুরে আছে মাতাল করা শক্তি। মইনের মনে হলো কে যেন ওকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে ঐ সুরের দিকে। নিজের অজান্তেই ও ঘরটার ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

সাথে সাথেই ভ্যাপসা একটা গন্ধ এসে লাগল নাকে। গন্ধটা অসহনীয় তা সত্ত্বেও ঐ মাতাল করা সুরকে উপেক্ষা করে ঘরের বাইরে বোরোনোর শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। মোহগ্রস্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাল সে। দেখল ওর পাশে খোশ মেজাজে দাঁড়িয়ে আছে লতিফ। লতিফসহ ও এগিয়ে গেল ওপাশের দরোজাটার দিকে।

ঐ ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরটা এক অদ্ভুত আলো-আঁধারিতে ভরা। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের ভেতরটায় যেমনি আলো-আঁধারির ব্যবস্থা করা হয়, ঠিক তেমনি। কোনো কিছু না ভেবেই মইন গিয়ে ঢুকল এই ঘরটার ভেতর। মেঝের ইটগুলো এবড়ো-থেবড়ো, মেঝেটা ভেঙে গেছে। পরিত্যক্ত বাড়ির মেঝে ভাঙা থাকতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এমন আলো-আঁধারির ব্যবস্থাটা করল কে।

এই ঘরটার ভেতরে ঢুকে ওর মনে হলো, কেউ যেন ওকে যাদু করেছে। ফলে ও কথা বলার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে। দু'হাতের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থাকা লতিফকে যে এই বিষয়টা জিজ্ঞেস করবে, সেই শক্তিও ও হারিয়ে ফেলেছে। কে যেন ওর মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ও শুনছে বাজনার শব্দ। এমন সময় খুবই মধুর গলায় কে যেন গান গেয়ে উঠল। এতই চমৎকার সেই সুর যে, ও একেবারে হারিয়ে গেল সুরের রাজ্যে। ক্লান্তিহীনভাবে ও শুনতে লাগল সেই গান।

কতক্ষণ সেই গান ও শুনেছে, তা বলতে পারবে না। এমন সময় স্কুলের ঘণ্টা পড়ার মতো ঢং ঢং করে আওয়াজ হলো। পর পর চারটে ঘণ্টা পড়ল। অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল লতিফ। বলল, 'ভোর হয়ে আসছে। এক্ষুণি যেতে হবে।'

ওর এই ব্যস্ততার কোনো মানে বুঝল না মইন। সারাটা রাতই যখন কাটাতে পারল, তখন এই সামান্য সময়ে আর কী এসে

যাবে। তাই বাড়িটা আর একটু ভাল করে দেখার জন্যে ভেতর দিকের অন্য একটা ঘরে পা রাখল ও। এ ঘরটার ভেতরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল আরও বিস্ময়। পাশের এই ঘরটার ওপরে ছাদ নেই বলে চাঁদের আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে ঘরটা। এ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা বুড়োলোক, গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে মনের আনন্দে বাজাচ্ছে। তার পাশেই একটা লোক মেঝেয় বসে তবলা বাজাচ্ছে।

হারমোনিয়াম বাদক বুড়ো লোকটার ঠিক পেছন থেকেই ভেসে আসছে মেয়েলি কণ্ঠের ঝংকার। কী অপূর্ব সেই সুর! মইনের মনে হলো, এই সুর ওকে অন্য কোনো জগতে নিয়ে গেছে। সুরে মাতাল হয়ে ও নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রায় হারিয়েই ফেলল।

মনের অজান্তেই ওর দুটো পা সচল হয়ে উঠল। সবকিছু ভুলে দ্রুত এগিয়ে গেল সে লোক দুটোর দিকে। কোথা থেকে ভেসে আসছে ওই নারীকণ্ঠের সুর, তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওর চোখ দুটো খুঁজতে লাগল সেই রহস্যময়ী নারীকে।

কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেল না সে। অদৃশ্য নারীর গলার আওয়াজ এত সুমধুর হতে পারে? ও পুরোটা ঘর খুঁজে বেড়াতে লাগল সেই নারীকে। অথচ দু' দুটো জলজ্যান্ত মানুষের একেবারে নাকের ডগায় ওর খোঁজাখুঁজি চলতে থাকলেও লোকগুলো চোখ বন্ধ করে আপন মনে বাজিয়েই চলেছে হারমোনিয়াম-তবলা। এমন বেখেয়াল লোক ও কখনো দেখেনি।

হন্তদন্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে করতে এক সময় হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াল ও। হারমোনিয়াম বাদকের পেছনে ছায়ার মতো কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে। যতই সময় যাচ্ছে, ছায়ার মতো ঝাপসা জিনিসটা ততই স্পষ্ট হচ্ছে। শেষে ওই জিনিসটাই একটা মেয়েতে রূপান্তর ঘটল। ও বুঝল, এতক্ষণ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে থাকা ওই মেয়েটা এতক্ষণে দেখা দিয়েছে। দৃশ্যমান হবার পরও আগের মতো গেয়েই চলেছে মেয়েটা।

অনেকক্ষণ এভাবে চলার পর রাতের শেষ প্রহরের শেয়ালের ডাক ভেসে এল আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে। কিছু শেয়াল এত কাছ থেকে ডেকে উঠল, যেন ওরা এই বাড়িটার ভেতরেই ঘোরাফেরা করছিল। যেই না শেয়ালের ডাকাডাকি শুরু হলো, অমনি ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা। বাজনা মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল। রূপবতী সেই গায়িকাও থামিয়ে দিল তার গান। সাথে

সাথেই শুরু হলো ভীষণ নৃত্য। যারা বাজনা বাজাচ্ছিল তারা কোথায় মিলিয়ে গেল, তা ও বুঝতেই পারল না। এমন প্রবল এবং ভয়ঙ্কর সেই নৃত্য যে, মনে হলো ভাঙাচোরা এই বাড়িটার এখনও যেটুকু টিকে আছে তাও বুঝি টিকবে না। গভীর নিশীথের এই অদ্ভুত নৃত্যশিল্পীর নাচানাচি আর দাপাদাপির দাপটে পুরো বাড়ি কাঁপতে লাগল। তবে আশ্চর্যের আরও কিছুটা বাকি ছিল। এবারে সেটুকুও দেখার সুযোগ পেল মইন।

নাচিয়ে মেয়েটা এক সময় হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াল ওর সামনে। রক্তজবার মতো লাল চোখ মেলে ওর দিকে মেয়েটা তাকাতেই ওর রক্ত হিম হয়ে এল ভয়ে। যাকে সে এতক্ষণ রূপবতী কন্যা বলে ভেবেছিল, তার একী চেহারা! কারো চেহারা এত তাড়াতাড়ি এতটা বদলে যেতে পারে? ওটার মাথার সামনে দুটো শিং আর সারা গায়ে সজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া কাঁটা। ওপরের পাটি থেকে দুটো বড় দাঁত ঝুলে পড়েছে হাতির দাঁতের মতো। এতক্ষণ ও বুঝল এক ভয়ঙ্কর জায়গায় এসে পড়েছে। যারা এখানে নাচছিল, গাইছিল তারা কেউই মানুষ নয়। মানুষের রূপ ধরেছিল মাত্র।

এতক্ষণ ও ঝোঁকের বশে ভুলেই গিয়েছিল ওর বন্ধু লতিফের কথা। অনেকক্ষণ আগেই এই বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছিল ও। তখন ওর কথায় কান না দিয়ে কী ভুলটাই না করেছে। কিন্তু এখন মহাবিপদ মাত্র একহাত দূরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী করে প্রাণ বাঁচাবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠল সে। এমন সময় ওই ভয়ঙ্কর জিনিসটা নাকি গলায় বলে উঠল, তোফা জিনিস পেয়ে গেছি রে, আজ এটাকেই সাবাড় করব।

কথা শেষ করতে না করতেই হাঁ হাঁ করে সাপের মতো লকলকে জিভ বের করে ওর দিকে তেড়ে এল ওই দানব মূর্তিটা। সাথে সাথে সাঁ করে হাত দুয়েক সরে গেল মইন। মুহূর্তেই স্থির করে ফেলল নিজের কর্তব্য।

ঘরের ভাঙা দেয়াল গলিয়ে লাফ দিল উঠোনে। ততক্ষণে আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। দু'একটা করে ভোরের পাখির ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে। গাঁয়ের মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনিও ভেসে এল। ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাড়ির সীমানা পেরিয়ে বুড়ো বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল।

এমন সময় ঘটল আরেক আশ্চর্য ঘটনা। ঘন অন্ধকারে ঢাকা বটগাছের ডালপালার ভেতর থেকে ভেসে এল লতিফের গলা।

ও বলছে, 'আমিই তোকে এখানে এনেছিলাম। কিন্তু পরে তোর কোনো ক্ষতি হোক তা চাইনি বলেই এখান থেকে সরে পড়তে চেয়েছিলাম। অবশ্য ততক্ষণে তুই এ বাড়ির মায়া জালে আটকা পড়ে যাওয়ায় তোকে আর ফেরাতে পারিনি। তা সত্ত্বেও তুই এ যাত্রায় বেঁচে গেলি শুধু কপালের জোরে। রাত শেষ হয়ে গেলে এ বাড়ির ওনাদের আর কোন ক্ষমতা থাকে না বলেই তুই বেঁচে গেছিস।'

বটগাছের কোন জায়গাটা থেকে লতিফ এসব কথা বলছে, সেই খোঁজ আর করল না মইন। হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে ওদের বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুল। ততক্ষণে ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে সবাই বেরিয়ে আসছে। কলিম চাচার সাথে মসজিদের সামনে দেখা হয়ে গেল। চাচা বললেন, 'কী আশ্চর্য! তোমাকে আমি খুঁজেই হয়রান, আর তুমি কিনা আঁধার থাকতেই বেড়াতে বেরিয়েছ?'

এবারে চাচাকে পুরো ঘটনা খুলে বলল মইন। চাচা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, 'ওই লতিফটার পাল্লায় তুমিও পড়েছিলে? ও তো মাসখানেক আগে যমুনা ব্রিজে বাস অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।'

মইনের মনে পড়ে গেল, বাসে উঠেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা সেই ছেলেটার কথা। তখন ওর মনে হল, আরে, ওটা তো লতিফই ছিল। কী ভয়ঙ্কর আর আশ্চর্য ব্যাপার!